সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

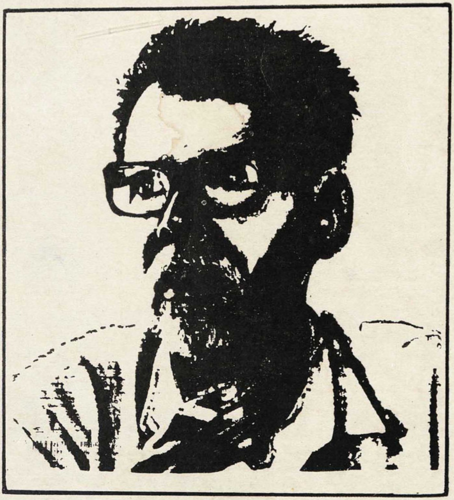

সংস্কৃতি বিষয়ক

যোগসূত্র

জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯৩

সম্পাদক	:	বিনয় ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক	:	সঞ্জয় চক্রবর্তী
শিল্প নির্দেশক	:	দেবাশিস দত্ত
প্রচার	:	মানস বসু
বিজ্ঞাপন	:	অসীম রক্ষিত
ব্যবস্থাপনা	:	দিলীপ সেন
প্রচ্ছদ	:	দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
যোগাযোগ	:	টি জি ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা ৭০০০৫৯
ফোন	:	৫৯ ৪০৪৮
		৯১/১এ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০১৪

চিঠি ৫ □ রবি সেন / কবির বুক ও মাথা ১৭ □ অরূপরতন বসু / অন্তর্ভ্রমণ ২৮ □ কমল চক্রবর্তী / সাজানো রাক্ষসের জন্য বানানো আতঙ্ক ৩৯ □ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় / আজবসম্ভব ৪৬ □ উৎপল কুমার বসু / বিনয় মজুমদার : তাঁর কবিতা ৬৭ □ বিনয় মজুমদার প্রণীত আঠাশটি কবিতা ৭১ □ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় / বিভিন্ন সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা' ১০৩ □ জ্যোতির্ময় দত্ত / বিনয়কে ১২৯ □ সুতপা ভট্টাচার্য / অন্তর্জগতের কবিতা—'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' ১৩৯ □ প্রভাত কুমার দাস / পত্রপত্রিকায় বিনয় মজুমদার ১৪৫ □ বিনয় মজুমদার-এর ডায়েরি ১৫৯ □ বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা-১ : ১৭৯ □ বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা-২ ১৮৭

এই সংখ্যায় বিনয় মজুমদারের একগুচ্ছ কবিতা ছাপা হল। বিনয়ের মতোই স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত কবিদের কবিতা এরপর মাঝেমাঝে এইভাবেই প্রকাশের ইচ্ছা রইল। বর্তমান সংখ্যা প্রকাশের ক্ষেত্রে বহুজনের কাছে আমরা ঋণী। বিনয়ের পাণ্ডুলিপি, ডায়েরি ইত্যাদি পেতে প্রভূত সাহায্য করেছেন অমল চৌধুরী।

৪.২.৯৩

জয়া-র 'হনুমান'-প্রথম নয়

জয়া মিত্রের 'হন্যমান-কে সূত্র করে প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলখানা-সংক্রান্ত নিবন্ধে ('যোগসূত্র', এপ্রিল-জুন, ৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত) মিশেল ফুকো—রণজিৎ গুহ যুগলবন্দী ছকে বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে ভিন্ন স্বাদ এনেছে ও ফলে নিবন্ধটি বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। এক অর্থে মানবিক অধিকার রক্ষা ও সম্প্রসারণের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের কাছে লেখাটি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। 'হন্যমান'-এর কৃতিত্ব এখানেই যে প্রদ্যুম্নের মতো মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাভাবনাকে নাড়িয়ে দিয়েছে, নানা ধরাবাঁধা তত্ত্ব ও অভ্যাসে চিড় ধরিয়েছে ; ভদ্র নাগরিক সমাজের প্রতি প্রদ্যুম্নের ঘৃণাকে তীব্র করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু শুধু প্রশংসার খাতিরে এই চিঠির অবতারণা নয় ; আপত্তি, অনুযোগ ও প্রশ্ন আছে বলেই এই পত্র প্রেরণ।

আপত্তি প্রদ্যুম্নের একটি দাবি নিয়ে : 'হন্যমান' স র্ব প্র থ ম জেলখানার 'এক অচেনা জগতের এক অনাবিষ্কৃত জগতের' মুখোমুখি আ মা দে র দাঁড় করায়, চমকিত করে। প্রদ্যুম্নের কাছে তা প্রথম হলেও অন্যান্যদের কাছে তাই কি ? হন্যমানের প্রকাশকাল ১৯৮৯ সালের নভেম্বর। তারও দশ বছর আগে 'সত্তর দশকের বিপ্লবী রাজনীতির সক্রিয় কর্মী,' জয়া মিত্রের বান্ধবী, মীনাক্ষী সেনের (কখনো-কখনো অনামিকা রায়-চৌধুরী নামে) ধারাবাহিক ভাবে লেখা 'জেলখানার চালচিত্র' ('স্পন্দন'-এ প্রকাশিত) আমাদের কাছে স র্ব প্র থ ম জেলখানার স্মৃতির ভিন্ন স্বাদ নিয়ে আসে। সেই লেখার কোনো উল্লেখ নেই দেখে (এমনকি পাদটীকাতেও) পাঠক ধারণা করে নিতে পারেন যে, 'হন্যমান' ৯১ সালে (প্রকাশেরও দু-বছর বাদে) ভদ্র নাগরিক সমাজের 'দর্পণ' আনন্দবাজারে প্রকাশিত ও পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার পরই প্রদ্যুম্নকে সজাগ করেছে। সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'রাজনীতি সচেতন' ম্যাগাজিন 'স্পন্দন'-এ প্রকাশিত মীনাক্ষীর লেখাগুলো প্রদ্যুম্নের নজর এড়িয়ে গেছে। নতুবা, হয়ত আমরা অনেক আগেই প্রদ্যুম্নের কাছ থেকে এই ধরনের চিন্তাকর্ষক প্রবন্ধ আশা করতাম।

'পাগলাগারদ' অংশে প্রদ্যুম্ন সঠিক ভাবেই জানাচ্ছেন যে, পাগল ভবঘুরে প্রভৃতিদের জেলখানায় পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাই 'পথিকৃৎ' এবং সেই ঐতিহ্য এখনও চলছে। ১৯৪৭ পরবর্তী ভারতে 'চোর, খুনী, পাগলা ও পতিতা মেয়েদের কথা' তুলে ধরেছেন চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের স্ত্রী সুরমা ঘটক। তাঁর বইটি 'শিলং জেলের ডায়েরী' সা ম্প্র তি ক কা লে প্রকাশিত (১৯৯১ সালের এপ্রিলে)। এই বইয়ে শ্রীমতী ঘটক 'রাজনৈতিক' বন্দিনী' হিসাবে প্রায় দু-বছর (১৯৪৯ সালের ৩১শে অক্টোবর থেকে ১৯৫১ সালের ২৯শে জুন পর্যন্ত) থাকার অভিজ্ঞতা বর্ণনার মাধ্যমে সদ্য 'স্বাধীন' ভারতীয় রাষ্ট্রের জেলের 'অন্য জগতের মানুষদের' সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যই তাঁর লেখা মীনাক্ষী বা জয়া মিত্রের মতো অত গোছালো নয়,

কিছুটা অসংলগ্ন। তবু আবেদন রয়েছে লেখাটিতে। ঋত্বিকের কথায়, এ লেখার নতুনত্ব আছে। বিশেষ করে মেয়েদের [Tribal মেয়েগুলো, ঐ Lumpenised পাগলগুলো, ঐ বারবণিতার দল' …] বেরিয়ে আসার দিক, তাদের বন্দী-জীবনের সমস্যা, তাদের সমাজ জীবনের সমস্যা' (পৃঃ ১১০-১১১)। বইটি যদি প্রদ্যুম্নের নজর না এড়িয়ে যেত তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর চোখে ধরা পড়ত জেলখানার অন্য জগত সম্পর্কে এক ইতিবৃত্ত।

শুধু তাই নয়, সুরমা ঘটকের বইয়ের আর একটি বিষয় প্রদ্যুম্নের সতর্কদৃষ্টি নিশ্চয়ই এড়াত না। একদিকে রাজনৈতিক বন্দিনী হিসাবে 'উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিতে' শ্রীমতী ঘটক এইসব সাধারণ অপরাধী মেয়েদের দেখছেন, আন্তরিক ভাবে 'জানবার চিনবার ও বুঝবার' চেষ্টা করছেন, তেমনই অন্যদিকে 'জেলখানার অন্যদের চিৎকার, অশালীন আচরণে' মাঝে-মাঝে তিতিবিরক্ত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেল কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করছেন (পৃষ্ঠা ৪৪)। এই টানা-পোড়েন—'অন্যদের' সঙ্গে মেলামেশা করা, তাদের পরিবর্তন করার চেষ্টা, তাদের নিয়ে ন্যায্য দাবির সপক্ষে সংগ্রাম চালানো, আবার মাঝে-মাঝে 'ভদ্রসমাজ সুলভ' তীব্র অনুভূতি—অশালীন, নীচু জাতের মেয়েদের প্রতি বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্ত হওয়ার মানসিকতা—চমৎকারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীমতী ঘটকের রচনায়।

তাই তিনটি রচনা ফুকো-গুহ ছকে আলোচনা করলে আলোচনা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠত এবং এমন দাবি অন্তত উঠত না যে, শুধু জয়া মিত্রের 'হন্যমান' সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত অন্যান্য জেল বৃত্তান্ত থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

অনুযোগ :

'নাগরিক সমাজের একাংশ রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি হওয়ার পরেই নিশ্চিন্ত হয়'—মন্তব্যটি উক্ত একাংশের প্রতি অবিচার। কারণ প্রদ্যুম্নের স্মৃতি যদি এখনও ধূসর না হয়ে যায়, তাহলে মনে থাকতে পারে যে, ১৯৮৬-৮৭ সাল থেকেই নিরপরাধ বন্দিনী নির্যাতিতা মানসিক বন্দিনী (NCL) ও সাধারণ কয়েদীদের নিয়ে 'একাংশ' শুধু প্রচার করেনি, সাধ্যানুযায়ী আন্দোলনও করেছে, বহুজনকে মুক্তির স্বাদ দিতে পেরেছে ও পুনর্বাসন দিতে পেরেছে এবং সাধারণ কয়েদীদের উপর জেলখানায় নির্যাতন বন্ধের ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য নানা প্রক্রিয়ায় তারা আজও যুক্ত। আসলে, শেষ বিচারে, প্রদ্যুম্ন তো সেই ভদ্রসমাজেরই একজন। দুর্ভাগ্য, 'একাংশের' প্রচেষ্টা যেহেতু ভদ্রসমাজের প্রচার মাধ্যমে স্থান পায় না, প্রদ্যুম্ন তাই জানতে পারেন না সেই প্রচেষ্টার কথা।

দুটি প্রশ্ন ব্যাখ্যাসহ :

এক : 'হন্যমান' পাঠ করে প্রদ্যুম্নের রাজনৈতিক-সাধারণ বন্দীদের বিভাজন রেখা টানার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যেসে ভাঁটার টান লাগে, প্রচলিত ধারণায় আসে সন্দেহ? কেন? সাধারণ বন্দীদের প্রতিরোধেরও দৈনন্দিন কর্মসূচী আছে বলেই বিভাজন টানা যায় না? এ ধরনের সিদ্ধান্ত কি হাস্যকর নয়? জয়া মিত্র, মীনাক্ষী সেন,

সুরমা ঘটক বা আজিজুল হকরা ছিলেন রাজনৈতিক বন্দী। তাঁদের চেতনায় (যতই তা রণজিৎ গুহ ছকে উচ্চবর্গীয় হোক না কেন) ধরা পড়েছে অন্য জগত, লেখায় ফুটে উঠেছে তারই ছবি। প্রদ্যুম্নও চিনছেন, চমকিত হচ্ছেন 'রাজনীতি সচেতন', 'সমাজ-সচেতন' বন্দীদের চশমা পরেই। সাধারণ কয়েদীদের প্রতিরোধ ক্ষণিক, (তার মানে এই নয় যে, পরিকল্পনাবিহীন); দিশা অসম্পূর্ণ। অন্যদিকে সুরমা ঘটকরা 'অন্যদের' বোঝানোর চেষ্টা করেন রাষ্ট্রকাঠামোর টানাপোড়েন, প্রকৃত মুক্তির কথা ভাবেন উন্নততর মানবিক সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ভিন্ন-ভিন্ন রূপকে চেনা, প্রতিরোধের নানা স্তর ও উত্তরণের প্রশ্ন সম্যক ধারণার বিচারে রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে সাধারণ বন্দীদের ফারাক আছেই। রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে সাধারণ কয়েদীদের প্রতিরোধের স্তরে মেলবন্ধন হওয়ার অর্থ কখনোই এটা নয় যে তাদের মধ্যে বিভাজনরেখা টানা অসম্ভব।

দুই : প্রদ্যুম্ন কি মনে করেন এই বিভাজন রাষ্ট্রের দাক্ষিণ্যে প্রাপ্ত ? অথবা এই বিভাজন, স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রামের ফল ? আসলে, প্রদ্যুম্ন রাজনৈতিক বন্দীর সঙ্গে সাধারণ কয়েদীদের সুসম্পর্ক ও যৌথ প্রতিরোধের কাহিনী পড়ে অন্য একটি সম্পর্কের দিকে খেয়াল করেননি—রাষ্ট্রের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীর সম্পর্ক। রাষ্ট্র সমস্ত বন্দীকেই 'সাধারণ অপরাধী' হিসাবে দেখে ; রাষ্ট্র চায় রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে অস্বীকার করে তাকে সাধারণ অপরাধীদের স্তরে নামিয়ে আনতে, তার ব্যক্তিসত্তাকে চরম অবমাননা করতে। রাষ্ট্রের আনুগত্যের ও কর্তৃত্বের বিরোধিতার অর্থই 'রাজদণ্ড' : যার আধুনিক কাঠামোগত ব্যবস্থা হল জেল, প্রদ্যুম্ন মিশেল ফুকো থেকে মনুসংহিতার উদাহরণ টেনে আমাদের বুঝিয়েছেন। এবং তাই যদি হয়, তাহলে রাজনৈতিক কয়েদীর জেলের অভ্যন্তরে তাঁর রাজনৈতিক সত্তার দাবি, মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম বা স্বীকৃতি রণজিৎ গুহ বিবৃত ছক অনুসারে কেন কর্তৃত্ব-আনুগত্য দ্বান্দিক সম্পর্ক ভাঙার যথাযথ দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে না ? রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা দাবির দীর্ঘ সংগ্রাম কেন রাষ্ট্রকর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের ও মতাদর্শের পাল্টা ক্ষমতা জাহিরের, পাল্টা মতাদর্শ স্থাপনের, নাগরিক তথা মানবিক সত্তার বিকশিত হওয়া ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নজির হবে না ? রাষ্ট্র যখন 'ভয়ঙ্কর' রাজনৈতিক বিরোধীদের নাম ধাম, গোত্র, ব্যক্তিহীন একটি বিশেষ বর্গে রূপান্তরিত করে (যেমন, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, আসাম, অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবাংলা-সহ সর্বত্র সশস্ত্র পথে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীকে 'জঙ্গি, 'সন্ত্রাসবাদী' 'উগ্রপন্থী' 'আতঙ্কবাদী, ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা) ও অনায়াসেই প্রচার চালায় 'অজ্ঞাতপরিচয় নকশালপন্থী বা উগ্রপন্থী' নিহত সাজানো সংঘর্ষে। তখন সেই বর্গ ভেঙে প্রত্যেকটি ব্যক্তির পরিচয় দেওয়া, তার সত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করা, রাষ্ট্রের সংজ্ঞার্থ অস্বীকার করে রাজনৈতিক কর্মীর রক্তমাংসের রূপ দেওয়া রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিশেষ অঙ্গ। দুর্ভাগ্য আমাদের যে, রাষ্ট্র-মাধ্যম এতদূর সফল এই প্রচারে যে রাষ্ট্র কাঠামোর তীব্র বিরোধী প্রদ্যুম্ন অবশেষে রাষ্ট্রের

প্রচারের ফাঁদে পা দেন : বিভাজন রেখার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যাসে ভাঁটা এনে, সন্দেহ পোষণ করে। রাষ্ট্র তো এটাই চায়—রাষ্ট্র-বিরোধীরাও যাতে যেন-তেন প্রকারেণ রাজনৈতিক বন্দীদের 'ক্রিমিন্যাল' গোত্রভুক্ত হিসাবে ভাবে, বিবেচনা করে ; সে ভাবনা ফুকো-গুহ ছক ধরে এলেও তাদের অবশ্য আপত্তি নেই। কার্যসিদ্ধিই রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র।

সুজাত ভদ্র
কলকাতা-১০

নাগরিক উদাসীনতাকেই আঘাত করতে চেয়েছি

সুজাত ভদ্র আমার লেখা ('জেলখানা আর জেলখানার অন্যেরা', যোগসূত্র, এপ্রিল-জুন, ১৯৯২) পড়ে নানা আপত্তি, অনুযোগ আর প্রশ্ন তুলেছেন। সাধ্যমত আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

সুজাত আমার লেখাকে 'ফুকো-গুহ ছকে' বিশ্লেষণ বলেছেন। মিশেল ফুকো বা রণজিৎ গুহর বিভিন্ন লেখার ছাপ নিশ্চয়ই আমার লেখায় পড়েছে। রাষ্ট্র, তার জেল-জরিমানা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে কোনো আলোচনা আজকের দিনে বোধহয় ফুকোর দিক-নির্দেশী বিশ্লেষণ ছাড়া সম্ভব নয়। আবার গুহর এদেশের রাষ্ট্র এবং সমাজ জীবন নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী নানা লেখার প্রভাবও আমার ওপর সক্রিয়ভাবে পড়েছে। আর শুধু গুহই বা কেন? গুহর সহযোগী 'সাব অলটার্ন' লেখকগোষ্ঠীর অনেক লেখাই, বিশেষ করে গৌতম ভদ্রের ভোজপুরের কৃষক প্রতিরোধের ঐতিহ্য নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নিম্নবর্গের মানুষজনের ওপর রাষ্ট্র এবং তার সহায়ক ক্ষমতাবানদের দাপট এবং তার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মানুষজনদের দৈনন্দিন প্রতিরোধের নানা দিকের তাত্ত্বিক হদিস দিয়েছেন জেমস স্কট এবং তাঁর সহযোগীরা।[১] পছন্দমতো এর মধ্যে থেকে সচেতনভাবে 'ছক' ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজটি আমি করেছি। পছন্দসই নানা তাত্ত্বিক ছক বেছে নেবার পেছনে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার চাপও খানিকটা ছিল। আবেগের ব্যাপারটাও অস্বীকার করতে পারি না। রাষ্ট্রশক্তি আর তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ক্ষমতাবানদের ভীতিপ্রদ অস্তিত্বের মুখোমুখি হওয়া এক সাধারণ অভিজ্ঞতা। এই সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চারপাশে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা অন্যায়, অবিচার এবং এগুলির প্রতি 'ভদ্র নাগরিক সমাজের' (আমি নিজেও যার মধ্যে পড়ি) ঔদাসীন্য আর নির্বিকারে মেনে চলাকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল। আর এই উদ্দেশ্যসাধনেই এই সমস্ত তাত্ত্বিক ছকের দ্বারস্থ হওয়া।

আমি আমার লেখার কোথাও 'হনুমান'কে 'অচেনা জগতের' হদিস দেবার ব্যাপারে সর্বপ্রথম' বলে দাবি করিনি। 'হনুমান' পড়ে আমার যে অনুভূতি তাই আমি আমার লেখায় বলার চেষ্টা করেছি। মীনাক্ষী সেনের 'জেলখানার চালচিত্র' অথবা সুরমা ঘটকের 'শিলং জেলের ডায়েরী' পড়ার সুযোগ আমার হয়নি স্বীকার করছি। এ দুটির কথা জানানোর জন্যে সুজাত-কে ধন্যবাদ। জেলখানার 'অন্যদের', বিশেষ করে মেয়েদের নিয়ে লেখা হয়ত আরও আছে। তবে প্রয়োজনটা হচ্ছে তাদের সম্পর্কে আমাদের অপরিচিতির যে অভ্যাস তাকে কাটিয়ে উঠে, তাদের কণ্ঠস্বর, তাদের একান্ত নিজস্ব জগত, তাদের বেঁচে থাকা, প্রতিরোধের কায়দা ইত্যাদি গুরুত্ব সহকারে বোঝা। আর এই ব্যাপারে 'হনুমান' যে অনবদ্য সেটা নিশ্চয়ই সুজাত স্বীকার করবেন।

সুজাত তাঁর পত্রে অনুযোগ জানাচ্ছেন যে 'নাগরিক সমাজের একাংশ রাজনৈতিক

বন্দীমুক্তি হওয়ার পরেই নিশ্চিন্ত হয়', আমার এই মন্তব্য 'উক্ত একাংশের প্রতি অবিচার'। কিন্তু আমি কি তাই বলেছি? আমি বলেছি, 'রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বন্দীমুক্তি আন্দোলনও শুরু হয়। নাগরিক সমাজের একাংশ এই আন্দোলনে সামিলও হয়। আন্দোলনের চাপে সরকার বাধ্য হয় এই দাবি মেনে নিতে। সরকার বাহবা পায়, নাগরিকরাও নিশ্চিন্ত হয়'। আমার লক্ষ্য কিন্তু 'নাগরিক সমাজের একাংশ' নয়। আমার লক্ষ্য ছিল বৃহত্তর ভদ্র নাগরিক-সমাজ যাঁরা সব অবস্থাতেই দিব্যি ভাল থাকেন এক আশ্চর্য নির্বিকার ভাব অবলম্বন করে। সব কিছুকে 'স্বাভাবিক' ধরে নিয়ে নাগরিকদের এই ঔদাসীন্যকে আঘাত দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য।

আর 'নাগরিক সমাজের একাংশের' প্রচেষ্টার কথা আমরা জানি। দীর্ঘদিন ধরেই নিরাপরাধ বন্দিনী, নির্যাতিতা মানসিক বন্দিনী আর সাধারণ অপরাধীদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে তাঁরা সক্রিয় রয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন করে সাফল্যও লাভ করেছেন। থানার লক-আপে পুলিসি অত্যাচার, মৃত্যু ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁরা প্রচার চালিয়েছেন, এই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। এবং 'নাগরিক সমাজের একাংশ' কর্তৃক সংগৃহীত এই সমস্ত তথ্যের গুরুত্ব এত বেশি যে ভদ্র নাগরিক সমাজের প্রচার মাধ্যমও এগুলিকে উপেক্ষা করতে পারে না। প্রচারমাধ্যমগুলিতে প্রকাশিত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত প্রতিবেদনে 'নাগরিক সমাজের একাংশের' নানা প্রচেষ্টার কথা তাই নজরে পড়ে। খুব সম্প্রতি এ রাজ্যের মানবাধিকার সংক্রান্ত সরকারি সভায় 'একাংশের' প্রতিবাদী ভূমিকার কথাও সেখানে পেয়েছি।[২]

দুটি প্রশ্ন আর আমার বক্তব্য :

আমি আমাদের লেখায় 'রাজনৈতিক বন্দী' আর 'সাধারণ অপরাধীদের' মধ্যে বিভাজন রেখা টানার দৃঢ়প্রত্যয়ী অভ্যেসে ভাঙনের কথা বলেছি। এবং সুজাত আমার এই বক্তব্যকে 'হাস্যকর' বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, সাধারণ বন্দীদের প্রতিরোধের দৈনন্দিন কর্মসূচী আছে বলেই কি এই বিভাজন রেখা টানা যায় না। আসলে আমার এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এটা দেখানো যে সাধারণ অপরাধী, বিশেষ করে যাদের কথা জয়া মিত্র তাঁর বইতে বলেছেন তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপও বাইরে সামাজিক-পারিবারিক জীবনে আর জেলের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ ইত্যাদি অন্য আরেক ধরনের রাজনীতির ইঙ্গিত দেয়। কারণ, এ পোড়া দেশে কোনোরকমে বেঁচে-বর্তে থাকার তাগিদ বা একান্ত আপনার কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরতে সচেষ্ট মানুষজনের 'অপরাধ' কি ক্ষমতার নানা দাপটের বিরুদ্ধে আরেক ধরনের প্রতিরোধ নয়? সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে রাষ্ট্র, জেল-জরিমানা, সামাজিক বিধিনিষেধের ভয় থাকে, থাকে শাসকগোষ্ঠীর পছন্দমাফিক। নিম্নবর্গের মানুষজনকে গড়ে-পিটে নেবার নানা মতাদর্শগত আয়োজন। এত কিছু বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও এই সব মানুষ একান্ত নিজস্ব কায়দায় তার মুখোমুখি হয়, দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় তারা তাদের আশপাশের জগত আর তাদের জীবন,

চিন্তাভাবনার ওপর খবরদারি করা ক্ষমতাবানদের বোঝে, প্রতিবাদ করে। আধিপত্য প্রতিরোধের এই সম্পর্ককে কি 'রাজনৈতিক' বলা যাবে না? ভদ্র নাগরিক-সমাজের কাছে 'রাজনৈতিক' বলতেই একমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিরই ছবি ফুটে ওঠে, নির্দিষ্ট সংগঠন আর কর্মসূচী যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পরিচিত ক্ষেত্রের বাইরে 'অন্য রাজনীতি'র গোপন প্লাবনের কথাই আমি বলতে চেয়েছি।

সুজাত বলেছেন, 'সাধারণ কয়েদীদের প্রতিরোধ ক্ষণিক, দিশা অসম্পূর্ণ।' আর এই-খানেই সুরমা ঘটকদের প্রয়োজন যাঁরা 'অন্যদের' রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নানা চেহারাকে চেনান প্রকৃত মুক্তির কথা ভাবেন উন্নততর মানবিক সমাজজীবনের মধ্য দিয়ে। তা 'অন্যদের' প্রতিরোধ কি ক্ষণিক? নিশ্ছিদ্র সন্ত্রাসের আবহাওয়ার মধ্যেও কিন্তু তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে একান্ত নিজস্ব কায়দায়, লেখিকা তাঁর বিবরণ দিয়েছেন। জেলের নিয়মকানুন ভাঙা, কর্তৃপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করা, গুনতিতে বাধা দেওয়া, গরাদে প্রবেশ করতে অবাধ্য হওয়া, জেলের কর্তাব্যক্তি আর তাদের সহযোগীদের গালাগালি দেওয়া, তাদের ব্যঙ্গ করা, হই-হট্টগোল করা দৈনিক প্রতিরোধের অঙ্গ। দৈনন্দিন এই প্রতিরোধ আমাদের নজর এড়িয়ে গেলেও, এই ধরনের প্রতিরোধ তাদের বেঁচে থাকার শর্ত, ক্ষমতার দাপটের বিরুদ্ধে এ যেন তাদের পাল্টা এক মূল্যবোধ।[৩]

আসলে এই ধরনের প্রতিরোধ অধিকাংশ সময়েই থাকে অঘোষিত। জেলখানার ভিতরে (বাইরেও) নিরন্তর সন্ত্রাসের আওতায় এই 'নিস্তব্ধ' প্রতিরোধ বোধহয় 'অন্যদের' কাছে সাময়িক মুক্তির আস্বাদ এনে দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতা আর তার সহযোগী নানা শাসক-গোষ্ঠীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সরাসরি তার মোকাবিলা করার জায়গায় হয়ত তারা সব সময় থাকে না, তাই অন্তর্বর্তী অবস্থায় তারা বেছে নেয় এই ধরনের প্রতিরোধ মাধ্যম। এই অজানা দিকের প্রতি নজর সম্প্রতি গবেষকেরা দিয়েছেন, গ্রামশ্চীর লেখাতেও আমরা এর ইঙ্গিত পেয়েছি। নিম্নবর্গের মানুষজন যে সাধারণত নিজেদের জীইয়ে রাখতেই অভ্যস্ত তার উল্লেখ করেছেন তিনি।[৪] আর নিজেদের জীইয়ে রাখতেই তারা গ্রহণ করে নানা পন্থা, সচেতনভাবে। রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতাবানরা নিম্নবর্গের আনুগত্য আদায় করতে গিয়ে মতাদর্শগত আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করে দমনপীড়নের নানা পন্থা, উদ্দেশ্য তাদের বশ্যতা আদায় করা। দুর্দমনীয়, অবাধ্য আর সক্রিয় বিরোধীরাই যে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় দমনপীড়নের শিকার হয় তা নয়, 'নিষ্ক্রিয়' থেকেও যারা বিরোধিতা করে তারাও এর হাত থেকে রেহাই পায় না।[৫] জেলের অভ্যন্তরে বন্দীদের সক্রিয় প্রতিরোধের পাশাপাশি 'নিষ্ক্রিয়' প্রতিরোধের নানা নিদর্শন আমরা পেয়েছি। আমরা দেখেছি কীভাবে তারা ছোটখাট নানা প্রতিরোধ গড়ে তুলে নিজেদের অস্তিত্ব জীইয়ে রাখে। অধিকাংশ সময়ই এর কোনো খবর মেলে না। তাই 'অন্যদের' প্রতিরোধকে 'ক্ষণিক' বলাটা বোধ হয় অনুচিত। তাদের প্রতি সুবিচার দেখাতে গেলে বোধ হয়— অজানা 'নিস্তরঙ্গ' প্রতিরোধের দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ তাদের জীবনে এর গুরুত্ব অপরিসীম।[৬]

তবে এই দৈনন্দিন প্রতিরোধের ধারাকে আদর্শায়িত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখানেও হার-জিত আছে, টানাপোড়েন আছে। প্রচলিত ব্যবস্থায় বিরাট কিছু পরিবর্তনও এর ফলে হয়ত ঘটে না। 'অন্যেরা' অনেক সময় নিজেদের মধ্যেও নানা সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে, 'হন্যমানে' আমরা পাচ্ছিও তার বিবরণ। 'ঘর মুছবার সময় কেউ বসে আছে বলে, তার চারিদিক দিয়ে ঘুরিয়ে মুছে নিলে মাথা ফাটাফাটি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। ও রকম ঘেরা দিলে নাকি সে আর ঘেরার ভেতর থেকে বের হতে পারবে না কোন দিন' (পৃ. ২৫)। আবার তারাই জেল কর্তৃপক্ষের লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তাদের অত্যাচারকে প্রতিহত করে। এই সমস্ত ছোটখাট প্রতিরোধের ঘটনার মধ্যেই 'ক্ষণিক' 'বড় বড় ঘটনা' ঘটার সম্ভাবনা থাকে।

সুজাত বলছেন 'সাধারণ কয়েদীদের দিশা অসম্পূর্ণ'। আর সেই দিশা সম্পূর্ণ করেন 'রাজনৈতিক কর্মীরা' যাঁরা 'অন্যদের' রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নানা চেহারা আর টানা-পোড়েন সম্যকরূপে অবহিত করেন। 'প্রকৃত মুক্তির কথা ভাবেন উন্নততর মানবিক সমাজ জীবনের মধ্য দিয়ে'। আসলে সুজাতর কাছে 'সম্পূর্ণ' আর যথাযথ প্রতিরোধ হচ্ছে একমাত্র সেই সমস্ত যেগুলির পেছনে থাকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা, তত্ত্ব এবং উত্তরণের দিশা। আর এর বাইরে 'অন্যদের' যাবতীয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় এতকাণ্ডের হিসাব না পেয়ে সুজাতর কাছে তা হয়ে দাঁড়ায় 'অসম্পূর্ণ' ফলে 'প্রকৃত মুক্তি' থেকে তা পড়ে থাকে অনেক দূরে। এই দিক দিয়ে বিচার করেই সুজাত 'সাধারণবন্দী' আর 'রাজনৈতিক বন্দীদের' মধ্যে বিভাজন রেখা টানেন। আসলে পুরনো কমিউনিস্ট পার্টির ধারণায় বিভোর হয়েই সুজাত 'অগ্রগামী কর্মী' আর 'অসম্পূর্ণ দিশাগ্রস্ত' 'অন্যদের' মধ্যে স্তর ভেদ (hierarchy) রাখছেন। এমন স্তর ভেদের কি কোনো প্রয়োজন আছে? মার্কসীয় তত্ত্বের মধ্যেই তো 'রাজনৈতিক কর্মীদের' এমত 'অগ্রগামী' অবস্থান নিয়ে নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।[৭] আর তাছাড়া বাস্তবে 'অন্যদের' প্রতিরোধও তো হাজারো রকমের, তার রূপও বিচিত্র। এগুলি যে কেতাবি বিধিবদ্ধ তত্ত্বের নিয়মমাফিক অথবা সুজাত কথিত 'সম্পূর্ণ' হবে তারও কোনো মানে নেই। আর তা বোধহয় কস্মিন-কালেও হয় না। মনোমত না হলেই যে তা 'অসম্পূর্ণ' তা বোধহয় নয়। এই 'অন্য' অজানা বিচিত্র প্রতিরোধের নানা ঘটনার—মধ্যেই তত্ত্ব মিলে-মিশে একাকার হয়, সজীব হয়ে ওঠে।[৮]

সুজাত তাঁর পত্রের শেষের দিকে মন্তব্য করেছেন যে আমি রাষ্ট্রের সঙ্গে 'রাজনৈতিক বন্দীর সম্পর্ক খেয়াল করিনি। এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : রাষ্ট্র রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে অস্বীকার করে তাকে সাধারণ অপরাধীর স্তরে নামিয়ে আনে, তার ব্যক্তিসত্তাকে অবমাননা করে। এবং অন্যদিকে 'সশস্ত্র পথে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীকে রাষ্ট্র 'জঙ্গি' 'উগ্রপন্থী' ইত্যাদি বর্গে রূপান্তরিত করে তাকে নিশ্চিহ্ন করে। তাই সুজাতর প্রশ্ন—জেলের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক বিরোধীদের রাজনৈতিক সত্তার দাবি, মর্যাদা আদায়ের সংগ্রাম রাষ্ট্রকর্তৃক চাপিয়ে দেওয়া বিধিনিষেধের আর মতাদর্শের পাল্টা ক্ষমতা

জাহিরের, পাল্টা মতাদর্শ স্থাপনের নজির হবে না ? অথবা 'জঙ্গি' 'উগ্রপন্থী' ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বর্গ ভেঙে রাজনৈতিক কর্মীর আসল পরিচয় বার করার প্রচেষ্টাওতো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের এক বিশেষ ধরন ? তিনি সঠিকভাবেই বলেছেন যে রাষ্ট্র রাজনৈতিক বিরোধীদের মতাদর্শকে অস্বীকার করে তাদের মানবিক সত্তাকে অবমাননা করে। এই সমস্ত ঘটনা মোটামুটি আমরা জানি, নতুন করে তোলারও কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমার লেখায় এগুলি বলার সুযোগও নেই কারণ আমার আলোচনা প্রধানত 'হন্যমানে' বর্ণিত জেলখানার 'অন্যদের' নিয়ে। এবং আমার বক্তব্য ছিল রাষ্ট্র এই ব্যাপারটা 'অন্যদের' ক্ষেত্রেও ঘটায়। লেখার মধ্যে তার ইঙ্গিতও খানিকটা ছিল। রাষ্ট্র আর তার আইনের চোখে 'অপরাধ' হচ্ছে এক ধরনের অসুস্থতা, 'স্বাভাবিক মানসিকতা' থেকে এক ধরনের বিচ্যুতি। ইতোয়ারী, জায়দা, কমলা, বরদা এরকম আরও অনেককেই রাষ্ট্র নানা আইন আর 'কেসের' তাৎক্ষণিক ছকে ফেলে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে জেলবন্দী করে। চরম দমনপীড়ন চালানো হয় তাদের ওপর, তাদের মানবিক সত্তারও চরম অপমান করা হয়, উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় আইন ভাঙার বিপদজনক, বেহিসেবি প্রবণতাকে নির্মূল করা। নানা কেস আর ধারায় ফেলা হয় তাদের, নিজেদের মানবিক পরিচয় হারিয়ে তারা পরিণত হয় কিছু শীতল তথ্যে আর ফাইল নাম্বারে। আর এই সমস্ত তথ্যের চাপে হারিয়ে যায় 'অন্যদের' দৈনন্দিন জীবন, একান্ত আপনার কিছুকে বুকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার থাকার মূল্যবোধ এবং নিজস্ব কায়দায় গড়ে তোলা প্রতিরোধ। জেলের অভ্যন্তরে চরম সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেও তারা রুখে দাঁড়ায়, একে অন্যকে ছুঁয়ে থাকে অদ্ভুত মমতার সঙ্গে। নিদারুণ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আর 'মানবিক সত্তার চরম অবমাননার' বিরুদ্ধে এও এক ধরনের 'পাল্টা ক্ষমতা', 'পাল্টা মূল্যবোধ', আর 'পাল্টা আরেক মতাদর্শের' প্রকাশ। সুজাতরও এই ব্যাপারটা মেনে নিতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। তাহলে 'অজ্ঞাত নকশালপন্থী', বা 'অজানা উগ্রপন্থী' ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় বর্গ ভেঙে তাদের 'রক্তমাংসের রূপ দেওয়া', তাদের পরিচয় প্রকাশ করার পাশাপাশি 'অন্যদের' ওপর চাপিয়ে দেওয়া 'সাধারণ অপরাধী' নামাঙ্কিত সার্বিক বর্গের আচ্ছাদন সরিয়ে তাদের হালহকিকৎ প্রকাশ করাও নিশ্চয়ই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আরেক অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি পাবে। কেস, ফাইল নম্বরের বদলে উঠে আসবে একের পর এক নানা মানুষের মুখ, তাদের মানবিক জগত এবং তাদের হারিয়ে যাওয়া কণ্ঠস্বর। আর তা না হলে নাগরিক মননে 'অপরাধ', 'অপরাধী' ইত্যাদি রাষ্ট্রীয়বর্গ সম্পর্কে ধারণা আরও জোরদার হবে, 'সামাজিক সুস্বাস্থ্য' বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর রাষ্ট্রও খানিকটা নিশ্চিন্ত হবে।

সুজাত গুরুত্ব দিয়ে আমার লেখা পড়েছেন, নানা মন্তব্য আর প্রশ্ন করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। নানা প্রশ্ন তোলায় আমিও আমার বক্তব্য কিছুটা খোলসা করে বলার সুযোগ পেলাম। শুভেচ্ছাসহ,

প্রদ্যুম্ন বন্দ্যোপাধ্যায়
কলকাতা-৯

গ্রন্থসূত্র :

১. 'অনীক' প্রবন্ধ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত ভোজপুরের কৃষক সংগ্রাম সম্পর্কে গৌতম ভদ্রের প্রবন্ধ।
জেমস স্কট (সম্পাদিত), 'এভরিডে ফর্মস অফ পিজান্ট রেজিসট্যান্স ইন সাউথ-ইস্ট এশিয়া', ফ্র্যাঙ্ক ক্যাস, লন্ডন, ১৯৮৬।

২. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩০ আগস্ট, ১৯৯২, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯২।

৩. নিম্নবর্গের মানুষজনের নিজস্ব পাল্টা মূল্যবোধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন বেনেডিক্ট কার্কলিয়েট তাঁর 'এভরিডে রেজিসট্যান্স টু ইনজাস্টিস ইন এ ফিলিপাইনস ভিলেজ' প্রবন্ধে, জেমস স্কট (সম্পাদিত) 'এভরিডে ফর্মস··· ।'

৪. আন্তোনিও গ্রামশ্চী 'সিলেকসন্স ফ্রম প্রিজন নোটবুকস,' নিউ ইয়র্ক ১৯৭৮, পৃ. ২৭৩।

৫. আন্তোনিও গ্রামশ্চী, ঐ পৃ. ১২।

৬. জেমস স্কট, 'এভরিডে ফর্মস অফ পিজান্ট রেজিসট্যান্স', পূর্বোল্লিখিত পৃ.-পৃ. ৫-৩৫ ;

৭. আন্তোনিও গ্রামশ্চী, পূর্বোল্লিখিত, পৃ.-পৃ. ১৯৮-১৯৯।

৮. আন্তোনিও গ্রামশ্চী, ঐ, পৃ. ২০০।

কোনো ধর্মেই
খুনের প্ররোচনা নেই। এ
এক বর্ণাঢ্য সমারোহ। ভালবাসা
ও পরস্পরের প্রতি আগ্রহ-আকর্ষণ-ই
বেড়ে যায় এই প্রশান্ত স্বাতন্ত্র্যে।
অস্ত্র ও আগুনের মুখ থেকে
প্রতিবেশীকে বুক দিয়ে বাঁচিয়ে
বছর শেষের ভয়ঙ্কর দিনে তার
প্রমাণ দিলেন মহাপ্রাণ
অনেকে।

কবির বুক ও মাথা

রবি সেন

"ঢ্যাঙা, বেঁটে কবিরাও তোমাদের বিজ্ঞাপনে হেঁটে যাচ্ছে ; 'জাতীয় সংহতি' বা ঐরকমই একটা ইস্যুতে—"

এ কথায় সুমন্ত ফোয়ারার মতো হাসে, উদ্দেশ্যরঞ্জিত বা স্বভাবজনিত যাই হোক না কেন, বলে, "হোয়াটস্ দ্য হার্ম ! আপনাদের রবি ঠাকুরও মিষ্টান্ন, দধির গুণগান করে দু' চার লাইন বিজ্ঞাপন লিখে দিয়েছেন শুনেছি।"

আমি 'তোমাদের বিজ্ঞাপনে' বলেছি সে টি.ভি-র সঙ্গে যুক্ত আছে বলে, কিন্তু সুমন্ত কেন 'আপনাদের রবি ঠাকুর' বলে ঠিক বোধগম্য হয় না, কিঞ্চিৎ ঠেস আছে এটুকু ছাড়া।

"তোমরাও কবিকে নিয়ে কম টানাহ্যাঁচড়া কর না।"

"কী রকম, খুব ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে !"

"তাই ! এই যেমন ইন্দিরা-পুত্র নিহত হলেন। টি.ভি-তে সঙ্গীতের 'প্রবাদ-প্রতিমা' গাইতে বসলেন 'হে মহান…' বা 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু'…"

বিজ্ঞাপন নিয়ে কথা হচ্ছিল। কথার পিঠে কথা। গড়িয়ে যেতে কবির কথা এল। একজন ফুটবলার বা ক্রিকেটার, নেতা বা ম্যাটিনি আইডল-এর মতো কবিও কি… পার্থক্য নেই ! না, সুমন্তকে প্রশ্ন করিনি। তার আগে সে বলে, "মিছিলে হাঁটলে বলবেন—মিনার থেকে কবি নেমে এসেছে, সভা-সমিতি করলে হাততালি, দল বেঁধে প্রতিবাদ জানাতে স্বাক্ষর-সংগ্রহে নিজের সিগনেচার পাশে রাখবেন। শুধু বিজ্ঞাপনের জন্য মন খারাপ হবে কেন ! এটাও একটা ফর্ম…"

"দেখ সুমন্ত, বিজ্ঞাপনে 'জাতীয় সংহতি' আর তাতে কবি ! থাক এ প্রসঙ্গ। তবু বলি, পণ্ডিতজী তাঁর দিনকালে ভারতাত্মার রূপ খুঁজতে বড় বই লিখেছিলেন। তাঁকে কেউ বলতেন 'চ্যাটার-বক্স', কেউ-বা বলেন 'জেন্টেল কলোসাস্'। সম্প্রতি আরেকজন বিদেশে ঘুরে এসে গল্প ফাঁদলেন তাঁকে মেকঙ-পারের কমরেডরা বলেছেন, তোমরা ভারতবর্ষের প্রগতিবাদীরা যদি পণ্ডিতজীর কাঁধে আরেকটু কাঁধ লাগাতে, তাহলে ইত্যাদি…"

সুমন্ত আরেকবার হাসে। এ সময় মুখোশ পরে ঘরে ঢোকে তাতুন, আমার ভাইপো, 'হরর্ আর কমিকস্'-এর জ্যান্ত কিশোর। এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

কথা আর এগোয়নি। সে একসময় ওঠে।

সুমন্ত চলে যেতে মুখোশধারী আবার ঘরে ঢোকে। বলে, "জান কাকু, বাজ-পাখি একশ বছর বাঁচে। আমি দেখেছি।" ফের সে দৌড়ে বেরিয়ে যায়।

আমি এক বৃদ্ধকে জানতাম। নব্বই ছুঁয়েছিলেন। সম্প্রতি তিনি মারা গেছেন।

আমি তাঁর ডায়েরি পড়েছিলাম। গোপন দুঃখের দিনে তিনি ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। এ তাঁর মৌখিক স্বীকৃতি। আর তা পড়ে জানি 'তাঁর সব দিন' তাঁর ডায়েরিতে নেই। তবে কী বিশেষ দিনগুলি—এটা আমার অনুমান। এবং যেসব দিন তাঁর লেখালেখিতে ধরা ছিল তার মধ্যে কবিতা বিশেষের দু-চার পঙ্‌ক্তির উল্লেখ দেখেছি। ঠিক এ ভাবে বললে যথাযথ হবে না ; কবিতা তাঁর ডায়েরির বিবরণে মিশে ছিল। এ ভাবেই অনেক কবি তাঁর দিনপঞ্জীতে ধরা পড়ে। কোনো কোনো কবি একাধিক বার। একদিন তাঁর কাছে হাইনের আবৃত্তি শুনেছিলাম। আর তাঁর লেখা থেকে জানি যখন তিনি অনেক রাত অবধি জাগতেন, বা জেগে থাকতে হতো, তখন তিনি কবিদের দেখা পেতেন। এও এক ধরনের অভিজ্ঞতা যা নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না। সাদা-মাটা বেঁচে থাকা, অন্তত বাইরের অবয়বে, হৈচৈ না ফেলে চলে যাওয়া, ডায়েরি লেখা এবং কবিদের দেখা পাওয়া—এসবই আমাদের প্রথাবদ্ধ ধারণার বিপরীতে আমাদের দিকে কী সব ইশারা করছে।

এ কথাই সুমন্তকে বলেছিলাম। বৃদ্ধের ডায়েরি লেখার কথা। কিন্তু আমাদের আলাপ বিজ্ঞাপনে কবিদের অংশগ্রহণের বিতর্কে শেষ হয়েও হল না। মুলতবী আছে। থাকবে। আবার অন্য কোনোদিন—হয়তো সুমন্তর সঙ্গে নয় বা তারই সঙ্গে। ঘরের আগুনে ঘর, দেশ, যেদিন প্রাসাদ জ্বলবে সেদিন এ বিতর্ক অন্য চেহারা নেবে।

এমন সময় তাতুন আবার ঘরে এল। "জান কাকু, টিনটিন একদিন ভারতবর্ষে আসবে, খুব জলদি।"

"তুই জানলি কী করে ?"

"আমি সব জানি। 'হরর্ আর কমিকস্' পড়লে সব জানা যায়।" সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চোরকাঁটার মতো যে লেখালেখি বিঁধে আছে সেও তো কবিকে নিয়ে। দশ বছর হাঁটাহাঁটি করে শেষে রাজী করিয়েছি। তবে, ষোল পৃষ্ঠার। বলে কী না—আপনার থিসিস কে ছাপবে, মশাই, ঘরে তো হাঁড়ি চাপাতে হবে।

নাটক-নভেল বৃত্তান্তকে থিসিস বলছে। বেটা আহাম্মক। অথচ গল্প-কাহিনীই ছাপে। এসব কথা তো মুখোমুখি বলা যায় না, তবে তো মুখ দেখাই বন্ধ হতো। তবুও তো দশ বছর ধরে হাঁটাহাঁটির সুযোগ পেয়েছি। শেষে ষোল পৃষ্ঠা মঞ্জুর, তবে নাটক-নভেল—ঐ থিসিস চলবে না। দশ বছর ধরে হাঁটাহাঁটি করে একটা সখ্যতা জন্মেছে। তারই স্বীকৃতি ঐ ষোল পৃষ্ঠা। বলেছি—আমার ট্যাবলোটাই ছাপান—'ডাকঘর' নাটকটি। ভদ্রলোক বিষম খেয়েছেন। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে বলেছেন—'ডাকঘর' ? শেষে জেল খাটাবেন নাকি ?

—আসলে কী জানেন, এটা তাঁরই 'ডাকঘর' নাটকের পুনর্লিখন। তাই নামটা পালটাইনি।

—এটা আপনি 'বিশ্বভারতী'তে জমা দিন।

—ঠিকানা জানা নেই, শান্তিনিকেতনে কোনোদিন যাইনি। যদিও একসময় কাছেই থাকতাম।

—বলেন কী মশাই! বাঙালীর ছেলে, লেখালেখি করার ইচ্ছে আছে, অথচ···

এখন এইসব বাক্যালাপ আমি কিছুটা মনে করতে পারছি।

তাতুন আবার উঁকি মেরেছিল। আমি নিভৃতে আমার প্রকাশককে স্মরণ করি, বলি, বয়ঃসন্ধিকালে এই 'ডাকঘর' নাটক পড়েই আমাদের কবির প্রতি আমার ভীষণ অভিমান হয়েছিল ; সেই থেকে ঠোঁট ফুলে আছে।

সুধার প্রবেশ

সুধা

অমল।

রাজকবিরাজ

ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

সুধা

আমি যে তার জন্য ফুল এনেছি—তার হাতে কি দিতে পারব না।

রাজকবিরাজ

আচ্ছা, দাও তোমার ফুল।

সুধা

ও কখন জাগবে।

রাজকবিরাজ

এখনি যখন রাজা এসে তাকে ডাকবেন।

সুধা

তখন তোমরা ওকে একটি কথা কানে কানে বলে দেবে ?

রাজকবিরাজ

কী বলব।

সুধা

বোলো যে, সুধা তোমাকে ভোলেনি।

প্রকাশকমশাই, এ কথাটাই অমলকে বলার দায়িত্ব আছে। তাই পুনর্লিখন। এর জন্য প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হবে কেন ? একে কি স্পর্ধা বলে···যদি তাই হবে তবে সুধাই সেই স্পর্ধা দেখিয়েছে। কেননা সে বিশ্বাস করেছিল অমল আবার জেগে উঠবে। অথচ কত্তার ইচ্ছায় কম্মো। কবি নিজেই যে ঠাকুরদার চরিত্র গড়েছিলেন, তাঁর কাছে কবি নিজেই কখন হার মেনে বসে আছেন। তাই···

আর আপনি একদিন তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন, ষোল পাতার একখানা ঠাসা ভ্রমণ-কাহিনী লিখে দিতে। অথচ আপনি জানেন না লেখা মাত্রই ভ্রমণ। জার্নি। যে থেমে থাকে তার হাত থেকে কলম ছিটকে পড়ে।

হোক না ষোল পৃষ্ঠার, তা বলে এ সুযোগ হাতছাড়া করা চলবে না। চটি বই, তাতে কী, চটিজুতোও কী কম কাজে লাগে? সুতরাং ঠাসা ভ্রমণ-কাহিনী—মন্দির-মসজিদ, মঠ-বিহার, দুর্গ-প্রাসাদ, স্থাপত্য-কলা, পাহাড়-সমুদ্র, নদী ও প্রকৃতি, মানুষ-জন, খাবার-দাবার, রেশমি চুড়ি বা পাথরের মালা, গামছা—'মহাপ্রস্থানের পথে' যেতে যেতে রাণীর সঙ্গে দেখা হলে···ঠাসা হওয়া চাই। কিন্তু বেয়ারা আমার স্বভাব—পথের পাশে পাথরের মালা দেখার ধৈর্য নেই, রাণীর দেখা পেলে বলতে পারি (কী বলতে পারি!)··· তবে ঠাসাঠাসি ট্রেনের কামরায় দুঃখী মানুষ কী ভাবে আমের খোসার আচার দিয়ে বিরল তৃপ্তিতে বাসি রুটি খায় এসব লক্ষ করেছি; ঐ সমুদ্রের ঢেউ বার বার ঘুমের মধ্যে আমার ওপর আছড়ে পড়েছে। প্রাচীন চাঁদ ও বালিয়াড়ি, অচেনা পাখি বা লম্বা দড়ি, ঠিকই, যা ঢেউয়ের সঙ্গে ভেসে আসে, এ সবকিছুই আমাকে আগামী দিনের সংকেত জানিয়ে যায়। এবং দুর্গবাড়ি তাকে ঔরঙ্গবাদ থেকে ইলোরার পথে যেতে যেতে দেখি বা না দেখি, তার চেয়েও রহস্যময় কিছু আমি কলকাতাতেই পেয়ে যাই। একবার আমি বন্দী হয়েছিলাম। কোর্ট লক-আপ থেকে ক্যাসেলের ধূসর পথ ধরেই আমাকে হুজুরের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। তখন ভ্রমণের ঐ দুর্গবাড়ি আমার কাছে খেলনা সদৃশ মনে হয়। তথাপি আমি ছায়াবিহীন অবস্থায় কাউকে বলিনি—তফাৎ যাও! চোর, খুনী, প্রেমিক বা জোচ্চোর সকলেই হুজুরের কাছে তাদের ছায়া ফিরিয়ে দেবার জন্য যার যার মতো···

ছায়া ফিরে পেয়ে ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে আড়ালে রেখেছি। এবং দিনের শেষে বিরল তৃপ্তিতে মদ ও রুটি স্পর্শ করেছি। আমার রেশন।

এসব চলবে?

নাকি কেল্লার অ্যাডভেঞ্চার বা মায়া-দ্বীপের কথা! যদি সীমান্ত-যাত্রার কথা বলি তবে আউট পোস্টে নির্ঘাৎ এক কবির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথা বলব।

কেননা কবিরা আউট পোস্টে থাকেন। এই তার অন্তিম অবস্থান। চূড়ান্ত। নির্ধারিত। (বেয়াড়া) আমার বিশ্বাস। এবং আহ্লাদে ভাবি, চটি বইটা এক কবিকেই উৎসর্গ করব।

তোমাকে দিলাম—দশ বছর হাঁটাহাঁটির সুবাদে এই বিরল সুযোগে, শুধু তোমাকেই দিলাম—

কিন্তু কোন কবিকে—

কফির আড্ডায় সেই যুবা যে কিছুসময় সঙ্গ দিয়ে উঠে যেত; দরজার কাছে গিয়ে কিছু ফেলে গেছে এমন মুখ করে ফিরে এসে কানের কাছে বলত, চার আনা হবে? আমাকেই। আড়ালে গিয়ে তাকে ২৫ পয়সা দিতাম। সে আড়ালই পছন্দ করত।

পঁচিশ পয়সা। কম কী! তখন সোনার দাম ছিল—মনে নেই। এখন চার হাজার টপকে গেছে। তখন তিন টাকায় এক কে. জি চাল আর এক শিলিং ৭০/৮০ পয়সা হিসাবে ১০/১৫ শিলিং-এ হাইনে—রিলকে—ব্রেশ্ট্ পাওয়া যেত। সেই খুনী

ফরাসী লেখকের নাটক, সার্ত্র যাকে সন্ত বলেছিলেন। এখন কাঁচালঙ্কার দর মাঝেমধ্যে ২৫ টাকা কে. জি-তে ওঠে। আর জীবনানন্দ দাশ বা মানিক···

সেই যুবা কবিতা লিখত। কেমন অ্যানিমিক শরীর নিয়ে চলাফেরা করে। একদিন সর্বোচ্চ এক টাকা চাইল। দিলাম। খুশীতে জানাল কাল সারারাত কবিতা লিখেছে। এবং ভোররাতে জ্ঞান হারিয়েছিল।

—তবে আজ পথে কেন।

—এখানে না আসলে মন ভাল থাকে না।

অনেকদিন তাকে পাইনি। একদিন পথেই দেখা। জানাল, মন ভাল নেই।

আমি উদ্বিগ্ন হয়েছি। কেননা শিল্পের যেমন সুষমা, তেমনি কবিদের মন ভাল রাখতে হবে। ক্রোধ নয়, হতাশা নয়, বা কোনো অভিসন্ধি—তাকে নিষ্পলক প্রশান্তিতে (তাও কি সম্ভব) কবিতাকে সেই আউট পোস্ট থেকে গড়িয়ে দিতে হবে দুর্বার গতিতে, কখনো বা মন্দ মন্থরে···

না কি মানিক-কে। সূত্র সেই চার আনা পয়সা। তবে বলি, বন্দ্যোঃ যেদিন মারা গেলেন সেদিন তাঁর পরিচিত আরেক কবির অনুযোগের উত্তরে মানিকের স্ত্রী জানান, স্বামীর নিদারুণ অসুস্থতার কথা পাবলিক ফোন থেকে জানাতে গেলেও যে তাঁর চার আনা পয়সার দরকার ছিল !

জীবন কিছু দাবী করে। চার আনা পয়সার সূত্রেই রক্তের মতো জমাট অন্ধকার আর আলো হাতড়ে তাকে পা ফেলতে হয়···সন্তর্পণে···কখনো শুধুই অপেক্ষা···কী, কেমন বুঝছেন, প্রকাশকমশাই।

তাতুন আবার ঘরে এল। তাক থেকে পিস্তল নামিয়ে বলল, "জান কাকু, বাজপাখি শিকারী ; কিন্তু ওর চোখ জোনাকপোকার মতো সফট্। আর উড়িষ্যার মন্দিরে দেখেছি মহাকালের জোড়া-চোখ ঠিক মরুভূমির দস্যুর মতো। বড় বড়। ভয় করে", অনর্গল এইসব বলে পিস্তল তাক করে।

আমি রহস্য করে বলি, "মহাকালকে ?"

সে এক কথায় রা না করে শুধু জানায়, ঐ মহাকালের চোখ জোড়া সে উপড়ে আনবে। তার চাই।

—আমার চাই। সেই দামাল কবি বলেছিল। ভাষা চাই, ভঙ্গি চাই। বিদ্ধ করার জন্য ব্যঞ্জনা—বসন্তের মাতাল বাতাসের সঙ্গে পৌষের অটুট ইশারা। তার ঠোঁট চুইয়ে রক্ত পড়ছিল, একটা স্ট্রীট অপারেশন থেকে ফিরছে। অনুমান, গ্রেনেডের মুখের শক্ত তার দাঁত দিয়ে ছিঁড়তে গিয়ে এইসব রক্তটক্ত···

সে নিজেই বলেছে, পালিয়ে আসিনি। পুলিশ-মিলিটারি রিট্রিট করতে আমরা ডিসপার্স করলাম। একটা শহীদ বেদী ভেঙে ফেলেছিল। আমরা নতুন করে গড়েছি। ওরা আসবে শুনে দুপুর থেকে আমরা দুটো স্ট্রীট, তিনটে বাই-লেন ও একটা লেনের মুখে ব্যারিকেড করে পজিশন নিলাম। পাক্কা চল্লিশ মিনিট হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। আমাদের

ক্ষয়ক্ষতি সামান্যই হয়েছে। চারদিকে জনবসতি, সেই সুযোগটা আমরা নিয়েছি।
—ভাল কথা ; কিন্তু মাস্ রি-অ্যাকশন কী ? শ্রমিক আর শহুরে গরীবগুর্বোরা কি সাড়া দিয়েছে ?
—গেরিলা স্কোয়াডের কাজই তো সঠিক কারণে অ্যাকশন করা, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা।
—কিন্তু এই অ্যাকশন অন্যান্য অংশকে যদি সংগঠিত না করে ?
—অন্তত উৎসাহ পাবে, বল-ভরসা পাবে।
—কিন্তু এই উদ্দীপনা প্রতিদিনের জীবনে, বৃত্তিতে, নানা স্তরে যদি দানা না বাঁধে ?
এ কথায় ঋতবান আমার দিকে কেমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু আমি জানতাম সে আমাকে বিশ্বাসই করে। না হলে সেই রাতের জন্য শেলটার নেবে কেন।
রাতে একই বিছানায় আমি আর ঋতবান, অনেকটা প্রাকৃতিক নির্ভরতায় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। জানতাম আমার ঘুম ভাঙার আগে খুব ভোরে চা না খেয়েই সে এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। এমনটাই ওর চলাফেরার ধরন। মা একই ঘরে পাশের খাটে শুয়ে জেগে আছেন। স্বচ্ছ অন্ধকারে তার জেগে থাকার উৎকণ্ঠা (আমারও) বেশ অনুভব করেছি। মার বুকে কি স্বদেশী কোনো গান গুনগুন করছিল, (এই সেদিন পর্যন্ত তো তিনি আপনমনে, আনমনে গান গেয়েছেন) না কি ছোটখাট কোনো অকিঞ্চিৎকর শব্দে তিনি কান পেতেছেন ; ও কিছু নয়, তিনি এবারে ঘুমোবেন। পাশের ঘরে তাতুন ওর বাবা-মার সঙ্গে। ঋতবান আসতে সে তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেয়েছিল। দুটি হাত ধরে বলেছিল—তোমার গায়ে বারুদের গন্ধ। ঋতবান হেসে বলেছে —বাতাসে।
সেই রাতে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল। হ্যাঁ, এভাবেই বলতে হয় বিষণ্ণতায় ঠাসা বিশ্রী ব্যাপার-স্যাপার…
মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে তাতুন চিৎকার করে ওঠে। সেই কৈশোরিক আর্তনাদ মধ্য-রাত্রির উৎকণ্ঠাকে বিজড়িত করে যেন সকলকে বার্ধক্যে পৌঁছে দিতে চায়। আর পরিবারের সকলে, ঋতবান সমেত, ঘুম থেকে আচমকা জেগে উঠে কিছুক্ষণের জন্য কেমন স্থাণু হয়ে পড়ে। এবং সেই বিহ্বল অবস্থার মধ্যে মা ও বৌদি টের পান যে তাতুনের গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমে বা স্বপ্নে সারা শরীরে আগুন লেগে গেলেই এইরকম তাপ সারা দেহে সঞ্চারিত হতে পারে।
—পাঁচ ডিগ্রি।
বালতি বালতি জল এল। এখন তা তাতুনের মাথায় ঢালা হচ্ছে। মা ওর কপালে জলপট্টি পাল্টে দিচ্ছে। বৌদি চৌকোণা একটা মাঝারি টিনের বাক্সে ক্রোসিন খুঁজছিল। টিনের বাক্সটি, যা বস্তুত তাতুনেরই জন্মদিনে উপহার সূত্রে পাওয়া প্যারী কোম্পানীর লজেন্সের বাক্স—এখন এ সংসারের মেডিসিন-ব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছে। নানা ধরনের ট্যাবলেট যা বিভিন্ন সময়ে কেনা হয়েছে—কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে অবশিষ্ট জমে ওঠা ওষুধে বাক্স ঠাসা। এর মধ্যেই থার্মোমিটার থাকে যা কিছু আগেই ব্যবহার করা

হয়েছে। কিন্তু ক্রোসিন কোথায়…কাঙ্ক্ষিত ওষুধটি না পেয়ে বৌদি ক্রমেই নার্ভাস হয়ে পড়ছে, সে খেয়ালই করেনি যে বাক্সটি থেকে সে যে দু-চারটি ট্যাবলেট নামিয়ে টেবিলে রেখেছে তার একটিই প্রার্থিত ক্রোসিন! বৌদি যতই নার্ভাস হয়ে পড়ছিল ততই সে নানা ধরনের ইঙ্গিতপূর্ণ কথাবার্তা বলতে শুরু করেছে। তার মনেরই কথা, কিন্তু ঘটনা না ঘটলে কোনোদিন প্রকাশ পেত না। কাঙ্ক্ষিত ক্রোসিন না পেয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঋতবানের দিকে সেই সব ইশারা ছুটে আসছে।

সে অমঙ্গল। সে জলজ্যান্ত অশুভ। তাই সে অনাকাঙ্ক্ষিত।

তাতুনের আর্তনাদেরও ভাষাগত অবয়ব ছিল। সকলেই জেনেছে যে তার দহন ঋতবানকেই লক্ষ্যভেদ করে!

আমি টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। এবং টেবিলের ওপর রাখা দু-চারটে ট্যাবলেটের মধ্য থেকে ক্রোসিন উদ্ধার করি। এবং 'ইট'স টু মাচ'—এ কথা বৌদিকে বলার আগে সে স্বাভাবিকতায় ফিরে আসে, যা কী না সৌজন্যই বা আমাদের দৈনন্দিন আচরণের এক জরুরী শীল যা ভারসাম্য রক্ষা করে। এর আগে অর্থাৎ জরুরী ট্যাবলেটটি পাবার আগের মুহূর্তে দাদা তাঁর চোখের ভাষায় বৌদিকে ভৎর্সনা করেছে এবং মার মৃদু 'আঃ বৌমা—' এসব কিছুই তাকে নিরস্ত করতে পারেনি।

কিন্তু কোন রসায়নে তাতুন ঋতবানকে তার প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত করেছে এই অন্তর্দন্ত হবার আগে সেই সন্ধ্যায় ঋতবান বনাম তাতুনের কথালাপের কিছু অংশ শোনা জরুরী।

—তুমি এলে—

—এলাম—

—আমার হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার সময় একবার এসেছিলে।

—তোমার মনে আছে, আমার নামটা—

—তুমি ঋতবান, তোমার গায়ে বারুদের গন্ধ।

—বাতাসে—

—বাতাসে কেন?

—বুলেটগুলো সব ফুল হয়ে ফুটছে।

—বুলেট…ফুল…বেশ মজার। তুমি পিস্তল এনেছ?

—আমার পিস্তল নেই।

—আছে, আমি জানি—

—জান। তাহলে আছে। এখন নেই, কাছে।

—আমাকে দেবে।

—তোমারও তো একটা আছে।

—সেটা টয়। আমি আসল একটা চাইছি।

এ পর্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিছু পরে—

—টিনটিন একদিন ভারতবর্ষে আসবে। ইন্ডিয়া, এ গ্রেটল্যান্ড অব ম্যাজিক।

—না, আসবে না।
—আমি বলছি আসবে। হি মাস্ট কাম।
—দেবে না—
—দেবে না। কে? তোমরা কে? তাতুন ঋতবানের কর্তৃত্ব বা আইডেনটিটির প্রশ্ন তোলে। প্রশ্নের মধ্যে অবজ্ঞা আছে।
—দেশের লোক। ঋতবান বলে।
—তোমরা কিসস্যু না। হরর্ পড় না, কমিকস্ পড় না।
ঋতবান হেসে ফেলে। বলে, তুমিও আর পড়বে না।
—কী পড়ব? রাস্তার হোর্ডিং না দেওয়ালের লেখা!
—তুমি রূপকথা পড়বে, দেশ ও দশের ইতিহাসের গল্প।
—সেসব কোথায়? সেসব কোথাও নেই।
ঋতবান নীরব হয়ে যায়। তাতুন ওর কথার পুনরাবৃত্তি করে।
—তোমরা কিসস্যু না। হরর্ পড় না, কমিকস্ পড় না। সেসব কোথাও নেই। তাতুন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। যাবার আগে ঋতবানের দিকে আঙুল তুলে বলে, হি মাস্ট কাম!
ধমক-খাওয়া মধ্যবিত্ত পরিবারে তাতুন কিছুটা ব্যতিক্রম, হয়তো বা তার ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলে পড়ার সুবাদে। এটা ভাল-মন্দর কথা নয়, স্বাতন্ত্র্যের কথা এই যা—
এবারে মাঝরাতে—
—হি মাস্ট কাম। (তাতুন)
—আসবে, আসবে! (দাদা)
—আসবে রে, আসবে! (মা)
—সার্টেনলি, মাই ডিয়ার। (বৌদি) (এরকমটা তাতুন তার মাকে শিখিয়েছে।)
—হি মাস্ট কাম।
—আসবে রে, আসবে। (মা)
—আসবে···। (দাদা)
—সার্টেনলি, মাই ডিয়ার। (বৌদি)
তাতুনের গলায় প্রত্যাশা-দীর্ণ ঘোষণা ও কোরাসের মতোই তার প্রতি সমবেত সমর্থন এই প্রক্রিয়া চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। ক্রোসিন খাওয়ার সুবাদে ও মাথায় অবিরত জলের দরুন তার শরীরের তাপ নামছিল। আরও কিছু পরে তার শরীরে ঘামের ধারা নামে। তখন অনুত্তেজিত সে বলে—ঋতবান, তুমি চলে যাও। খুব স্পষ্ট অভিব্যক্তি। যে কথা দাদা, বৌদি কেউ বলতে পারে না, সে কথাই তাতুন বলে।
পাশের ঘরে ঋতবান জেগে উঠে অপেক্ষা করছিল। এমন অভিজ্ঞতা তার ছিল না। তার মস্তিষ্কে চিন্তা-তরঙ্গ এখন শূন্যেতে অবস্থান করছে। মুখাবয়বে ও দৃষ্টিতে সেই আভাস স্ফুট। তখনো রাত্রি অবশিষ্ট ছিল এবং অন্ধকার। তাতুনের মুখোমুখি

হবার কোনোরকম সাহস সে দেখাল না, সৌজন্য বা মানবিক কাতরতা যাতে অসুস্থ তাতুনকে দুদণ্ড দেখেশুনে, তার পাশে বসে কপালে বা মাথায় হাত বুলিয়ে যে একটা সম্মানজনক (উভয়ত) বিদায় নিতে পারে এমন কোনো চেষ্টাই সে করল না। বরং আমার নিষেধ অগ্রাহ্য করে এবং অন্য সকলের অগোচরে নিঃশব্দে সে অন্ধকারেই পা বাড়াল।

ভোরবেলায় ডাক্তার আসে। তখন তাতুন স্বাভাবিক। সে ঋতবানের খোঁজ করে এবং চলে গেছে শুনে কেমন আনমনা হয়ে পড়ে। এই শেষ। আর কোনোদিন ঋতবানের সংগে আমাদের দেখা হয়নি। জিজ্ঞাসা করা হয়নি সে কি সেদিন তাতুনের তাপাক্রান্ত ব্যবহারে খুব আহত হয়েছিল। কেননা সময় বিশেষে ঘটনা যুক্তির চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে—এমন কথা আমরা দর্শন থেকে জেনেছি।

কিছুদিন পরে আমার হাতে একটা লিটল ম্যাগাজিন আসে। পাতা উল্টোতে উল্টোতে এক রহস্যময় গদ্যের ওপর আমি আছড়ে পড়ি। 'সার্ত্র পড়ার কুফল' এই শিরোনামায়। লেখকের নামের জায়গায় ছাপা আছে : একটি নৈর্ব্যক্তিক গদ্য।

॥ সার্ত্র পড়ার কুফল ॥

এক বৃষ্টি-বন্দী সন্ধ্যায় লর্ড সিনহা রোড থেকে আমার ডাক আসে। আমি ঘাবড়ে যাই। আমাদের বাড়িতে চারটে রঙিন কুকুর আছে। বেলা হলে ওরা জেগে উঠে ভোরের দৈনিক চাটে। ওরাও ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। দারুণ ইনটুইটিভ। আমি বাপীর কাছে সারেন্ডার করি। বাপী ও মা এই প্রথম আমাকে তাঁদের গ্রিপ-এ পায় এবং এতটুকু ডিসটারবড্ না হয়ে আমাকে অ্যাডভাইস করে লর্ড সিনহা রোডে হাজিরা দিতে। তাদের আচরণ রীতিমতো রহস্যজনক মনে হয়।

আমি বাপীর গাড়ি চেপে লর্ড সিনহায় যাই। দোতালার ঘরে একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে হলুদ সিল্কের পুলওভার গায়ে বা তাকে হাতাওয়ালা গেঞ্জিই বলা চলে, চোখে কালো রোদ-চশমা (বৃষ্টির দিনে) এক ব্রাইট ইয়ং ম্যানের মুখোমুখি টেবিলের এপাশে আমাকে বসতে হলো। অনেকটা টিভি প্রোগ্রামের মডারেটর গোছের বা সেলস্ এক্সিকিউটিভদের চেয়ে এককাঠি সরেস—প্রথম দর্শনে এমন মনে হলো।

'কফি—'

আমি ঘাড় নাড়লাম। এখানে কোনো থার্ড ডিগ্রি মেথড যে আমার জন্য অপেক্ষা করে নেই এমন একটা মনগড়া নিশ্চয়তায় (এমন ভাবনার ব্যাকগ্রাউন্ডে বাপীর মুখটি ছিল) আমি কিছুটা স্মার্ট হবার জন্য চেষ্টা করছিলাম।

কফি এল। প্রথম চুমুক দিতেই, বাইরে টানা বৃষ্টি, সে স্টেট এক্সপ্রেস বাড়িয়ে দিল। নিজেও একটা ধরাল।

"আপনি অ্যাকাডেমিক পড়াশুনার বাইরে কী পড়াশুনা করেন তার একটা অনেস্ট

রিপোর্টিং করুন।"

মনে হলো পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডেরায় নয়, যেন পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা ইউ. পি. এস. সি-র কোনো ইন্টারভিউ বোর্ডের মুখোমুখি বসে আছি। (রাগী ছোকরা তখন ক্ষুধার্ত চাকুরীপ্রার্থীতে পরিণত)। সামান্য হাসি পেল; কিন্তু হাসবার উপায় নেই। ইন্দ্রনীলের কথা মনে হলো যে তাদের সামনে চুপ করে বসে থাকতে নেই, তাহলে ওরা ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলে।

—"সমরেশ থেকে অবধূত।"

—"বিদেশী সাহিত্য। হিস্ট্রি। ফিলসফি ও পলিটিকস?"

—"সাত্র, স্যালিঞ্জার-জেনে' জেমস্ বলডুইন থেকে ফ্রনৎস ফ্যানোন। হার্বার্ট মারকুইস্ থেকে রেজিস দেব্রে, চে গুয়েভারা।"

—"সাত্র, এঙ্গেলস, লেনিন-স্ট্যালিন বা মাও?"

—"থিওরি অফ্ সারপ্লাস ভ্যালু অংশত আমার কলেজ পাঠ্য, এঙ্গেলস-এর চিঠি, লেনিনের কবিতা ও লিনের 'লঙ লিভ দ্য ভিক্টরি অব্ পিপলস্ ওয়ার' বা রেডবুক।"

"মাওয়ের হুনান রিপোর্ট পড়েননি?" চোখ থেকে কালো চশমা নামিয়ে রাখে।

টানা বৃষ্টির মতই এক দীর্ঘ ইন্টারভিউ আমাকে ক্লান্ত করে, আমার সজাগতাকে ভোঁতা করে দিয়ে আমাকে বিষণ্ন করে তোলে এবং এসবের মাঝে রুশ, চীন, ল্যাটিন আমেরিকার লড়াইয়ের এক সংবাদধর্মী সামারি তুলে ধরে সে জানতে চায় কোনটা ভারতবর্ষের পক্ষে অ্যাপ্লিকেবল—চীন না লাতিন আমেরিকার পথ। আমার কী ধারণা ইত্যাদি।

এরই মাঝে সে আমার বন্ধুদের যারা রাজনীতির সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত তাদের খোঁজখবর জানার চেষ্টা করে। দু-একটা নাম সে জানেও। আমি বলি, "ওদের সঙ্গে আমার ক্যাজুয়াল ওঠাবসা ভাবগত, কোনো সাংগঠনিক সম্পর্ক নেই।"

"ইয়েট, ঋতবান নামে যে ছেলেটি কবিতা লেখে এবং ফায়ার আর্মস নিয়ে মেট্রোপলিসের ডিফারেন্ট স্পটে অ্যাকশন লিড্ করছে তার শেলটারের জায়গাগুলো কেমন হতে পারে?" এমন বে-আব্রু প্রশ্ন করে সে তার চোখ দিয়ে আমাকে ড্রিল করতে থাকে। এই সময় মাথার ওপর হাজার পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে ওঠে।

"বলুন, আপনি রেসপেক্টেবল্ ফ্যামিলির ছেলে। বাড়িতে বাবা-মা-বোন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি নিশ্চয়ই বাড়ি ফিরে যেতে আগ্রহী!"

আমি বলতে থাকি…

"প্লিজ প্রসিড ফারদার…"

"বেনেপুকুর-নোনাতলার যে গ্রেভইয়ার্ডের সামনে কলকাতা কর্পোরেশনের প্লেগ সম্পর্কে একটা হোর্ডিং সেদিন পর্যন্ত কী ভাবে যেন টিঁকে ছিল, সেখানে ওর খুব… রাত হলে মাঝে মাঝে সে ওখানে শেলটার নেয়।"

"মাইকেলের…" উত্তেজনায় সে উঠে দাঁড়ায়। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে সে ঘর

থেকে ঝোড়ো হাওয়ার মতো বেরিয়ে যায়।
আমার সামনের টেবিলের কাঁচে পেছনে দাঁড়ানো সেন্ট্রির ছায়া নড়াচড়া করে।
হুররে—এই আমার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। এই ধূসর পুলিশ যুবকটিকে বোকা বানাতে পেরেছি বলে। পরক্ষণেই মনে মনে আমি নতজানু হয়ে, জীবনে এই প্রথম, অতিপ্রাকৃতের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাই—দোহাই, সার্ত্র-এর 'দ্য ওয়াল' গল্পের 'আমি' চরিত্রটির মতো আমার অবস্থা যেন না হয়—যে মিথ্যে বলেছিল যে কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবী নেতাটি গ্রেভইয়ার্ডে লুকিয়ে আছে। অথচ সেই মিথ্যে খবরের পেছনে ছুটে রাষ্ট্র সত্যিসত্যিই নেতাটিকে সেখানে পেয়ে যায়। 'আমি' চরিত্রটিকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়াতে হয়নি। কিন্তু জেলখানায় এক সদ্যবন্দীর কাছে গ্রেভইয়ার্ডে নেতাটির গ্রেপ্তারের কথা শুনে 'আমি' আর্ত হাসি ও কান্নায় আছড়ে পড়ে।
অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসি। আমাকে বসিয়ে রেখে লর্ড সিনহা হয়তো গ্রেভইয়ার্ড অভিযানে বেরিয়েছিল। বাপী ও মা আমার সম্পর্কে এতই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাড়ি ফিরতে কুকুরগুলো শুধু এগিয়ে এল। ওরা জানত না আগামী ভোরে খবরের কাগজের পাতায় ওদের জন্য সত্যিই কোনো ভোজ থাকবে কিনা। আমিও না।
ভোররাতের ময়দানে ঋতবানের বুক ও মাথা আলাদা হয়ে যায়। দৈনিকে এ খবর ছিল না। যেটুকু জানাজানি হবার সম্ভাবনা ছিল তাতে কলকাতার জ্ঞানীগুণী কলাকুশলীরা গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন। বুক ও মাথার পরিচয় যে একজন কবি ও কর্মীর তাকে পরিচয়হীন গোত্রহীন করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রইল॥ কিন্তু ঘটনাটা একদিন ঠিকই গল্প হয়ে গেল।
এই আমার স্বীকারোক্তি।
যখন তা ছাপা হবে তার অনেক আগেই আমি ইওরোপ পাড়ি দেব। ওঁ গুরু কৃপাহি কেবলম্।

প্রকাশকমশাই, এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে ঋতবান নামে প্রকৃতই এক যুবক ছিল। সে বাস্তবিকই সারাক্ষণের এক কর্মী ও কবি হয়ে উঠছিল—যার বুক ও মাথা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। সব কালেই এমনটি হয়ে আসছে। শুধু বাইরের মৌরুসি শক্তিই যে কবির বুক ও মাথা আলাদা করে দেয় এমন প্রতিপাদ্য আমার নয়। বরং আমাদের (কবিরও) চিন্তা ও অনুশীলনের গৌণ ভ্রান্তি, যাকে অন্তর্ঘাতও বলতে পারি, তাও কবির বুক ও মাথাকে বিচ্ছিন্ন করে।
এমনই এক অন্তর্ঘাতের ফলে 'ডাকঘরের' অমল ঘুমিয়েছিল। তখনই সুধার প্রবেশ। আমরা সুধাকে কী বলব? □

অন্তর্ভ্রমণ

অরূপরতন বসু

আজ এই বসন্তের রাতে শেখরের ঘুম আসছে না। সে জেগে আছে। এত রাতেই স্টোভ জেবলে কফি তৈরি করল সে। কালো কফি, দুধ-চিনির ঝামেলা নেই। নিঝঞ্ঝাট। আজ অনেক রাত জেগে সে বোদলেয়ারের 'কারেসপন্‌ডেন্‌সেস' কবিতাটি পড়েছে, ভেবেওছে। বোদলেয়ার ইঙ্গিত করেছেন, প্রকৃতি এক মন্দির, যার চারটি স্তম্ভ কথা বলছে রহস্যময় ভাষায়। মানুষ, সে-ভাষার মর্মোদ্ধার করতে পারে, প্রতীক আর চিহ্নের নিবিড় অরণ্য ভেদ ক'রে, যেমন ভূতাত্বিক, বনেজঙ্গলে পাথরের নমুনা খুঁড়ে ভূস্তরের পাঠোদ্ধার করেন।

প্রতিধ্বনির যেমন ধ্বনি, তেমনই শব্দের পেছনে আছে নৈঃশব্দের জগৎ, যেখানে চিহ্ন বা প্রতীক দিয়ে পেঁাছনো যায়। এমন শব্দ আছে যা শিশুর মতো নিষ্পাপ, মাঠের মতো সবুজ, বাঁশিরির মতো মধুর ; আবার এমন ধ্বনি আছে যা থেকে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। শব্দ, রঙ, আলো আর সুগন্ধর ভিতর চলছে অবিরাম যাতায়াত ; অনন্ত রাত্রির প্রান্তরে দূরাগত ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি, এক বিশাল আলিঙ্গনের ভেতর অবিরাম যাতায়াত ক'রে চলেছে। এইসব শব্দেই আছে কবিতার রহস্য। বাড়ি, রাস্তা, সমুদ্রোপকূল, ঢেউ, গাছের সার,— এ সবকিছুই অপর এক অদৃশ্য জগতের প্রতিচ্ছবি, ভাবনার প্রতিফলন মাত্র। শব্দের নির্দেশ যদি অলিখিত নৈঃশব্দের দিকে হয়, তাহলে দৃশ্যের নির্দেশও অদৃশ্যের দিকে, ভাষার ভাবনার দিকে। কাল রাতের ভাবনা, শেখর এবার লক্ষ্য করে, আজ সকালেও তার মাথায় জেঁকে ব'সে আছে। একের পর এক এইসব ভাবনার ভাঁজ সে এখন নিঃশব্দে খুলে যাবে, খুলে দূর থেকে লক্ষ্য করবে। নিজের ভাবনাকে দূর থেকে লক্ষ্য করা, শেখরকে প্রায় নেশার মতো পেয়ে বসেছে। তার তো আর বেশি সময় নেই। 'বয়স তোমার কতো ?' সে নিজেকে প্রশ্ন করে প্রায়ই, 'মুখ কেন ম্লান ?' হ্যাঁ, মুখ তার ম্লান থাকে প্রায়ই। অনেক ভালোবাসাবাসি হ'লো, ঢের প্রণয় হ'লো, তবু প্রেম হ'লো কি ? কী জানি কী হ'লো।

কোম্পানীর অবস্থা খারাপ হওয়ায় চাকরি যাওয়ার আগেই সে স্বেচ্ছায় অবসর নিয়েছে। সেদিন আর্টিস্ট শচীনের সঙ্গে দেখা। মদ্যপান, শচীন, খুব ভালোই রপ্ত করেছে, যদিও আর্ট কতটা তার জবাব স্বয়ং মহাকালই দেবেন। কলেজ স্ট্রীটে চায়ের দোকানে কাঠের বেঞ্চিতে ব'সে ম্লানমুখ শেখরকে ভাঁড়ের চা খেতে দেখে, সে চোখ মটকে বলে, 'কী হে, তুমি নাকি চাকরি ছাড়োনি, ভলান্টারি রিটায়ারমেন্ট নিয়েছো ?'

'ঠিকই শুনেছো,' সভয়ে বলে শেখর।

'আরে ছো ছো রিটায়ারমেন্ট ! তা-ও ভলান্টারি ! সে-ই চাকরিও করলে না, আবার

ছাড়ার সাহস-ও দেখালেনা ! এই যে আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লাখ দেড়েক আর সবকিছু মিলিয়ে লাখ তিনেক টাকা নিয়ে লাথি মেরে চাকরি ছেড়ে দিলাম—এবার দেখো—'

'তা তুমি পারবে, তোমরা প্রতিভাবান, আমি···আমি···আমি তো প্রভিডেন্ট ফান্ডের মুখই দেখতে পেলাম না—ধার নিতে নিতে শেষকালে দেখলাম কয়েক হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে—কোনোমতে সভয়ে সলজ্জে কথা শেষ করে শেখর।

'ধার ?' প্রায় হুঙ্কার ছেড়ে শচীন জ্বলন্ত চোখে শেখরের দিকে তাকায় ; তারপর প্রচণ্ড ঘৃণায় ও ততোধিক তাচ্ছিল্যে, বোতল হিপ পকেটে পুরে দ্রুত ফুটপাথ পেরিয়ে যায়।

তবু শচীনকে বিচার করতে চায়না শেখর। এক বহুজাতিক রঙকোম্পানীর বিজ্ঞাপন আঁকার লোভনীয় চাকরি ছেড়ে আজ শচীন যদি অদৃশ্যের গহ্বরে ঝাঁপ দিয়ে কিছু দৃশ্য তুলে আনতে চায় তো আনুক না। এ-ও তো এক প্রার্থনা, যা ঘাস থেকে শালবন থেকে হাওয়ার স্রোতের মতো উঠে চলে যায় নক্ষত্রের আগুন লক্ষ্য ক'রে। সেও কি তা চায়নি ? নাকি বড় দেরিতে সে এসব ভাবছে। টাকার মোটা অংকটা প্রায় সবই খোয়া গেছে শেয়ারমার্কেটের দুই জোচ্চোরের পাল্লায় প'ড়ে। তারপর বাড়ির আর কারও সংগেই বিশেষ বাক্যালাপ নেই। খাওয়াদাওয়ার পাট বাইরে, কিছু টাকা কোনোমতে এখান ওখান থেকে যোগাড় ক'রে বাড়িতে দেয়, কেউ তাকে খেতেও ডাকে না। ভালোই হয়েছে, নিজেই মাঝে মাঝে চা-কফি ক'রে নেয়। কীভাবে, কতদিন এভাবে চলবে তাও জানে না। এই অবসর, যা সে ভেবেছিল কিছুটা লিখে, কিছুটা ভেবে, কিছুটা স্তব্ধ হ'য়ে থেকে কাটিয়ে দেবে ; তা আর সেভাবে পারল কোথায় ? একসময় তারও গল্প-উপন্যাস লেখার সাধ যে ছিল না, তা নয় ; অনেকটা সময়াভাব, অনেকটা রক্তক্লান্ত অবসাদ, কিছু ঘৃণা, কিছু তিক্ত আত্মগ্লানি, কিছু শরীর ও ইচ্ছার অপরিণামদর্শী ক্ষয়, কিছু আত্মকলহ ও সংশয় এইসব আস্তে আস্তে দীর্ঘ বিশবছর ধরে তাকে ফেঁড়ে দেয়ার পর কিছুই হ'ল না তার। কিছু হওয়ার কথা ছিল কি ?

মনে আছে, কেপ কমোরিনের কথা। ঐ অন্তরীপ থেকে সামান্য দূরে, সমুদ্রের ভিতর থেকে উঠে আসা ছোট্ট একটা ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর এক স্মৃতিসৌধের নিচের প্রকোষ্ঠে ঢুকে কিছুক্ষণের মধ্যেই গুহার অন্ধকারে তুমুল হাওয়া, জলোচ্ছ্বাস আর ঢেউয়ের অবিরাম ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ধাক্কায় বিদীর্ণ হয়ে যেতে যেতে নিজেকে মনে হয়েছিল তার, অনন্ত আঁধারের কালো স্রোতে ভেসে যাওয়া এক কণা উজ্জ্বল সোনালি। এতবছর পর, এই প্রথম নিজের ভেতর কোথাও কোনো আলো ছিল, আলো আছে তা টের পেয়েছিল শেখর। চারপাশের সমুদ্র আর হাওয়ার গম্ভীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনির ধাক্কায় কাঁপতে থাকা ঐ অন্ধকার গুহায় এক জ্যোতির্ময় স্পন্দন যেন সেদিন তার শরীরময় ছড়িয়ে পড়েছিল, ঐ এককণা উজ্জ্বল আলো আর স্পন্দন শরীরে নিয়ে সেদিন ফিরে এসেছিল শেখর তার হোটেলে। জানালার সামনে দক্ষিণের আকাশে তুলারাশির উজ্জ্বল

দুই নক্ষত্র সীমাহীন অন্ধকার জলের উপর জ্বলতে জ্বলতে পশ্চিমের ঢালু আকাশ বেয়ে নেমে যেত দিগন্তের নীচে অশ্রুর দুই উজ্জ্বল ফোঁটার মতো, মাতৃতীর্থের কালো পাথরে তৈরি কারুকার্যখচিত দীর্ঘ নির্জন তোরণ দেখে সে ভাবত কোথায় চলেছে ঐ উর্ধ্বে অপার নক্ষত্রলোক, কোন ভাষার অতীত, শব্দ-নৈঃশব্দের অতীত অব্যক্তের অন্তস্থলে। তুতিকোরিনের সমুদ্রোপকূলে মাইল মাইল অন্ধকারে জ্বলতে থাকা একের পর এক নুনের স্তূপ দেখে মনে পড়েছিল বিস্মৃতির অন্ধকারে কোথাও এইভাবে পরপর ঘটনার সার নিঃশব্দে জেগে আছে ; যেন ঐ আকাশ, ঐ সমুদ্র একাকার হয়ে ভেঙে পড়ছে বিশাল এক ঘূর্ণ্যমান বলয় পেরিয়ে অদৃশ্য অতল এক গহ্বরের ভিতর—সময় যেখানে নেই, আলো যেখানে নেই, স্থানকাল নেই, স্থানকালের বঙ্কিম জ্যামিতি যেখানে নেই, কিছু নেই, শুধু হওয়া-না-হওয়া যেখানে একাকার হয়ে একটি বিন্দুতে মিশে উধাও হয়ে গেছে কোন অজ্ঞেয় রহস্যলোকে—এরকমই কি তার মাথা—এক অদৃশ্য গহ্বর হয়ে জেগে আছে, মহাকাশে নয়—এই ভীড়, ইস্পাত আর কংক্রীটের মাইল মাইল প্রান্তরে···চারপাশ থেকে শুধু আলো শুষে নিয়ে অন্ধকার হয়ে থাকা, গতি সংঘর্ষ শক্তি স্পন্দন শুষে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকা, এই তার কাজ, এই তার পরিণাম···

অথচ, এও ঠিক যে, তার মাথায় এককণা সোনালি—সে টের পায়—ঘুরে চলেছে। কখনো দীর্ঘ রশ্মি পাঠিয়ে সে নেমে আসে ঝর্ণার মতো, কখনো ফোয়ারার মতো উঠে যায় ; শরীরের ভেতর আরেক শরীর, অথচ এ শরীর নয়, শুধু এককণা আলো ; শুধু ঢেউ। কী এ ? সেকালের কোনো শ্যামলী শক্তি ? প্রাচীন লুপ্ত পূজাবিধির ? উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে নাকি সে ? অন্তত সন্তোষকে বললে সে যে তা-ই বলবে তা ঠিক।

একসময় সন্তোষদের সঙ্গে সে আড্ডা মারত শ্মশানের পাশে কালীবাবুর চায়ের দোকানে। দোকানের পাশে, মানে ঠিক পাশেই নয়, দোকানের ধার দিয়ে একটা রাস্তা, রাস্তার ওপাশে কিছু পাম, সুপারি ও ফুলগাছ লাগানো ছোট্ট একটা মাঠ। কিংবা ঠিক মাঠ নয়, মাঠকে বাগান বানিয়ে তোলার চেষ্টা কিছুদিন চালিয়ে যাওয়ার পর হাল ছেড়ে দিলে যা হয়, তা-ই। মানে মাঠ ও বাগানের মাঝামাঝি একটা আধাখ্যাচড়া অবস্থা। তারই পাশে, একদিকে, ইলেকট্রিক চুল্লী, অন্যদিকে সনাতন কাঠের চিতা। এই চিতার আগুনই, রাত্রে, শেখরদের আড্ডা থেকে চোখে পড়ত। একেকদিন আড্ডার মাঝখানে উঠে গিয়ে সে লক্ষ্য করেছে ইলেকট্রিক চুল্লীর দোরগোড়ায় তেমন ভীড় নেই, বাল্ব খোয়া যাওয়ায় জায়গাটা অন্ধকার, আর অন্ধকারেই বিনীতভাবে খাটিয়ায় শুয়ে আছে কিছু প্রায়-নিরুপায় পরিত্যক্ত শব। কোনোদিন তিতিবিরক্ত বৃদ্ধের শব, কোনোদিন হাসিমুখ বালক, কোনোদিন বা শান্তবিষণ্ণ মুদিতচক্ষু তরুণী, কোনোদিন বা মাথায় ভয়াল ব্যান্ডেজ বাঁধা একরোখা তরুণ। মনখারাপ করার কথা নয়, উদাসীন হওয়ারও কথা নয়। শুধু দৈনন্দিন জীবিতের জগতের পাশে মৃতের সমান্তরাল সমাবেশ, ঘুম ও জাগরণের মতো, অথবা দুই গোলার্ধের মতো, পরস্পরকে ছুঁয়ে রয়েছে। আড্ডায় ফিরে আসার পর অবশ্য বোঝা যায় সবই ঠিক আছে, 'নির্জ্জন মন ব'লে কিছু নেই',

সন্তোষ বলে চলেছে, 'সার্ত্র-এর মতে তা হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়ার মতো। মানে রহস্য আছে তবে তা ভেদ করা যায় গোয়েন্দার মতো একের পর এক যুক্তির সূত্র সাজিয়ে।'

এদিকে নতুন মড়া এসে যাওয়ায় দোকানে তোয়ালে ও গামছা কাঁধে ছোকরা খদ্দেরদের ভীড় বাড়ে, ধার-বাকীর খদ্দেরদের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে কালীবাবুর ছেলে এবার নগদ খদ্দেরদের দিকে মন দেয়। কালীবাবুর ছেলেকে নিয়েই ঝামেলা। কালীবাবু মাঝে মাঝে হঠাৎই উধাও হয়ে যান, অনেকদিন পর শোনা যায় তিনি অমুক মহাশ্মশানে সাধনা করছেন। আবার কিছুদিন পর তাঁর আবির্ভাব, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, রক্তচক্ষু, অতি সমাদরে সকলকে শুধু চা নয়, কারণবারি দ্বারাও আপ্যায়ন করেন। সংগে গঞ্জিকা তো আছেই। যে কোনো শ্মশানের ধারে আড্ডা মারার এই এক সুবিধে। তবে এ সুবিধে বেশীদিন থাকে না, আড্ডাও নয়। সন্তোষের কথা ভাবতে গিয়েই আড্ডার কথা মনে পড়ে শেখরের। গুপ্ত সাধনা থেকে ফেরার পর রক্তচক্ষু কালীবাবু মাঝে মাঝেই গঞ্জিকার কলকে আড্ডার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলতেন, 'এ মহাশ্মশানে কে আর আসবে, রামকেষ্টর মতো মা'র সেবক ছাড়া—' সন্তোষ নিরুত্তর তাঁর হাত থেকে গঞ্জিকার কলকে টেনে নিয়ে যথোচিত গাম্ভীর্যে সেবন করার পর কালীবাবুকে ফেরৎ দিয়ে ফিশফিশ করে শেখরকে বলত, 'বুলশিট! রামকৃষ্ণর আসলে মৃগীরোগ ছিল, ওসব সমাধিফমাধি হচ্ছে এপিলেপটিক ফিট।'

ঠিক এহেন সন্তোষকে, তার মাথায় ঘুরন্ত সোনালি আলোর ঝর্ণার কথা বললে যে কী মারাত্মক ফল হ'তে পারে তা আর বলার দরকার নেই। একবার, তবু শেখর চেষ্টা করেছিল, 'আমার মাথায়; মানে কানের পাশটায়, ঘাড়ের কাছাকাছি, একটা কেমন যেন চিনচিন, ভাইব্রেশন…'

'ভাইব্রেশন?' খুবই উদ্বিগ্ন মুখে তাকায় সন্তোষ, 'এখনি ই এন টি স্পেশালিস্ট ডক্টর সান্যালকে দেখাও, কানের ভেতর কিছু হ'তে পারে, আবার লো-প্রেশারও হ'তে পারে।'

'আমার মনে হচ্ছে…মানে অন্য কিছুও তো হ'তে পারে…' সভয়ে বলে শেখর।

'অন্য কিছু?' চাপা হুঙ্কার ছাড়ে সন্তোষ, 'তাহলে ইমিডিয়েটলি নবীনের কাছে যাও, ও বিহেভিয়ারিস্ট—ওরা ড্রাগ দিয়ে সব মানসিক বিকার সারিয়ে দেয়। আমেরিকায় তো এসব হ'লেই লোককে পাগলা গারদে পাঠায়।'

'যেমন গীন্সবার্গকে পাঠিয়েছিল—ব্লেকের গলা শোনার জন্য?'

'তোমারও তাই হচ্ছে নাকি?' ঠা-ঠা ক'রে হেসে ওঠে সন্তোষ, 'যাও যাও বাড়ি যাও, ভাল ক'রে ঠাণ্ডা জলে স্নান সেরে একটা ঘুম দিয়ে এসো দেখি—পেট টেট পরিষ্কার আছে তো—'

'আচ্ছা আজ তাহলে।' শেখর উঠে দাঁড়ায়। 'ঠিক আছে, এসো', বলে সন্তোষকে সযত্নে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়, পারলে যে তাকে ঘোলা কিংবা রাঁচী পর্যন্ত এভাবে

পৌঁছে দেবে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই।

কাজেই নিঃশব্দে, বন্ধুবান্ধব প্রায় সকলের কাছ থেকে স'রে এসে শেখর এখন একা তার নিজের মাথা আর শরীর লক্ষ্য করে।

মাঝে মাঝে মনে হয় এই যে ঘর, তার জানালা, চেয়ার টেবিল বিছানা—এসব কি এই প্রথম দেখছে সে ? মহাসময় পেরিয়ে বীজ হ'য়ে এই প্রথম সে কি মাতৃগর্ভে ভেসে এসেছিল ? এই দিন ও রাত্রি, আলো-অন্ধকারের অবিরাম যাতায়াতের ভেতর, এক মধ্যবয়স্ক নক্ষত্রের স্থানকালের বঙ্কিম জ্যামিতির ভেতর ঘুরতে থাকা স্পন্দমান এই গ্রহের পিঠে কোথা থেকে ভেসে এলো সে ?

অন্য কোনো মহাবিশ্বলোকে, নক্ষত্রলোকে সে কি ছিলো কোনোদিন, অন্য কোনো শরীরে ? যদি কোনো সুপারনোভা নক্ষত্রের বিস্ফোরণে এই সৌরলোকের সৃষ্টি হ'য়ে থাকে, তবে তো বহুদূর নক্ষত্রলোকের পরমাণু আছে তার শরীরে যেমন চারশকোটি বছর আগে এ-গ্রহে প্রাণের আবির্ভাবের পর যে এককোষী প্রাণী প্রোকারিয়টের আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই একই জীবাণু তার শরীরে আছে জীবকোষের শক্তিকেন্দ্রে মিটোকোনড্রিয়া হিশেবে। পরমাণু, ধাতু, খনিজপদার্থ, জীবাণু, মাছ, উদ্ভিদ, পশু আর সমুদ্রের নুন দিয়ে গড়া তার রক্তমাংস শরীরে যেমন এসব কিছুর তরঙ্গকম্পন ব'য়ে চলেছে, তেমনই নক্ষত্রচুল্লীর আগুন, মহাবিশ্বলোক সৃষ্টির আদিম ঢেউ, এমনকি তারও আগেকার আদিমতম অপার নিঃশব্দ তরঙ্গ তার রক্তস্রোতে নেই, মাথার নিউরোন বিস্ফোরণে নেই, নির্জ্জন স্বপ্নের জগতে নেই, জাগরণে নেই, এমন কথা কে জোর করে বলবে ?

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে বারবার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল

এক নক্ষত্রলোক থেকে অপর নক্ষত্রলোকে অনন্ত রাত্রির ভিতর ভেসে যেতে যেতে কোন নির্জন বীজ থেকে নেমে এসেছিল সে, শেখর ? 'না না, এ ঠিক নয়,' সন্তোষ প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছিল সেদিন, 'জীবনানন্দর ইতিহাসচেতনাটা আগে বোঝো। তা না তুমি বলছ নক্ষত্রচেতনা,—'

'কবির তো ইতিহাসচেতনা থাকবেই, তবে শুধু তাই নয়, তার পাশাপাশি মহাবিশ্ব চেতনা আর কি', বেশ সলজ্জে বলে শেখর, 'কবিতার পর কবিতায় নক্ষত্রের কথা, নিশ্চয়ই জীবনানন্দ জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন না, মানে এ্যাস্ট্রোলজিতে আর কী! আবার নিছক এ্যাস্ট্রোনমি-ও নয়, আবার নিছক ইতিহাসেও কি হবে ? ঐ হাজার হাজার শূকর শূকরীর আর্তনাদ, যদিও দাঙ্গার কথা আছে, আহিরীটোলা; ভিকিরি, মহাযুদ্ধের কথা আছে—কিন্তু সে সবই বোধহয় নক্ষত্রের পথে যেতে যেতে—'

'পথ ভুলে পৃথিবীর ক্ষেতে আসা ?' সন্তোষ বেশ গম্ভীরভাবে বলে।

'হ'তে পারে, মানে ইতিহাস স্তব্ধ হ'লে, তার অন্ধকার ও স্তব্ধতায় একটি মোমের মতো যেন—'

'জ্বলে ওঠে হৃদয় ? না না মিস্টিফাই ক'রো না, জীবনানন্দে মিস্টিসিজম নেই।'
'নেই ?'
'থাকলেও ক্ষতিকর ভাবে নেই।'
'তাহলে বোধহয় ভুল বুঝে সুধীন্দ্রনাথ বিষ্ণু দে মশাইরা অনেকদিন ভদ্রলোককে একঘরে ক'রে রেখেছিলেন।'
'যা ভুল হয়েছে তা হয়েছে। এখন নতুন ক'রে ভাবতে হবে। পুনর্ভাবনা। ইতিহাস আর 'সমগ্র'র দিক থেকে নতুনভাবে ভাবতে হবে।'
'লোকসমগ্র ?' শেখর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।
'তাছাড়া আর 'সমগ্র' কিছু আছে ?'
'নেই ? মানে সেই যে রবীন্দ্রনাথের বইয়ে পড়া যায় ঊর্ধ্বে অমৃতলোকে তাঁর তিনভাগ আর বাকী একভাগ পৃথিবীতে। নইলে শুধু লোকসমগ্র শেষকালে হিটলার-সমগ্র হ'য়ে যেতে পারে তো···আচ্ছা থাক সেটা নয় বাদই দেয়া গেল। কিন্তু লোকসমাজ তো আছে পৃথিবীতে, অবশ্য অন্য গ্রহেও থাকতে পারে—কিন্তু সে থাক, পৃথিবী আছে আমাদের সৌরমণ্ডলে, সৌরমণ্ডল আছে আমাদের গ্যালাক্সিতে আর গ্যালাক্সি—মানে এরকম কোটি কোটি গ্যালাক্সি আছে আমাদের মহাবিশ্বে—'
'আঃ থামো !' সন্তোষ হাত নেড়ে থামিয়ে দেয় শেখরের বাচালতা, 'এই মহাবিশ্বেরও ইতিহাস আছে, এমনকি সময়েরও। মানে সময়ের ইতিহাস আছে জানো ?'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আজকাল', শেখর সন্তর্পণে বলে, মানে প্রায় হাজার বা দুহাজার কোটি বছর আগে কোনো একটা সময় হঠাৎ 'সময়' পাল্টে গেছিল স্থান, মানে স্পেসে, তারপর স্পেসটা হঠাৎ ফুলে ফেঁপে—'
'হ্যাঁ, হ্যাঁ তা-ই, তাহলে আর মহাবিশ্বর শুরু বা শেষ কোথায় ? যেমন উত্তর মেরু বা দক্ষিণ মেরু—এর কোন জায়গা থেকে পৃথিবীর শুরু বা শেষ ? একে বলে নো বাউন্ডারী সিচুয়েশন, সেরকমই মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, চিরকাল 'ছিল'—অবশ্য কাল্পনিক সময়ে—মানে অঙ্কের একটা বিশেষ কায়দায়।'
'তাহলে বাস্তবে ?—মানে বাস্তবে বিশ্বের শুরুই হয়নি ?' শেখর ভয়ে ভয়ে বলে।
'ওসব জটিল অঙ্কের ব্যাপার, তুমি বুঝবে না। বাস্তবে শুরু হয়েছিল—শেষও হবে—তবে তাতে কিছু এসে যায় না। শুধু অঙ্কের হিসেবে এর শুরু বা শেষ নেই।' সন্তোষকে নিশ্চিন্ত দেখায়।
'বলো কী ? কল্পনা আর বাস্তব সব একাকার হ'য়ে গেল যে—মানে দেখা যাচ্ছে কল্পনাই বেশি সত্যি !'
'ওসব অঙ্কের ব্যাপার—জটিল অঙ্কের ব্যাপার'—সন্তোষ গভীর তৃপ্তির সঙ্গে বলে, 'আর তাছাড়া এটা এখন নেহাতই প্রস্তাব—এর অঙ্ক এখনো চলছে, কিছু প্রমাণ হয়নি। কেউ সঠিকভাবে জানে না মহাবিশ্ব কীভাবে শুরু হ'লো—'
'তাই বলো'। শেখর ধীরে ধীরে বলে, 'আমি শুনেছি বিন্দু থেকে শুরু হ'লে নাকি

বিজ্ঞানের সব নিয়মকানুন ভেঙে যায়—মানে যাকে নাকি দুর্লঙ্ঘ্য প্লাঙ্ক প্রাচীর বলে—যার ওপারে কোনো বিজ্ঞানের নিয়ম খাটে না—তাই ঐসব উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর কথা হচ্ছে—'

'এইসব নিয়ে তুমি আর মাথা নাইবা ঘামালে', সন্তোষ বলে, 'প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাটাই ঠিক মতো রাখতে পারলে না,—এখন আবার আমার খুব স্ট্রেনের মধ্যে চলছে—না না, তুমি যে ধারটা নিয়েছিলে, সেটার কথা ভাবছি না !'

'আঃ বাঁচালে ভাই।' শেখর উঠে পড়ে, আবার তার ভীড় আর ফুটপাথের ধার ঘেঁষে গাছগাছালির ভিতর দিয়ে হাঁটা শুরু। কোথায় চলেছে সে ? স্বপ্নের ভিতর দিয়েও তো সে এভাবে হেঁটেছে। মনে আছে একরাত্রে, স্বপ্নে, নিজের প্রায় প্রৌঢ় লোভী ক্ষয়ে যাওয়া পুড়ে যাওয়া মুখের সামনে নিজেরই আরেক দীপ্ত মুখ দেখেছিল, শেষকালে নিজেই গুলি করল আয়নার অপর পারের প্রৌঢ় মুখকে।

কল্পনা আর বাস্তবের মধ্যে যদি বিশেষ তফাৎ না থাকে, যদি গণিতের কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে গড়া যায় এমন বিশ্ব যা বাস্তবের সমান্তরালে অনেক বেশি সত্য হ'য়ে ওঠে, তাহলে জাগরণ আর ঘুমের মধ্যেও তেমন দূরত্ব রইল কোথায়, মৃত্যু ও জীবনের মধ্যেই বা তেমন কী ? হয়ত স্বপ্নের জগতে তার সেই জননীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, যে তার মৃত্যুর পর জননী হবে। শোনা যায় মহাকাশে এমন কিছু কালো গহ্বর আছে যেখানে সময় নেই, অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎও নেই, হয়ত সেরকমই, সেরকমই সর্বকিছু একাকার হ'য়ে আছে কোথাও। ঐ কালো গহ্বরের চার পাশে ঘুরতে থাকে জ্যোতির্ময় এক বলয়, যাকে বলা হয় 'ইভেন্ট হরাইজন'—ঘটনার দিগ্বলয়—ঘটনার সার সেখানে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, কেননা তার সীমানা পেরোলেই আর কিছুই থাকে না, এমনকি সময়ও নয়।

সেরকমই আজ তার মাথার চার পাশে ঘটনার সার দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন, শেখর টের পায়···কত বছর, কত শতাব্দী আগে ? এই নক্ষত্রলোকে কী ?···শীতের মাঝামাঝি হ'লেও বৃষ্টি কুয়াশায় ভরা ডিসেম্বরের দুপুর, কনকনে ঠাণ্ডা আর ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টার মাঝে মাঝে হা হা ক'রে উঠছে রাস্তাঘাট, গাছপালা। শ্যামবাজারে নামতেই শেখর দেখল সীতা, রক্তাভ শাল গায়, আনত মুখ, মাথায় ছোট একটা ছাতা—বুক-স্টলের নিচে দাঁড়িয়ে।

বৃষ্টির ছাঁট থেকে কোনোমতে মাথাটা বাঁচিয়ে শেখর সীতার কাছে এগিয়ে যায়। তাকে দেখেই হঠাৎ চমকে ওঠে সীতা, 'আপনি ?'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। আপনাকে দেখেই নেমে এলাম—ট্রাম থেকে।' শেখর স্পষ্টভাবে বলে।

মুহূর্তের মধ্যে সীতার মুখে সামান্য রক্তাভা দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় : তবু মুখে নিছকই কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে সে বলে, 'কোথায় যাচ্ছিলেন ?'

'এ্যাকাডেমীতে, নীরদবাবুর ছবি···'

'শেষ বসন্ত ?' সীতার মুখে কৌতুক।
'বোধহয়।'
'চলুন, আমি-ও যাই,' সীতা এগিয়ে আসে।
'প্রকাশ ?'
'এখানে নেই,' সীতা স্থির গলায় বলে, 'লন্ডনে পোস্টাল স্ট্রাইক চলছে—অনেকদিন কোনো চিঠিও নেই।'
'চিঠি নিয়মিত লেখে ?'
'হ্যাঁ। নিয়মিত। আফ্রিকা, ভিয়েৎনাম, আয়ারল্যান্ড এই সব নিয়ে আর কী। ব্যক্তিগত আবেগ ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'
'বুঝেছি', বলে শেখর। তারপর তারা দুজনেই এগিয়ে যায়। ডবলডেকারে ওঠে। তারপর এ্যাকাডেমী। শীতের অপরাহ্নে, ক্যাসুরিনা এভিনিউ ফেরার সময় একটু আলোকিত হ'য়ে ওঠে, হঠাৎ মেঘ স'রে যাওয়ায়, বৃষ্টি থামায় সার্কুলার রোডকে দেখায় বিদেশী পিকচার পোস্টকার্ডের ছবির মতো। তারপর ল্যান্সডাউন রোড ধ'রে রাসবিহারী। তখন কতো দীর্ঘপথ হেঁটে গেছে তারা, শীত বর্ষা রোদ মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে—একবার রাসবিহারী এভিনিউর দুপাশে গাছের সার হঠাৎ ঝড়ের আগেকার মেঘভাঙা আলোয় জ্বলে উঠছে দেখে সে ছুটে চ'লে গেছিল সীতাদের বাড়ি। দরজার কাছে পৌঁছনোর আগেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি···মাটি থেকে ধোঁয়া উড়ছে সোঁদা গন্ধ উঠছে অনেকটা সীতার ঠোঁট, কখনো কখনো সমস্ত শরীর থেকে যেমন অদ্ভুত সুগন্ধ উঠে আসত।
আবার এক শীতের সকাল, কবে, কতবছর আগে মনে নেই···নীল ঝোলাকোট গায় সে চলেছে দাদুর হাত ধ'রে ইশকুলে—আজই ভর্তি হবে।
অসম্ভব ফর্সা, (তখন মনে হয়েছিল মুখে রঙ মাখা) মেয়েলি ধরনের এক মাস্টার মশায় বললেন, 'স্লেটে নাম লেখো।'
নাম লিখতে গিয়ে একটা বানান ভুল করল, তবু তাতেই ভর্তি হওয়া গেল। পরে জেনেছিল, দেখেও ছিল, ঐ মাস্টারমশায় গোপেনবাবু মাস্টারমশায়দের নাটকে মেয়ে সাজেন। চমৎকার মানায়। তখন মফস্বলের যাত্রার দলে, নাটকের দলে ছেলেরা মেয়ে সাজে। ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরির বাৎসরিক অনুষ্ঠানে যে সুন্দরী নায়িকাকে দেখে গোপন অনুভূতি (যদিও পুরুষালি গলায় মেয়েদের গান শুনে স্বপ্নভঙ্গ) তাকেই একদিন দেখতে পায় দিব্যি চকচকে দাড়িগোঁফ কামানো মুখে শাদা সার্ট গায় পোস্টাপিসের কাউন্টারে খামপোস্টকার্ড বিক্রিরত। দেখে যতটা স্তম্ভিত, প্রায় ততটাই হাসি। তবু মফস্বলের শীতকালে ঝরাপাতার স্তূপ গাছের সারির নিচে, ভোরের রৌদ্র কুয়াশায় মরশুমী ফুলের ভিড়, প্রজাপতির ওড়াউড়ি, পাখির ডাক, খেলা, চড়ুইভাতি, শিউলিগাছে শুঁয়োপোকার পুরু আস্তরণ, শিশিরের ফোঁটায় তাদের ধূসর রেশম চকচক ক'রে ওঠে, সাবানের বাক্সে সারি সারি ফুটো ক'রে (নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে)

শুঁয়োপোকা পোষা, তারপর হঠাৎ একদিন তাদের ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি হ'য়ে বাক্স থেকে বেরিয়ে আসা, উড়ে যাওয়া গোল বারান্দার রেলিঙ থেকে। হাওয়ায় ফুলে ওঠা পালের মতো রঙিন শাড়ির ওড়াউড়ির মধ্য দিয়ে তাদের উড়ন্ত নীল সোনালি কালো ফুটকি দেয়া ঝলমলে পাখনার মিছিল...হয়ত শরীরও এভাবে একদিন পাল্টে যাবে আগুনের শিখায় ; মানুষ পাল্টে যাবে আলোয়। উন্মাদ আশ্রমে বেশ কয়েকবার গেলেও আর্তোর বিশ্বাস এরকমই ছিল, নাটকের মধ্য দিয়ে এ-পরিবর্তন ঘটতে পারে। আর্তোর মেক্সিকো ভ্রমণ—ইনকা এ্যাজটেক মায়া লুপ্তপুজাবিধি পুনরাবিষ্কারের প্রাণান্তকর চেষ্টা—এসবই সেদিকে যাওয়ার চেষ্টা। র‍্যাঁবো দেখেছিলেন একেকটি স্বরবর্ণের একেক রঙ, এদেশেও অক্ষরকে বর্ণ বা রঙ হিশেবে দেখা হয়।

ইন্দ্রিয় বিপর্যয় নয়, ইন্দ্রিয়কে স্তব্ধ করতে পারলে অদৃশ্যকে দেখা, অশ্রুতকে শোনা, সম্ভব। এরকম ইঙ্গিত শেখর পরে লক্ষ্য করেছিল এক রহস্যময় ভারতীয় বিপ্লবীর জীবনীগ্রন্থে, যিনি এদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সূত্রপাত ঘটিয়ে পরে চলে যান শরীরে নিহিত আলোর অভ্যুত্থানের দিকে।

দক্ষিণের এক সমুদ্রোপকূলবর্তী ছোট্ট ঔপনিবেশিক শহরে ছিল সেই নির্বাসিত বিপ্লবীর আস্তানা, যা ক্রমশ নৈঃশব্দের অন্তস্থলে পেঁাছে নীলিমার একটি প্রদীপ থেকে সহস্র প্রদীপ জ্বালানোর আহ্বান পাঠায়। সে আহ্বান হয়ত বা আজো শোনা যায় কংক্রীটে বাঁধানো চত্বর, খিলান আর স্তম্ভের সার পেরিয়ে অদূরের নীলাভ সবুজ ধূ-ধূ সমুদ্রের উতরোল কল্লোলে। চওড়া এভিনিউ, মাঝখানে বুলভার, সমুদ্রের মধ্যে এগিয়ে যাওয়া দীর্ঘ ব্রিজের সংলগ্ন জেটি, যাকে স্থানীয় লোকেরা বলে 'হার্বার'। তখন শেখরের বোদলেয়ার মনে পড়েছিল বই কি :

> I have long lived beneath the vast colonnades
> Dyed by the suns marine with myriad lights
> Their mighty pillars, splendid & erect
> Basaltic grottoes every night displayed

আজ এতদিন পর আবার সেই কবিতার লাইন...হে সমুদ্র, মানুষের হৃদয়ও কি তোমার মতো নয়, একদিকে উত্তাল ঢেউয়ের নিচে অমেয় গহ্বর, অন্যদিকে অবিরাম উত্থান। স্বপ্নের মধ্যে কি একবার ভূমধ্যসাগর দেখেছিল শেখর, তার নীল জলরাশির পাশে শুভ্র বাড়ি, জানালা, ঘরদোর, শুভ্র স্ফটিকের বাড়ি, যা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে যেতে পারে চারদিকে। অন্তত দুটি স্বপ্ন শেখরের মনে আছে, একটি এক আশ্চর্য নীলাভ নদী বা সমুদ্রের ভিতর কোনো প্রবাল দ্বীপ, যার চারদিকে শুধু নীল আলোর দ্যুতি, নীল শাদা ঢেউ আর ফেনার পুঞ্জ, প্রস্রবণ, ফোয়ারা আর স্রোতের খেলা—যতদূর দেখা যায় শুধু আলো আর অনন্ত জলের খেলা—কিন্তু এতটুকুও ভয় করেনিতো!

আর দ্বিতীয়টি, নিশীথের গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এক গম্ভীর

কালো পাহাড়ের চূড়ার দিকে। মধ্যরাত্রের বিশাল কালো, শুধু নক্ষত্রের অসংখ্য স্থির অগ্নিশিখা নিঃশব্দে জ্বলে যাচ্ছে, চারদিক জনহীন, অথচ ভয়ের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই, শুধু একা সে হেঁটে যাচ্ছে পাহাড়ের খাঁজ বেয়ে চূড়ার দিকে, আরেকটু দূরেই যেন সীমান্ত, কীসের সীমান্ত ? কীসের চূড়া ?

এসব স্বপ্ন আজো মনে পড়ে, হয়ত ঐ অনন্ত নীল আলোর ঢেউ ও প্রস্রবণে অতি চেতনার ইঙ্গিত, হয়ত মধ্যরাত্রির গম্ভীর কালো পাহাড়ের চূড়ায় আছে অবচেতন, নির্জ্জন মৃত্যুর সীমান্তে স্তব্ধ উঠে যাওয়ার নির্দেশ।

The waves rolled heaven's likeness infinite
And merged in solemn mystic serenade
The rich and mighty harmonies they made
With all the sunset colours in my sight.

গ্রুবের এভিনিউ আর জান দার্ক পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াত সে। সামনের সমুদ্রে মাছধরার লঞ্চের উড়ন্ত পতাকা কাঁপছে স্পন্দিত হৃদয়ের মতো, পাশেই কফি হাউস। তার খোলা ছাদে চেয়ার টেবিল পাতা। কফি খেতে খেতে চোখে পড়ে নিচেই সমুদ্র, এখন আর বাইরে থেকে জাহাজ আসে না। একসময় ফ্রান্স থেকে সোজা এখানে জাহাজ আসত। সেভাবেই এসে পৌঁছেছিলেন ভূমধ্যসাগরের প্রাচীন তীর থেকে এক পুণ্যনারী, যাঁর স্বপ্ন ছিল নক্ষত্রলোক থেকে অথবা নক্ষত্রলোকের অতীত থেকে দিব্য আলোর গোলক পৃথিবীতে নেমে এসে তৈরি করবে এক আলোর উপনিবেশ।

মানচিত্রে আঁকা ভূলোক মোমের আলোর নিচে কত বড়, অথচ স্মৃতির ভিতর কত ছোটো—সকলেইতো কোনো না কোনো ভ্রমণে বেরোয় ; কেউ স্মৃতিতে, কেউ স্বপ্নে, কেউ দেশভ্রমণে। কিন্তু শরীরের ভেতর আত্মার দিকে রয়েছে আরেক ভ্রমণ, জীবকোষের ভেতর রয়েছে তার অরণ্য, পাহাড়, সমুদ্র, গহ্বর। গহ্বরের ওপাশে আছে আরেক আলো, আরেক শহর, এক বহুমাত্রিক 'স্থান' সময় যেখানে নেই, অর্থাৎ মৃত্যু নেই ; যেখানে সময় একাকার হ'য়ে আছে নিছক সম্ভাবনার মতোই স্থানের বঙ্কিম অনন্তের ভিতর।

এই ভ্রমণ আর্তোর মতো নাটকীয় নয়, কেননা নাটক নয়, আর্তনাদ নয়, শুধু নৈঃশব্দের মধ্য দিয়ে, শরীরকে স্তব্ধ ক'রে নৌকো ভাসাতে হয়। মাথার ভেতর যে সোনালি ঝর্ণা নেমে আসে, তা-ই বেতার তরঙ্গের মতো দূর নিয়ন্ত্রণে ঐ নৌকো চালায়। কীভাবে চালায় হয়ত পাখিরা তা জানে, মাইল মাইল তুষারপ্রান্তরে ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে তারা উষ্ণমণ্ডলের দিকে চ'লে যায় :

কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে/কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে—/সাগরের তিতা ফেনা নয়,/খেলার বলের মতো তাদের হৃদয়/এই জানিয়াছে ;—

কোথাও রয়েছে প'ড়ে শীত পিছে, আশ্বাসের কাছে
তারা আসিয়াছে।

অই দিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর
স্কাইলাইট মাথার উপর,
আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর।

আজ এই বসন্তের রাতে, তাই, শেখরের ঘুম নেই। সে জেগে আছে। □

সাজানো রাক্ষসের জন্য বানানো আতঙ্ক

কমল চক্রবর্তী

আমাকে স্কুলবাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে ভদ্রু বলল,—এখানে, দারোয়ানকে বলে দিয়েছি। হেডস্যার তো বললেন সকালে আসবো।

দারোয়ান দরজা খুলতে ভ্যাপসা গন্ধের সঙ্গে চক, ব্ল্যাকবোর্ডের সঙ্গে ছোট ছেলেদের ঘামের। হ্যারিকেন হাতে ভদ্রু ঢুকল, টেবিলে রাখল, তারপর ডেস্ক সরিয়ে বেঞ্চ জোড়া, চাদর, কাঁথা, বালিশ।

—কাল স্কুল নেই লাটুগিরির পুজো। যতক্ষণ খুশি ঘুমাবেন, আমরা এসে উঠাবো।

ভদ্রু বিছানা ঝেড়ে এখন মাথার কাছে দুটো পুরোনো 'ঘরোয়া' আর পাতা সাদা নেই। একটা 'নব কল্লোল'। —অনেকদিন টাউনে যাওয়া হয় না। বই কিনিব। কিনাই হয় না।

—তোমরা কখন ঘুম থেকে ওঠো ?

—তা ধরুন পাঁচটার উঁদিকে হয় না।

আমি বিছানায় হেলান দিয়ে।

—আপনি জামা-কাপড় ছাড়ুন। জল টিপে দিব।

মুখ মাথা ধুয়ে স্কুল বাড়ির বারান্দায় বসে সিগারেট। দুটো মাত্র রুম পাকা, আর সব এখনও খড়ের। সেভাবে বলতে গেলে গোটা গ্রামে এই দুটো মাত্র কংক্রিট। আমার তো মজা। এ দুটো না থাকলে আরও ভাল হত। খড়ের ঘরে রাত পোহান, ভদ্রুর সিগারেট মুঠো করা ভীষণ আন্তরিক। ধোঁয়া তামাক সব মুঠো করেছে।

এ গ্রামে স্মাগলার নেই, প্রফেসর নেই, টিউশানি নেই, ঠিকেদার নেই, মিল মালিক নেই, কেউ নেই, ফেউ আছে। ফলে পাকা বাড়ি নেই, হাতির উপদ্রব আছে। আর নানারকম বিষধর। এবং নাচনী। শেয়াল ডাকল। কতদিন পরে শেয়ালের 'রাম' 'রাম'। মাঠ ভাঙতে ভাঙতে দিগন্তে।

—একটা শেয়ালের বাচ্চা পুষবো, জোগাড় করে দেবে ?

—কি বলছেন ! শেয়াল অশুভ। কেন পুষবেন ! উটা ঠিক নয়, বেজি নিবেন, বেজি দিব।

ভদ্রুকে বললুম, জগটা বাইরে আনো গেলাসও।

ব্যাগের মধ্যে জ্যান্ত ছটফটে বোতল, স্কুল বারান্দায়। ভদ্রু বলল, খাব না। এই প্রথম একজন গ্রামবাসী রিফিউজ করল,—না, উ আমার চলে না।

কখন ভদ্রু চলে গেছে। বলেও গেছে, হ্যারিকেন শুধু। একটা মানুষ যেন সামনে, কারণ শিখা নাচছে। জ্যান্ত। খেতে ভাল লাগছে। নেশায় ভাল, অন্য ভাল,

নেশা হল শহরের। বাড়ি ফেরার। সময় সচেতন, পরদিন কারখানার, সমাজের কেউ দেখবে, শেষরাতের গাড়ি ঘোড়া। ফলে শহরে চটপট নেশা করতেই হয়।

এখানে, ফিরছি না। ঘুম ভাঙছে না। রাত, আছে কি নেই। সমাজ কোথায়। একা অন্ধকারে মদ খেতে পারলে, সব পারা। মাঠে নেমে জোনাকি ধরব, উঠে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড়ালুম। চকের টুকরো তুলে, বোর্ডে লিখে দিলুম, আই লাভ ইউ। দুটো ইঁদুর ছানা আঁকলুম। প্রথমে একটা গোল আঁক, ফের একটা ছোট গোল। বড় গোলটার মুড়োয়। পেছনে কুটো, ছোট গোলের ওপরে আরও ছোট দুটি গোল্লা। ইঁদুর হয়ে গেল, চাটাই-এ কেউ এক টুকরো পেন্সিল ফেলে গেছে। কোন শিশু। এদের পেন্সিলগুলো কোত্থেকে আসে? আমার আসতো বাবার অফিস থেকে, পেন্সিল রবার, কাগজ, তখনই একটা বিকট শব্দে স্বপ্নের স্কুলবাড়ি ভেঙে পড়ল, পাখি হতে পারে, কোন জন্তু জানোয়ার বা মানুষও।

স্কুল বাড়িতে ঢোকার আগে দেখেছি তখন সূর্য যাই যাই। ছোট ছোট বাঁটকুল ঢিবি। ঠিক পাহাড় নয়। নেড়া, কামানো মুড়ো, মাদ্রাজী পুরোহিতের মোটা টিকির মতই সেই অবশিষ্ট জঙ্গল, ঘন ও মরণোন্মুখ। তবে এইসব পাথরের আড়ালে আড়ালে বেড়ে ওঠা ঝোপ ও অন্ধকার, পোকামাকড় ও অনন্ত বিশ্রাম। খুব কাঁকড়াবিছে। এখন খাবলা খাবলা সরকারি আকাশমণি, সোনাঝুরি ইত্যাদি, স্কুলবাড়ির চারপাশেও ঘন থেকে গেছে। গাছ। এখন দূরে দূরে যেসব ভাঙাচোরা বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছি, সব কটাই খসে পড়ছে, পাথরের দেয়াল। ভাঙছে যেন। ভদু বলেছিল, এখানে একটা অন্ধ ডাইনি আছে, রাতে বাইরে যাবেন না, ভয়ঙ্কর। ওর দৃষ্টিতে পাহাড় শুকিয়ে গেল। ও গাছ খেল, মানুষ খেল, ঘরবাড়ি খেল। এখন আকাশ বাতাস খাবেক। বছর বছর ধান হয় না। জল হয় না। ডাইনিটি অন্ধ, যে দৃষ্টিতে পুকুরের মাছ শুকিয়েছে। ধান ও শিশুর রক্ত।

অনেকদিন আগে মনুর সঙ্গে সোনাগাছিতে। মনুর বাঁধা বিনি। বিনি বলল—একটা মেয়ে আছে, লোকে নেয় না। মাঝে মধ্যে দু-চারজন মদখোর, গাঁজাখোর খুঁটে খায়। তুমি তো লেখালেখি কর, দেখতে পার। শরীর-স্বাস্থ্য তাগড়া, জমবে। খেঁদিপেঁচি নূরজাহান / অন্ধকারে সব সমান। সস্তায় হয়ে যাবে।

কি দোষ? লোকে নেয় না?

—মাসি গাপ্পিকে একবার ডাক।

লম্বা ডাকে বিনি গলা বাড়াল।

একটা অন্ধ মেয়েই, গাপ্পি। দেখতে সুন্দরী ও দুখী। চোখ দুটো সাদা ডেলা, কুমীরের চোখের মত। অনড়।

—আমাকে ডাকলি বিনি? কে, বাবু এসেছে?

মনু আমায় চোখ মারল, দেখতে বলছে, শরীর স্বাস্থ্য। আমরা তিনজন সিগারেট ধরিয়েছি, সবে প্রথম টান।

—বিনি আমাকে একটা সিগারেট দিবি ?

গাপ্পি হাত পাতলো। কথা না বলে প্যাকেট দেশলাই, মনু, গাপ্পির হাতে। সে ফস করে ধরাল।

আর কোনও কথা হতে পারে কি ? আমরা তিনজনে যতটা চক্ষুষ্মান ততটাই মেয়েটি। এবং মনে হতে পারে এখন থেকে অন্ধ মেয়েটিই কথা বলবে, আমরা শুনব। কারণ যে স্মার্টনেস ও তৎপরতায় ফুলস্পীড পাখার মধ্যে একটিও কাঠি বাড়তি খরচ না করে সে আগুন আড়াল করে সিগারেট ধরায়, এরপর সামান্য একজন ব্রথেল গোয়ার আমি মুগ্ধ। তারপর সে আর পিছনে ফিরে তাকায়নি। একথাও ভেবেছিলুম সে কেন বহুব্যবহৃত নয়, সে কেন এতদিন তছনছ হয়নি, সে কেন অন্য হোরদের মত ধর্ষিতা নয়। মেয়েটি টাটকা। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে, ফের বলে,—কজন বাবু! লিখাপড়া জানা মনে হয় গো। দু জন বাবু। কিরে বিনি খুক্ খুক্ হাসছিস কেন ? দু বাবু নাকিরে ? একটা তো নতুন দেখছি।

গাপ্পির চোখ দুটো ক্রমে আমার পক্ষে আর অন্ধকার থাকে না।

আমাকে ভদু বলল, বাইরে যাবেন না।

—ধর যদি একটু হাঁটতে ইচ্ছে করে।

লেখক হিশেবে আমার মুড থাকবেই। লেখক হিশেবে আমার মদ্যপ হয়ে, এই পাহাড়ী রাত্তিরে মাতলামি করার সম্পূর্ণ অধিকার।

খুব যদি ইচ্ছে করে, ঐ দিকটা বাদ দিয়ে আর সব দিকে যাবেন।

যেদিক ভদু দেখাল, সেখানে প্রতিনিয়ত ঘরবাড়ি, খামার, খেজুর গাছের মাথা ভেঙে পড়ছে। প্রতিনিয়ত ওদিকে আকাশ খয়ের রঙের। থমথমে জমাট। যেসব পাখি ঐসব ক্ষেত্রে উড়ল, রাতের দিকে তাদের ডানার হিসহিসানি ও ঠোঁটে সাপ ঠুকরে প্রান্তর পেরোনো বা ইঁদুর, ভয়াবহ।

ব্ল্যাকবোর্ডে কেন যে অ, আ, ক, খ পুরোটা লিখলুম। ক, খ-এ আটকেও গেলুম। এক হাতে মদের গেলাস অন্য হাতে চক। হ্যারিকেনের আলোয়, এইসব পাহাড়ী অন্ধকার। একমাত্র সিমেন্টের ঘরে হাজার বছরের সভ্যতা ঠুক ঠুক করে এসে দাঁড়াল। কি চাই ?

কখনও স্বাতন্ত্রে থাকলেও, হে স্বাধীন, হে অমানিশা, হে বিষুদবার, কখনও একা হয়ে যায়নি। একা ব্ল্যাকবোর্ডের মুখোমুখি ও তস্করহীন এই মধ্যযাম। আমাকে ডাইনি টানছে। ডান।

ভদু বলল,—তিন-চারজন মিলে মাঝরাতে কোমরে ঝাঁটা বেঁধে বিরাট নাচ করে। মড়া খোকা বাঁচায়, খেয়ে ফেলে, ঐ দিকে যেও না।

অথচ আমাকে ঐ দিকেই টানছে। ঐ কুখ্যাত অন্ধকার, যেদিকে ডান, খানিকটা চাঁদ। আলো পড়লে ঐ সমস্ত মাটির বাড়ির অবস্থা ঘোলা। আরও খানিকটা মদ। খুব নেশা হয়ে যাচ্ছে। এক পা দু পা করে শেষ অবধি অন্ধ ডানকে দেখতেই চলেছি।

যেদিকে ভদু যেতে নিষেধ করেছিল। গাছপালা নিথর, পাহাড়ের থমথমে ছড়িয়ে পড়ল। বারে বারে সাঁড়াশির জঙ্গল। টের পাচ্ছি কাঠ চোরদের ফিসফিস।

ঐ দুটো জিনিষ মিশে যাচ্ছে। যখন 'বৃক্ষ' নামের উপন্যাস লিখতে যাচ্ছি। তখন ডায়রি দুটি চরিত্র দিচ্ছে। এক সেই 'পাহাড়ী ডান', দুই 'গাম্পি হোর'। দুটো যে কিভাবে জোড়া, নিজেই বুঝে উঠতে পারিনা। তবে লাগল!

যেবার যাদুগোড়া গেলুম, পুজোর পরে। খুব শরত। সবই দেখছি ভাল লেগে যাচ্ছে, বর্ষার পরের জঙ্গল, রুয়াম পাহাড়। একদিন চা-দোকানে একটি ছেলের সংগে আলাপ। হাত কাটা। আলাপ বাড়ল, সত্তরের আন্দোলনে ছিল। যেখানে ঘাঁটি, আড্ডা, গোপনে জমা হয়েছিল মানুষ ও বারুদ, দেখলুম। সবুজ জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে মানুষ বারুদ নিয়ে স্বাধীনতা তৈরী করছে। মানুষ আর বারুদে মিশে গেলে যে কেমিস্ট্রি, স্বাধীনতা।

ভাল লাগছিল, কোন কোন পাথরের গায়ে এখনও দু-একটা নাম খোদাই। গাছগুলো কাঠ-চোরদের ক্রমাগত লোভ থেকে এখনও বেঁচে। ভাবতে পারছি না, এখানে একটা ফ্রি জোন তৈরী হয়েছিল, তার সামান্য মাত্র চিহ্ন রুয়াম পাহাড়ে রাখা গেল। এত বড় পাহাড় জঙ্গল, এত ঝরাপাতা, এত বসন্ত, শরতের আকাশ কেউ চিহ্ন রাখে না। এত নিষ্ঠুরতা!

এইসব চাকুলিয়া, ধলভূমগড় ঘুরতে ঘুরতে দেখেছি না ব্যবহার করা দুটো রানওয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই সব গভীর শালবনের মধ্যে মিলিটারি ক্যাম্প পেতে ছিল ইংরেজ। যুদ্ধ শেষ হতে দরজা জানালা গ্রামবাসীরা খুলে নিয়ে যায়। কখনও সেইসব ঘরবাড়ির মধ্যে হেঁটেছি। ঘন জঙ্গলের মধ্যে বাঁধানো সিমেন্ট দেখলেই চেতনা 'হল্ট্'। আসলে চেতনা মেনে নিচ্ছে না এটা সিমেন্টের নয়। এটা সবুজ!

আসলে ভদু যখন প্রথমে বলছে,—ভাববেন না, স্কুলবাড়ি আছে, পাকা দালান। আপনাকে খুলে দিব। হেডস্যার দিবেন। উটা আমার ভাবনা।

আমার ভাবনা উটা নয়। ভাবিনি এখানে পাকা বাড়িতে থাকবো। কাঁচা বাড়িই। কিন্তু ভদু ভাবছে আমার মাটির বাড়িতে কষ্ট হবে। আমাকে ফুলকো লুচি, বিছানা, শোবার খাটে বই দিতে চাইল।

আমি এসব চাইনি। এসব গোদাপিয়াশালেও পাওয়া যায়। আমি মশার কামড়, সাপের ফণা, মাটির ঘর, ঘন জঙ্গল, বিষতীর এসবই চাইছিলুম।

অরুণকে বলেছিলুম,—দেখ তোরা এ্যাফরেস্টশন মানে বুঝিস সোনাঝুরি আর ইউক্যালিপটাস্। এতো জঙ্গল নয়, আর ঐসব গাছ পাহাড়ের মাথায় হয় না, এটা এ্যাফরেস্টেশন নয়, ছেনালিপনা। অনেকটা বেশ্যাকে লাল শাড়ি, সিঁদুর কিনে দেবার মত। না হল নারী কল্যাণ, না হল বেশ্যা উদ্ধার। আসলে বেশ ভালরকম যৌন চাগাড় দিয়েছে। কেবল শরীর দিয়ে হচ্ছে না। এক শরীর আর কত মেয়েমানুষ নেয়! বরং খানিকটা সিঁদুরে, আলতায়, খানিক লাল শাড়িতে। বিভিন্ন খাতে

স্খলন চলছে।

তো ঐ ইউক্যালিপটাসও এক ধরনের সরকারি ইজ্যাকুলেশন। কাজ যে একেবারে হচ্ছে না বলব না। এও তো একধরনের এ্যাফরেস্টেশন।

তোরা যারা আপনি মোড়ল লেখক, খুব নিন্দুক। অরুণ বলেছিল,—তোরা সমাজের শত্রু। তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ হলে বলতেন না।

—না না, আগে সরকারি ইজ্যাকুলেশনের ব্যাপারটা বলি শোন! ওকে চেপে ধরি,—ঘটনাটা শোন।

বোসদের ফ্ল্যাটে। ওদের ওখানে সব পরপর পাঁচতলা। সকালে সব বেরিয়ে যায়। মেয়েরা দুপুরে ছাদে ব্রা, ব্লাউজ শাড়ি সায়া শুকোতে দেয়। হচ্ছিল কি, প্রায়ই কোন না কোন যুবতী লক্ষ্য করছিল কারও ব্রা-এ বা সায়ায় শুকনো বীর্য। বিবাহিতারা ভাবছিল হয়তো ভুল করে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অবিবাহিতারা? কলোনিতে এখন বীর্য শুকনো বক্ষ-বন্ধনী বা সায়া অনেক। একদিন একটা রোগা ছেলে লুকিয়ে ছাদ থেকে নামতে গিয়ে ধরা পড়ল।

মেয়েরা তো সহজে ছাড়েনি, ধরে খুব উত্তম মধ্যম। তারপর যা যা শাস্তি সম্ভব, মানে ঐ রোগা, প্রেমে অসমর্থ অর্থে স্বাস্থ্যে অসমর্থ শীর্ণ ছেলেটি গোপনে সুন্দরীদের অন্তর্বাসে যৌবন ঢেলে দিচ্ছিল, যা ওর পক্ষে সেই মেয়েটিকে সঙ্গ দেওয়ার সামিল।

অরুণকে বললুম,—মনে হয় সরকারি এ্যাফরেস্টেশন বোঝানো গেছে। আসলে সরকার মানুষ বাড়াচ্ছিল জঙ্গল কমাচ্ছিল। জঙ্গল যে আর ফিরে আসবে না সে কথা সরকারি চেষ্টা দেখেই বোঝা যায়।

ভদু যখন বলল,—এই সব জঙ্গল ছিল, ডান সব শেষ করেছে।

সামনে তখন নেড়া, ধূসর পাহাড়, ধূ ধূ প্রান্তর।

—দু লোটা মহুয়া আনতে হয় ক্যাপ্টেন!

—এদিকে যে সব নিশাদল, ফলিডল মিশাছে, বলতে বলতে,—দুদিন থাকুন বনা করাবো।

মহুয়াটা নেশার জন্য নয়। গঙ্গাজল। দেখেছি দুচারবার মহুয়া নিলেই ক্রমে প্রকৃতি ঢুকছে। স্নান করালো ঐ মহুয়া, একটা দুটো হার্ডল তো থাকবেই, না হলে এন্দুর আসা! হার্ডল ছিন্নভিন্ন করার খেলা।

সব খেলাগুলোই ঐ। মেয়েমানুষের কাছে যাচ্ছি বা মদ খাচ্ছি, এমনকি সিগারেট, প্রত্যেকবার একটা করে হার্ডল। লাফ মারা তো হল, এবার পার হব কিনা কে জানে। নতুবা কেউ তিনটে চারটে বিয়ে করে? লিজ টেলর যে সাত আটটা বিয়ে করেছে, ওটা কোন নিমফো বা বিকৃত মস্তিষ্কের নয়। কোয়েস্ট। জীবনের বিভিন্ন হার্ডলগুলো। পারব কি? জানা যাচ্ছে না। তবে লাফ দিচ্ছে। লিজ ডগ ডগ লাফ দিচ্ছে। ওর লাফালাফি তুমি অন্য চোখে দেখছো, এই অবধি মণ্টুদা বলেছিলেন। হার্ডলগুলো চিনতে পারো! ওয়ান টু থ্রি। বোসো, এটা দিশি মদ, এটা খালাসীটোলা, ওটা

সোনাগাছি! তুমি নিষিদ্ধ করছো! হার্ডল নিষিদ্ধ করছো। অথচ এসব তো মোলায়েম হার্ডল।

'বৃক্ষ' উপন্যাসে হিরো ছিল, 'নালক', এক বিপ্লবী, তাকে জব্দ করেছিল এক বৃক্ষপ্রেমী। সবটা মিলে গেল। খুঁজিনি। সেন্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউসে, স্রেফ দেড়টা থেকে তিনটে অবধি, ব্যাস্ তারপর। সব চরিত্র পরপর। এদের তো হাতে পয়সা দিয়ে বলা যায় না, যাও দেয়ালে চুনকাম কর, বহুত নোংরা করেছো। এসব কি লিখেছো? দেখ দেয়ালগুলি কি বিশ্রী দগদগে।

তাহলে রুয়াম থেকে কফিহাউস। যাদুগোড়া থেকে সেন্ট্রাল এভিনিউ। হিরোকে খুঁজে পাচ্ছি। যে রুয়াম ফরেস্ট ভয়ঙ্কর সব বারুদ নিয়ে টহল দিচ্ছে। নতুন পৃথিবী। হবে, হবে নাকি নতুন, সবই যখন শেষ হতে বসেছে তখন নতুন হতে বাধ্য। কারণ একটাই, শেষ যে হচ্ছে তার সিগন্যাল। 'নালক' চরিত্রের সম্পূর্ণ এখানেই। এরপর লেখায় যতটুকু।

আসলে আমরা অমুকদা তুসুকদাতে থেমে যাচ্ছি, থামতে ভালবাসি, একটা চা-খানা থেকে আরেকটা চা-খানা! তারপর হাতে পায়ে খিল ধরে যায়।

অন্তত একটা মেয়ে আমাকে ওয়ালডর্ফ বা জিমিজ্ কিচেনে যেতে দেয়নি, সেটা পূর্ণিমাও হতে পারে। কারণ সে-ই আমাকে একদিন বলে, ওসব জায়গায় গিয়ে কি হবে! নিরাপত্তাহীন মনে হয়। ভীষণ হাল্লা। ভীষণ জেল্লা। ভাল লাগে না। বরং বাড়িতে এসো। আমাদের ছাদটা বেশ বড়। ঘুড়ির ফুরি কেটে পড়ে। দু-চারটে ফুলগাছও আছে, যতক্ষণ খুশি বসতে পারো সন্ধে হয়ে গেলেও। অন্ধকারেও কেউ উঁকি দেবে না। এমনকি মাও না। আমার কলেজ অবধি মা খুব উঁকি দিয়েছেন, এখন আর সেসব জ্বালা নেই।

আমি পূর্ণিমাকে সালসা মনে করতে পারি। পূর্ণিমার ক্রমে ক্রোধ লোভ মোহ নিয়ন্ত্রিত বা বেগহীন ভাবা যেতে পারে। কারণ রেস্তোরাঁ মানে তো কেবল যে চাউমিন বা চিলি চিকেনের তা তো নয়, একটা অলিখিত যৌনতা। যেন খাদ্য তো হল এবার বাদ্য হোক। এবং যথারীতি বাড়িতে, কারও পরিচিত মা-বাবার আলো-হাওয়ায় শীতল সব কিছু।

কিন্তু পূর্ণিমা আমাকে মুখ ফুটে বলল,—সে তুমি কি করছো দেখার কেউ নেই, কেউ উঁকি মারবে না। আমার ঘরেও বসতে পারো, দরজা বন্ধ করে দেব। মিউজিক চালিয়ে দেব। জোরে, আস্তে! কেউ অন্য কোন শব্দ পাবে না। এবার ভেবে দেখ।

পূর্ণিমার মা আগে পিয়ানো বাজাতেন, এখন বাজান না। এখন পিয়ানোর ওপরে জলের জগ, পাউডারের কৌটো, ওষুধের শিশি, এঁটো কাপ, ফুলদানী, ছেঁড়া বই, ঝাড়ন, আরও কত কিছু দেখেছি। এইসব জার্মান রিডের খাঁটি পিয়ানো, যাঁরা বাজাতেন কেউ কি বেঁচে?

বলেছিলুম,—মাসীমা একটু বাজাবেন?

উনি কি বাজিয়ে ছিলেন ? একটা মিউজিক শোনা গিয়েছিল ছাদ থেকে। সেটা মাইকে না ক্যাসেটে না পিয়ানোতে ? ছাদে হু হু করে উঠল শূন্যতা। চুমু খেতে গিয়েও দাঁত গুটিয়ে নিলুম। স্তন মুঠো করতে গিয়ে নখ লুকোতে লাগলুম। ছিঃ ছিঃ মানুষের খাটো হওয়া, নষ্ট হওয়া সেই অভিযান ! যাই হোক,

—পিয়ানোটা বিক্রি করে দিতে পারো ? মাসীমা বললেন,—যারা পিয়ানো বাজাতো তারা এখন ছোট ছোট ঘরে উঠে এসেছে। নড়ার জায়গা না থাকাতে দালির সাহায্যে গলাতে হবে ! রাজার হাড় পুষে কি হবে ? এমন কি কত পুরোনো সাহেব—ক্লাবে দেখেছি প্রথমে বারান্দায়, পরে আরও খানিক দূরে রোদে বৃষ্টিতে পচছে। নিতে হলে হাজার টাকাও অনেক। তবু কে নেবে এই রাজ-হাড় ? কে জায়গা দেবে ? কে বাজাবে ঐ রাজমহিষী ? যাদের জায়গা আছে তারা ?

কত কত গ্রামে দেখেছি সিমেন্টের ব্যবহার মানে কুয়োতলা, ঐ টুকুই বা কেন ? কুয়োতলা পোড়ামাটির হতে পারতো, ভালো টেকেনি। আর এখানে তো দুটো আস্ত ঘর।

বিপর্যস্ত সময় ও মিউজিক সিস্টেমের জন্য বেঁচে থাকতে লোভ হয়। মেয়েমানুষের নরম শরীর, মদ্যপান বা নৌকা ভ্রমণ আর টানে না। দালির বেহালা, পিয়ানো, গীটার গলে যেতে দেখে কাম ক্রোধ কবেই শুকিয়ে গেল। তাহলে বাঁচলে বাঁচব মিউজিক সিস্টেমের জন্য।

দুজন মাউথ অরগ্যান বন্ধু, রাজু, নীলু। একজন হাওড়ার, অন্যজন দেশপ্রিয় পার্কের দুজন হারমোনিয়ম। একজন শ্বশুর সত্যেন্দু মজুমদার অন্যজন অরিন্দম গুপ্ত ওরফে বাবলা, বাঁশিও টানে ভাল, গীটার মেজভাই। তবলা, মাদোল প্রচুর। কেঁদ্রি-সংগ্রাম সিং বাগে, ধমসা-দিকু মুর্মু। সবই হল, পিয়ানোতে বসার জন্য সুজান বা বিয়াত্রিচে পাচ্ছি না, তবে ওটা টেবিল হবে নাকি ? কে পিয়ানো ?

ইছাপুরের গান এ্যান্ড শেল-এর বাগানবাড়ি। অশোক নিয়োগী হেড বস। চারটে খেলে তবে গান শুরু। মীনাক্ষীদি উসকে দিলেন, সঙ্গে শক্তিদা সুনীলদারা। গান শুনে সুনীলদা বললেন,—কাল এসো, এইচ. এম. ভি.-কে বলে দেব। মারাত্মক রেকর্ড হবে। কেউ বলল স্বপন বসুরা ভোগে যাবে। গোল্ডেন ডিস্ক হতে বাধ্য। তারপর যে পেরেছে মুখে মাংস দিচ্ছে, মদ তো গড়িয়ে গেল ঠোঁট থেকে বুকে। বুক থেকে পা অব্দি। ঝর্ণার মদ।

গান গাইনি, মিউজিক সিস্টেম বাঁচাতেও চাইনি। ভালবেসেছি। পরে দেখেছি আমার বাঁশিওয়ালাও আছে, আড় ও ফ্লুট দুই-ই। বাবলা পারে। তবে ভয় পাই কেন ? কেন এত ভাবি ? সব উপন্যাসে তুলে রাখতে চাই। যেন উপন্যাসের নাম 'বৃক্ষ'। যেন জোত-জমি সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল্পনিক ভয়ে আধমরা হয়ে লিখতে বসি। আসলে কোন ভয় থাকে না, সাজানো রাক্ষসের জন্য বানানো আতঙ্ক। তবে লিখতে বসলুম সব।

গান থাকল, সঙ্গে ফরিদপুরের বাঁশিওয়ালা, চাইবাসার কেঁদ্রিওয়ালা, মাঠার ধমসা-ওয়ালা, বাঘমুণ্ডীর নাচনী —সরস্বতী দেবীর রেকর্ড। ☐

আজবসম্ভব

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়

[আমার এক বন্ধু ব্রত এই লেখাটির মধ্যে আছে, কিছুটা সে লিখেছে, কিছুটা আমি। কোনো-রকম কো-অথরশিপে বিশ্বাসী নয় ব্রত। নাম ছাপাতে রাজি নয়।]

ক্ষমা করো। আমাকে।
ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা⋯লিখছি বলে।

□ □ □

প্রকাশ-তাড়না, তাকে জব্দ করতে পারিনি, বরং সে-ই চাবকে গেছে আমাকে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আমার ঠ্যাটাপনা, জেদ। এর বদলা নিতে, গোলামের প্রতিবাদ বজায় রাখতে আমার একটাই প্রতিজ্ঞা : ওই তাড়নাটুকুই শুধু ছাপ ফেলুক। নিজে উদ্যোগী হবো না। শূন্যস্থান, ফাঁক ফোকর, যেমনকার তেমন থাকবে, কিছু মেলাতে যাবো না। শিল্পটিল্প নয়, এক্কেবারে নয়।

□ □ □

লিখতে হবে নিজের কিছু কথা , উদ্ভট, খাপছাড়া ভাবনার আঁচড় কাটতে হবে। কিন্তু সেভাবে নিজের কথা কিছু আছে কি ? যা শুধু আমি-ই ভেবেছি, অনুভব করেছি। আর কেউ জন্মে শোনেনি, জানেনা, কল্পনাও করতে পারে না। অথচ সেইসব ভাবনার ছবি দেখা মাত্র এক জাদু সংঘটিত হতে পারে, পাঠক আনন্দ ও পূর্ণতায় ভরে যাবে। মুহূর্তে দেখে ফেলবে, অনুভব করবে এক মহাজীবন।

□ □ □

লোক আর মানুষ এক কথা নয়, নিজেকে আমি একটি লোক ভেবে থাকি। সব লোকেরই বলবার মতো পরিচয় দেওয়ার মতো একটা নাম ধাম থাকে। তারা কিছু কাজকর্ম করে। দু'চার জন লোকের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে থাকে প্রত্যেক লোক। অতিক্রমণের একটা বেগও হয়ত থাকে। যা তাদের কিছু হতে বলে, ঠেলতে থাকে সামনের দিকে। যেভাবে গ্রামে ধুলোরঝড় তোলা রাস্তায় গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান শূন্যে চাবুকের বৃত্ত এঁকে 'হট, হট' করে সেরকম কোনো গাড়োয়ানের কথা অবশ্য জানি না। তবে লোকেরা কিছু একটা হতে চায়, অনন্তযাত্রী তারা।

□ □ □

আমি 'ব্রত', ওই আমার নাম। ব্রত কায়েত, তাতে কিছু এসে যায় না, নামটি আছে বলেই যেন এই কথকথা। নামটি আমি। আবার কখনো নাম স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে, আমরা তখন দু' টুকরো : ব্রত এবং আমি। তবে আকছার এমন আমোদ হয় না।

□ □ □

হঠাৎ একদিন আমি দৃষ্টিতে মরুতৃষ্ণা আবিষ্কার করি। আমি স্পষ্ট দেখলাম মরুর শুষ্কতা নিয়ে জেগে আছে দৃষ্টি।

বা,

দেখলাম নেই। 'নেই' রয়েছে শহরগ্রাম জুড়ে, পাহাড়-সমুদ্র সাপ্টে। একেবারে প্রত্যক্ষ, চোখের সামনে। যেমন আমরা বলে থাকি 'জলজ্যান্তো', একেবারে তাই।

□ □ □

ভয় ও বিস্ময়ের সীমা পেরনো এক তীব্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আমার মনে হল 'এইবার পুনর্জন্ম হবে।' চোখের নিমেষে ব্রত এই লোকটা বদলে যাবে। সে আর কিছুতেই গেরস্থ, সামাজিক, শহুরে, আধুনিক এইসব থাকতে পারবে না। অন্যরকম হয়ে যাবে। আমাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে হামাগুড়ি দিয়ে। এবং সেইদিন আমি সত্যিই হামাগুড়ি দিয়েছিলাম।

একটা সংসারী, হিসেবি লোক রাতারাতি বদলে গেল, সন্ত হয়ে গেল, কুষ্ঠ-রোগীর সেবাদাস বানিয়ে ফেলল নিজেকে···একেই তো ঘটনা বলে! মৃত্যু দণ্ডপ্রাপ্তরা তবু কেন এই রাস্তা মাড়াতে চায় না চট করে? 'মুরোদ নেই বলে'—কেউ-কেউ মনে করে। তারা সৃষ্টিরহস্য জানে না আর যেহেতু সেখানে যুক্তি বুদ্ধির দাপট চলে না তাই একে রূপকথার ভল্লুকের মতো মড়া ভেবে চলে যায়। জ্যান্তেমড়া। রাস্তায় নির্বিশেষের গণমিছিলে জীবিত ও মৃতদের মধ্যে আছি। আর সেই ভিড়ে, মাংসের তাল ও তরঙ্গের মধ্যে এক-আধটা লোক দুর্লভ স্পর্শে ওই রকম কুষ্ঠরোগীর সেবাদাস হয়ে উঠছে। তারা আলোকবিন্দু, সৃষ্টি। মানবজন্ম। সৃষ্টি।

ঘোর অবিশ্বাস গাঙ্গেয় উপকূল ভাসিয়ে হাজার মাইল বেগে ছুটে আসা এক অন্ধ ঝড়। শুধু ধুলো আর ধুলো। শূন্যে উড়ছে মানুষের কাটা হাত আর ছেঁড়া শিরার মতো অজস্র পাতা, শিকড়।

□ □ □

ওটা শূন্য।

কিছু নয় রে বাপ।

আমিও ভেবেছি তাই, এ হল এন-ও নো, নট, নেতি।

ধ্যার, পাগল কোথাকার (আরেকবার 'পাগল' বলো, আহা মরে যাই! যেমন এখানে ততো শহুরে হয়নি এরকম কোনো মেয়ে / মহিলা যদি বলে ফেলে 'মরণ'! তাহলে হতকুচ্ছিত হলেও তাকে বুকে টেনে চুমো খাবো।) যত্তো সব ইয়ে···। শোন, এই না-ফা পেরিয়ে আরো যেতে হবে, এগিয়ে যা, আরো, আরো···

□ □ □

অসম্পূর্ণতা অনিবার্য। অংশ—অংশই ; সে যে কোন সমগ্রের অংশ তা আমি জানি না, সমগ্রই বা কী, সে কার অংশ ! দেহের টুকরোগুলিই তো 'সতী'-কে রূপকথার নারী করেছে।

শব্দের মোড়কে, বাক্যবন্ধে, তার বন্ধনীর মধ্যে সময় রয়েছে, আছে প্রতিটি 'অক্ষরের' বিন্দুর ফাঁকে, সময় স্পন্দিত হচ্ছে। এই রকম সব ভেবে থাকি। মিথ্যে ভাবনা না কি ভাবনাই মিথ্যে হে ভাবুনে !

যুক্তিশৃঙ্খল দাসরাই হাতুড়ি পিটিয়ে গড়ে চলে মহাপ্রেরণায়, তা বোঝা গেছে ভুরিভুরি ঘটনায়। আশ্চর্যের কথা অমোঘ সেই বিশৃঙ্খল ঘটনা সমূহকে কার্যকারণ সম্পর্কে চিহ্নিত করার দুর্মর বাসনা তবু নেতিয়ে পড়ে না। সে ঘটনার পিছনে, অতীতে হানা দিয়ে এমন এক গল্পক্রম রচনা করবে যাতে সূত্রটির অমরত্ব প্রসঙ্গে আঙুল তোলার সাধ্য হবে না বিপ্লবগর্ভে ওৎ পেতে থাকা ক্ষমতালোভী কোনো কীটের বা সৎ ব্যক্তির। ফাঁকির টাকির বাদ। তাদের কেউ হিসাবের মধ্যে ধরে না। আর সত্যি বলতে কি ফাঁকির মরে ভূত হয়ে গেছে। হিসেবি নাগরিকরাই ধান্দা আর ফেরেববাজি করতে মৃত ফাঁকিরের উর্দি গায়ে চাপিয়েছে।

অনুকরণবৃত্তি : যাকে অনুকরণ করি, যার ছায়ার উপর পা ফেলি সেই গুরু বা দাদাটি খুন হবেন। খুনি পরম শ্রদ্ধায় তা করবে, করবে গুরুকে শুষে নেওয়ার তাগিদে। অনুকরণ প্রবণতায় সে গুরুর সমস্ত ভঙ্গি, রচনা ও বাককৌশল এমন আয়ত্ত করবে যে গুরুটি তারপর এক নিষ্প্রয়োজনে, ছাতানাতা, খোসায় পরিণত হবে। সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে এরকম এক খুনের বৃত্তান্ত থাকে, মুগ্ধ পাঠকই সেই রহস্যের উন্মোচক।

□ □ □

আত্মার দোসরদের আজ আর আমি বিশ্বাস করি না, তারাও আমাকে দেখে ভেংচি কাটে, কলা দেখায়, আড়ালে খিস্তি করে। আমরা যেন 'অপদার্থ' আর 'নির্দয়' এই দুটি টুকরোয় ভাগ হয়ে গেছি, ছিটকে পড়েছি। আমাদের মধ্যে ব্যবধান, চাপচাপ রক্তের, জন্মের, মৃত্যুর এবং প্রগল্‌ভ সাহিত্যের।

□ □ □

জন্মানোর আগেই হাঁটতে হচ্ছে, কথা বলতে হচ্ছে। হাঁটছি কালো রেখা ধরে, শহরে সমতল হয়ে শুয়ে থাকা জেব্রার পিঠের উপর দিয়ে। লালটুপি নেই কেন ভাবি। পুলিশরা সাদা হয়ে গেল রাতারাতি ! এইটি স্বাধীনতা, মানে পনেরোই আগস্ট।

কী লম্বা লম্বা পা ফেলছে সবাই, ছোটার থেকেও মারাত্মক গতি যেন, বয়স্ক বলেই শুধু ছুটতে পারছে না, এক্সপ্রেস রোডের মিনিমাম স্পিড বজায় রাখতে না পারায় জেল জরিমানা হয়ে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কেন এই তাড়া, কীসের এত তাড়া—জানবার দরকার নেই, হয়ত পেছনে আগুন ছুটে আসছে।

গত মাসে সুইসাইড নোট রেখে যে লেখকটি সাদা পোশাকে সকলের ঘাড়ে চেপে নিমতলা ঘাটে গেল, লোকের মুখে এখন কেবল সেই লেখকটির কথা, তার মুদ্রাদোষ নিয়ে আলোচনা, বলে,

'উনি যেমন খেতে ভালবাসতেন তেমনি খাওয়াতেন।'

'আর কী আড্ডাবাজ ছিলেন।'

□ □ □

আয়েসা জিপসি গায়িকা, মাত করেছে শহর। বেলিডান্স জানে, আয়েসার তলপেট আর নাভির নৃত্যে কে-একজন নটরাজকে চাক্ষুষ করেছে। আয়েসার প্রেমে পড়েছে তিন পুরুষ, তিন প্রজন্ম।

চুম্বনে-চুম্বনে খুলে পড়েছে আয়েসার ঠোঁট। সেইদিন 'দিলখুস' সাবান কোম্পানির উৎসবে উপস্থিত ছিল প্রভাবশালী এক সম্পাদক ও তার উপদেষ্টারা, ভি সি এবং তার গুপ্তচররা, পুলিশের কর্তা ও দার্শনিকরা।

কাগজের টুকরো, কাগজের বল, কাগজের নৌকা…যেন ভাসিয়ে দেওয়ার গূঢ় ইচ্ছে, ব্রত'র। দাগ কেটেছে কাগজে, দাগের পর দাগ, অক্ষর, বর্ণমালা ; স্বতন্ত্র এক পৃথিবী। কাগজের গন্ধ শুধু। সে হাত বোলায় অক্ষরগুলিতে।

অফিস করা এই লোকটির এ এক স্বেচ্ছা নির্বাসন। লিখে ভাবে সে, লেখার মাধ্যমে ভাবে। ধার্মিক মানুষজন যেমন পুজোআচ্চা করে থাকে, পতিতা যেমন সন্ধ্যায় সাজে আর অপেক্ষা করে, রাত জাগে। এভাবে ব্রত আজগুবি আঁচড় কাটায় নিজেকে সঁপে দিতে পেরে বেঁচেছে যেন। কিন্তু সেই বাঁচা অন্য এক ব্রতের, অন্য কারও বাঁচা। ৫ ফুঃ ১১ ইঞ্চি, ৬২ কিলোর রক্তমাংসের যে ব্রত তার জীবন নয়, তার বাঁচা নয়। সে তাহলে গেল কোথায় !

□ □ □

অন্ধকার নিকেশ হয়েছে। লোকজন এখন আশার তুবড়ি। তাদের গা থেকে, লোক-জনের রোমকূপ থেকে ঘামের মতো নিঃসৃত হচ্ছে একরকম দ্যুতি। যেন তারা হীরকখণ্ড। ওই হাসিকে দাঁতের কেরামতি ভাবা সম্ভব নয়।

□ □ □

দ্যুতির ভ্রম বড় মধুর। ব্রত মনেপ্রাণে চায় এই ভুল যেন জীবনে না ভাঙে, তাই সে নিজের জানাকে মুছে ফেলতে চায় মুছে ফেলতে চায় প্রশ্নচিহ্নগুলি ও তার দাগ। যেন সে কোনওদিন জানেনি, জানবেও না কোনওদিন। যেজন্য তাকালেই দেখতে পাবে স্বচ্ছ চামড়া, দ্যুতি সেখানে কাঁপছে।

□ □ □

হয়ত কোথাও ব্রত দেখল কারও মুখে খই ফুটছে। খই নয়, অজস্র সূক্ষ্ম শিকড় সেসব, যারা মানুষটাকে ফাঁসিয়েছে, সে কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছে না শিকড়জাল থেকে। ফেনা

গেঁজে উঠছে, হাঁসফাঁস করছে মানুষটা। অজস্র কথার বিচিত্র ধ্বনি ও কম্পন যেন হাত, আঙুল। লোকটার গলা টিপে মারবে। আর মরিয়া লোকটি টেবিল, গ্লাস, পর্দা, সার্টের কোণ কিংবা কারও হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে রেখে জীবন চালান করছে, এই সিকোয়েন্সটির কথা ব্রত তার এক বান্ধবীকে বলার চেষ্টা করেছিল।

বান্ধবী পাকা অভিনেত্রীর মতো চোখ দুটির চমৎকার বিস্তার ঘটিয়ে কৌতুক আর বিস্ময়ের মিশেলে তাদের ছায়াদির্ঘি করে তোলে।

ব্রত চেষ্টা করছে অতীত কল্পনার, স্মৃতি টুকরোর বাস্তবানুগ ছবি আঁকতে, তাকে মূর্ত করে তুলতে।

এখানে সমান্তরাল এক অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে, মূর্তি গড়ার প্রবণতার কথা ভাবে সে। এইজন্যই সে ব্রত, সমস্ত মানুষ ব্রত, তাদের যেন সৃষ্টি করতেই হবে, ঈশ্বরের দেহ তারা ঝলসে খেয়েছে, সেই মাংসের টুকরো তাদের শরীরে এক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ধনী-দরিদ্র সবাইর পিঠে স্রষ্টার উল্কি হয়ে ফুটে উঠেছে। তাদের চাবকে মনে করিয়ে দেয় সর্বক্ষণ, ঘুমের মধ্যে টেনে তোলে, স্বপ্নে ভূমিকম্প ঘটায় আর তখন শোনা যায় ওই বজ্রনির্ঘোষ : আহার-নিদ্রা-মৈথুনই তোমার জীবন নয়···

বান্ধবীর কাছে এই উপাখ্যান সে কীভাবে বলবে ভেবে পায় না, অনুভূতিমালা তাকে শিকলে জড়িয়েছে, ব্রত লেখকশিল্পী নয়, জীবনবীমার কিস্তি মেটায় সে, আয়কর ছাড় পেতে সরকারি কাগজ কেনে, কম টাকায় কম খরচে চলার চেষ্টা করে, ট্যাক্সি চাপে না, উচ্ছৃঙ্খল নয়, সমস্ত রকম নিয়ম ও আইন-কানুনের প্রতি সশ্রদ্ধ বিনয়চিত্ত এই মধ্যবিত্ত কী করে বিদ্রোহী শিল্পী হয়।

বান্ধবী : তুমি কি লেখক, ব্রত !

ব্রত : মেয়েরা বড় লেখকভক্ত, কেন বলো তো ?

বান্ধবী : অন্তর্দৃষ্টির জন্য।

ব্রত : কার, লেখকের না কি মেয়েদের।

বান্ধবী : জন্মের।

ব্রত : জন্মের ?

বান্ধবী : হ্যাঁ আমরা জন্ম সম্ভব করি, গর্ভধারণ করি। হাঃ কোথায় সেই লেখক ! যিনি জন্ম সম্ভব করে তোলেন, সৃষ্টিদিগন্তের প্রসার ঘটান ! আমরা কি নিখিল ক্ষুধায় তাকেও সেদ্ধ করে খেয়ে, মাতাল হয়ে নাচিনি : রাম্বা হো হো হো, রাম্বা হো···

এইরকম সব অবাস্তব, হয়ত-বা বানানো গালগল্প কথায় ব্রত'র আর বলা হয়ে ওঠেনা সেই সিকোয়েন্সটির কথা। বান্ধবীর সামনে পাথর হয়ে একপ্রকার নারী-পুরুষ রসায়নে মজে যেতে থাকে।

□ □ □

আড্ডা আড্ডা আড্ডা

ব্রেনস্টর্মিং

ঝড়বাতাস মস্তিষ্কে
আলোড়ন ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাসে ভাসা

□ □ □

দ্যাখো আড্ডা গেলে বাঙালির আর থাকেটা কী! / এই বাক্যে আমরা আছি / ভোট দিচ্ছি / আমার / সুহিতারও / কেননা বাক্যটিতে বাঙালি শব্দটি আছে / আছে মায়াও / আর আলস্য / চিন্তা[১] / ব্রেনস্টর্মিং / হ্যাঁ সত্যি / আড্ডা গেলে বাঙালির কিসসু থাকে না / না না / বাঙালির / আড্ডা / কী থাকে ? / কী ! / কী ! / আর চক্র গেলে ? / চক্র ! / চক্র কী / চক্র চক্রান্ত / যেমন যেমন···

□ □ □

এসব বাদ দাও, আমি এখন যশস্বীদের কথা বলব, একখানা ম্যানুয়াল বানিয়েছি খ্যাতি-ক্ষমতা অর্জনের উপায়, পড়ো, পড়ে দ্যাখো :

ক ॥
নিজের একখানা ইমেজ চাই, সেই ইমেজটিকে ফলো করো অন্ধের মতো।

খ ॥
বেশি হ্যা-হ্যা করবে না।

গ ॥
বাজারে চালু মতগুলো খুঁটিয়ে দেখে যে-মতটির পিছনে লোকবল অর্থবল আছে আবার একটু নতুন রকমও সেরকম মত বেছে নাও এবং চেষ্টা করো তাকে একটু ঝকঝকে করে তুলতে।

ঘ ॥
খুব রাগী কিংবা আত্মবিনয়ী হলে চলবে না।

ঙ ॥
ভাল ইংরেজিতে সালিশ করতে পারলে বঙ্গদেশে সাত খুন মাফ—এই প্রবাদ কিন্তু অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি।

চ ॥
বৈঠকী আড্ডায় দড় হওয়া চাই। তুমি লেখক লেখাই তোমার কাজ, তুমি ছবি আঁকিয়ে ছবি আঁকাই তোমার সব এমনটা কিন্তু চলবে না। ওগুলো হল তোমার মাল। বিক্রি করতে জানতে হবে। সেই মার্কেটিং-এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল পীর জপানো, বাবু ভজানো···বুদ্ধিদীপ্ত ভাঁড়ামির কোনো বিকল্প নেই।

□ □ □

ব্রত ডেল কার্নেগি নয়, তাই যশলিপ্সা চরিতার্থের সচিত্র পদ্ধতি প্রকরণ নিয়ে ভাবনা-

---

১. ব্রত'র সংযোজন : 'বাঙালি চিন্তাবিদ' এই কথাটা আমাদের প্রাণের থেকে প্রিয়। যখন তখন লোকজনকে 'অশিক্ষিত', 'মূর্খ' বলে নির্মল আনন্দ পাই আমরা। কলকাতায় এমন কোনো লায়েক পণ্ডিত নেই যাকে অন্যে কখনো মূর্খ বলেনি।

চিন্তা সে মাঝ পথে ছেড়ে দেয়, বোর হয় এবং দুটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে এ সম্পর্কে, 'ধ্যাত শালা'।

□ □ □

সাদা কাগজ আকাশজমি, শূন্যবিস্তার, ব্রত সেখানে দাগ কাটছে। অর্থহীন, প্রলাপ। সে খুব সচেতন, চায় না বিশেষ গল্পকথা রাখতে, সাহিত্য করতে। বরং ডালপালা আতিশয্য বিসর্জন দিতে বদ্ধপরিকর। নেবে শুধু বাস্তবের নির্যাসটুকু। আশ্চর্য, তাই করতে গিয়ে দেখেছে বাস্তব খোসাসার।

এই যে সে যশ-টশ নিয়ে তেতো কথা বলে ফেলল তার পিছনে সামান্য ঘটনা আছে। সে ওই ঘটনার প্রভাব এড়াতে পারেনি। কফি হাউসে তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল শ্যামল ঘটকের। পঞ্চাশ পেরনো শ্যামল গল্প-নাটক-গান চেষ্টা করেছিল তার খ্যাতি হয়নি। কফি হাউসে সে ব্রতকে :

এই বয়সে বুঝি মধ্যবিত্ত বাঙালির কিছু পরিমাণ যশ না থাকলে তার কোনো নিরাপত্তাই নেই।

আবার আমেরিকা যাওয়া যার কাছে রাণাঘাট যাওয়ার মতো এমন এক পণ্ডিত বন্ধু কেন যে এই ব্রতকেই বলতে গেল, বলেছিল :

ওখানে যারা নামী তাদের চেনে-মানে শুধু সেই ফিল্ডের লোক, এখানে যেমন নামজাদা লেখক পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে তার শালির বাড়ির ভাড়াটেকে (তোকে) রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে পারে তেমনটা…

□ □ □

ব্রত'র রচনায়, এই দাগ কাটায়, পারিবারিক বৃত্তান্ত গরহাজির। গাছ নয়, আমাদের সে উপহার দিতে চায় শুধু গাছের ছায়াটুকু।

এই পদ্ধতি, এভাবে দেখাটা ব্যাধি বলে ভাবা যেতে পারে, বিশেষ যখন 'সমাজ সচেতনতার' বেনো জলে সব ভাসছে। কিন্তু তাতে তার, ব্রত'র এবং ব্রত'র মতো অন্তরে প্রান্তবাসী যারা তাদের কীই-বা এসে যায়।

এই ছাপা লেখাটি ছিঁড়ে ফর্দাফাই করলে, আগুনে গুঁজে দিলেই-বা কী…

□ □ □

বানানো সাহিত্যের বিরুদ্ধে এখনকার লেখকদের বিষোদ্গারে প্রায় সকলেই ভীত, এমন একজন লেখকও খুঁজে পাওয়া কঠিন, যিনি বুকে টোকা মেরে বলবেন, 'হ্যাঁ আমি বানিয়ে বানিয়ে লিখি, মিথ্যে কথা লিখি, একটু সেক্স-টেক্স-পলিটিক্স-টলিটিক্সের মিশেল দিয়ে। লিখি দৃষ্টিকামুকদের জন্য। 'ছোটলোকের' যৌনজীবনের বিবরণ রচনা করাই আমার কাজ। লেখকরা বলবেন তাঁরা সমাজের ছবি এঁকে চলেছেন, কারো-কারো অবস্থা আরো খাসা তাঁরা বলবেন মানুষের মনের ছবি। এঁদের কপালে তৃতীয় নয়ন আছে।

আমি একটি কারণবশত ('কার্যকারণ' সূত্র মানেন সকলেই) এই প্রসঙ্গ উত্থাপন

করলাম। ঘটনার বিবরণ ও বিবরণাত্মক গদ্য রচনায় বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই আমার। মুন্সিয়ানাও নেই। কলকাতায় পদ্য নিয়ে খুব নাচানাচি হয়। গদ্য তথ্যবাহক হলে, তার নথি-চরিত্র থাকলে তবেই লোকে পোছে। ছেলেবেলায় মধ্য ও উত্তর কলকাতায় আমি নতুন-নতুন গলি খুঁজতাম। আবিষ্কারের নেশা। আবিষ্কার রোগাক্রান্ত ছিলাম। সেই রোগ আমার সারেনি। মনে হয় না কোনোদিন সারবে বলে। আমার এক তাত্ত্বিক বন্ধু বলেছিল 'বাঙালি এটা পেয়েছে সাদা চামড়ার কাছ থেকে। আমাদের আবিষ্কারের কোনো কনসেপ্টই নেই, আমাদের আছে সৃষ্টি।' সে যাক, আমি আবিষ্কারের কথাই বলি, নেশার কথা বলি :

পার্ক স্ট্রিটের এক বারে এর সূত্রপাত। আমি ও আমার মতো তিন চার মন্দা বসে গিলছিলাম। এবং এক গভীর আবেগে অনর্গল মিথ্যে কথা বলে যাচ্ছিলাম। যদিও ভেবেছি বলছি প্রাণের কথা। আবেগের ঢেউয়ের চূড়োয় উঠছি। পড়ছি।

আমাদের মুখ থেকে কথাগুলো টেবিলে পড়া মাত্র কেমন জীবন্ত, বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছিল।

আর সেই সঙ্গে গলার টিউব বেয়ে নামছে মদ :

আমাদের প্রতিদিনের মামুলি জীবন এক ডাহা মিথ্যে।

মেয়ের স্কুলের বেতন বউয়ের অপারেশন

ইন্সুরেন্সের প্রিমিয়াম রাবিশ

শালার বিয়ে জঘন্য

ইনক্রিমেন্ট প্রস্রাব

চাকরবাকর

জীবনযাপন চাকরবাকরের

বারের নীল, ম্লান আলোয় আমাদের দেশের ভূগোল হারিয়ে গেছে কোন চুলোয়, আমাদের মা-মাসি নেই, কাফকা আছেন, তিনি বিষময় করে তুলেছেন আমাদের জীবন। (হায়) কাফকা ! নিঃসঙ্গ মানুষ !

চার পিতামহ, চার চিরযুবক পিতামহ আমরা, পুরুষ, অভিযাত্রী, আমরা, নাবিক

অমুক শালা সাহেব চাটা, সাহেবের গু খায় আর কাঁধ ঝাঁকায় : এনি প্রবলেম ?

আমরা আমরা

একটা গোষ্ঠী, আলাদা ধর্মের জাতের, গোপন তন্ত্রের সাধক, মড়ার মাথার খুলিতে মদ খাব, উলঙ্গ হয়ে নাচব, পার্ক স্ট্রিট আমাদের, সোনাগাছি আমাদের, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আমাদের

□ □ □

এই খাড়া অবস্থা ঘুম কেড়ে নেয়, বিচ্ছিন্ন হয়ে (চার এই সংখ্যাটি থেকে), ১ হয়ে নেতিয়ে পড়ে থাকি বিছানায়, ডি-হাইড্রেশনে গলা শুকিয়ে কাঠ, বুকে পেটে খরা, মাথা লোহার তাল।

□ □ □

প্রত্যেকবার দেখেছি পরের দিন ঘুম ভাঙে গলা পর্যন্ত, বুক পর্যন্ত তেতো স্বাদ নিয়ে, মাথাটা খুলে পড়ে যেতে চায়, গড়িয়ে যেতে চায়, ভয়ে-আতঙ্কে দুহাতে মাথা চেপে ধরে বাথরুমে ঢুকে পড়ি, জল ঢালতে থাকি, জলে কেন গলে যাই না ভাবি, বিজ্ঞাপন কোম্পানি শ্রীদেবীকে সাবান করেছে, আমি সাবান মাখছি, শ্রীদেবী সাবান, ফেনায়, নরমে, হাঃ বিজ্ঞাপন, যৌনতা, রসের পণ্য, মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, মাথা খসে পড়বে টুক করে বলের মতো, ছোটবেলার মার্বেলের মতো···। কেন বেঁচে আছি, ভাবি,···যদি নিজেই নিজের জন্ম দিতে না পারলাম তাহলে কেন বেঁচে আছি, মদের খোয়াবের খোয়ারির জীবন তখন অবসন্ন হয়ে দূর থেকে দেখি সে একটা আকার নিজেরই এক ভিন্নরূপ, একজন ক্ষুদ্র ফ্যাসিস্ত সেই টালমাটাল স্ফূর্তির মধ্যে ওত পেতে আছে দেখি।

□ □ □

নিষিদ্ধ আপেলটি খাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক (ব্রত লিখেছে, 'ফ্রুট অব দ্যাট ফরবিডন ট্রি' সে পড়েছিল)। বন্ধুগণ ও পরিবার : আপেলের দুটি টুকরো। আপেলটি খাওয়ার পর ব্যক্তির পক্ষে আর ওই দুটি টুকরোর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়, সমাজ এবং ব্যক্তি এইসব, বা যেমন 'দেহ' 'মন'। 'দেহ' আলাদা, 'মন' আলাদা। সাধারণের ঊর্ধ্বে যাঁরা, যাঁরা মহান এ-দুয়ের ফাঁকে তাঁরা সেঁধিয়ে যেতে দেখেছেন শিল্পবিপ্লব, প্রযুক্তি, অর্থ আর সমাজের ছক। সন্তরা এই ফাঁক সরিয়ে নিতে চান, 'দেহমন' এক করে সঞ্জীবনের বাণী প্রচার করতে খালি পায়ে তাঁরা পৃথিবীর পিঠে হেঁটেছেন হাজার লক্ষ মাইল, হাঁটবেন ভবিষ্যতের সন্তরা, ভবিষ্যতের ভবিষ্যতেরও।

□ □ □

ব্রতর অন্তর্কথন, তার এই টুকরো টুকরো লেখা বিভিন্ন রকমে সাজানো সম্ভব। আমি একরকম করেছি, ইচ্ছে করলে দু-একটি টুকরো সরিয়েও নেওয়া যায় যেমন আপেল অংশটি।

ব্রত'র যেন কোনো দায়দায়িত্ব নেই, তাই বিশৃঙ্খলা, পারম্পর্যের অভাব, অসংলগ্নতা ইত্যাদি নিয়ে সে এতদূর মাথা ঘামায়নি যে কোথাও-কোথাও বাক্য অসম্পূর্ণই রেখে দিয়েছে। তার বক্তব্য নেই অথচ কথা আছে, সে কথা আবার মেজাজমাত্র। ভাব নয় সে যেন প্রকাশ খুঁজছিল, প্রকাশের জন্য ভাব, সে লিখেছে 'যেমন সূর্যোদয়। তাকিয়ে দেখি কী প্রকাশ!' হ্যাকনিড, ক্লিশে, তবু লাইনটা উদ্ধৃত না করে পারলাম না।

□ □ □

পাকস্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় ইত্যাদি, যা-সবে এক সমগ্র, সে ব্রত।

এই মুহূর্তে 'শরীর' এবং 'সে' ইত্যাদি জড়িয়ে তর্কপ্রশ্নট্রশ্ন নয়। অ্যাসিড আগুন অনুভব করছে সে। প্রশ্ন হল : এই অনুভব কি কপট? যেমন ছিল ঋত্বিকের একটি ছবিতে 'আই অ্যাম বার্নিং'। এ কি কপটের ধ্রুপদ সংগীত?

□ □ □

কলকাতায় একসময় জনবৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত গুজব, প্রতিমুহূর্তে হাজার

হাজার গুজবের জন্ম হত। আর সেসব গুজবের কি কল্পনা শক্তি!
ব্যান্ডেজভূত।

একটি মানবদেহ ব্যান্ডেজের পরতের পর পরতে ঢাকা পড়ে গেছে। ভূত হয়েছে। ওই গুজবে আমার আপনার কথা বলা হয়েছিল। 'ব্যান্ডেজভূত' শব্দটির ব্যবহার ছিল যেন আমাকে-আপনাকেই আঙুল তুলে দেখানোর মতো।
ওই, ওই।
ওই লোকটা।
সত্যি অত আবরণ কে খুলবে, সরাবে, ন্যাকড়ার পরতের পর পরত। তাতে কি খনন-কারীর জীবনই ফোত হয়ে যাবে না, সে মরে ভূত হবে না?
অতএব, ছোড়ো এয়ার।

□ □ □

ফাজলামি করা যাক, ফিচলেমি করা যাক, সরি, প্লিজ নো সিরিয়াস টক, উই হেট সিরিয়াসনেস, হাল্কাভাবে নাও, জীবনকে হাল্কা করে নাও, মাডোনার 'সেক্স' দ্যাখো, পড়ো, এই গ্রহে আমাদের সকলের, সব পুরুষের ওই এক কামিনী।

□ □ □

পুরুষ! হা! হাঃ পুরুষ। তার গায়ে অসুর শক্তি, জয়ী সে, বুড়ো সিংহ, সে ব্রহ্মাণ্ড খাবে, হাঁ-করাও, দেখবে মা—মাডোনা সব গিলে বসে আছে।

□ □ □

শেষ আর শুরু। শুরু—শেষ, শেষের শুরু...
এক মারাত্মক পুনরাবৃত্তি শুরুর, শেষের। ব্রত জানে এইরকম মনে হওয়া অসুস্থতা, আর অসুস্থতা মানেই তার অপেক্ষায় আছে এক প্রেসক্রিপশন, লাল-নীল ক্যাপসুল, থেরাপি ইত্যাদি। তোমার জন্মের হাজার-হাজার বছর আগের ইতিহাস-নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে তুমি শালা কী করে এদিক-ওদিক ছিটকে যাবে? বলবে, এসব নয়, পথ নয়, পথ কোথায়, সযত্নে গড়ে তোলা, মিথ্যে কল্পনায় বানানো এই ইতিহাসের পথ, পথের দুধারে গথিক স্থাপত্যের বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, জেলখানা ও পাগলাগারদ...ব্রত যেন বানের জলে ভেসে আসা খড়কুটো। আর বন্যা যেন মহাপ্রলয়, চলেছে মহাকাশ জুড়ে। সে এখন কাগজে একটি গণ্ডী এঁকে লক্ষ্মণ ও সীতার কথা ভাবছে? কেন সীতাকেই বলা হল: তুমি ওই গণ্ডীর বাইরে পা দেবে না?
বার্থক্রাই।
জন্মের কান্না শুনতে পাচ্ছে সে, সমস্ত কথা কান্না হয়ে যাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে সেই ট্যাঁ ট্যাঁ...পরে যত দিন ঝরেছে, যত বেশি দিন বেঁচেছে ততোই জীবন কেমন শক্তপোক্ত, অনড় হয়ে ওঠে, সে কান্না ভুলে যায়।

□ □ □

ভক্তরা কাঁদছে আনন্দে, কেদারে পোঁছে শ্যামলের হাসিখুশি, গোলগাল বউটি নাকি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল,

ভক্তের, ভীতের, অসহায়ের কান্না, তাদের রোমকূপ, প্রতি কোষ কাঁদছে, ন'দের নিমাইর অশ্রুনদী, ওই নদীতেই নিমাইর জন্ম…বেশ কথাটা অশ্রুনদী।

□ □ □

একটি ক্লিশে : জীবন শিল্প।

□ □ □

ধুলো ময়লা, কাকের গু, মাকড়সার জাল ইত্যাদিতে ওই শিল্পমূর্তি আবর্জনা হয়ে আছে।

মূর্তির পিছনের মানব-মানবী স্বামী-শালা-দল-অফিস-য়ুনিভার্সিটি-সরকারের চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে কবে। এইসব লোকলস্কর ও আসবাবপত্র সরিয়ে নিলে ওরা কি বাঁচবে ? শিল্প হবে ?

না—হে।

১৯৯২-তে শুধু নয়, ১৮৩৩ সালে, ১৭শো, ১৬শো… কখনো হয়নি।

কখনো হবে না ?

না, শুধু কল্পনায়, পাগলামিতে বাঁচতে পারে।

'ভোলা মন রে-এ…এ,' বলে সুর জাগানো কি সাধে !

□ □ □

ব্রতর বোকা বোকা প্রশ্নের নমুনা :

সময় রাতদিন, জীবনমৃত্যু, তার শুরু নেই, শেষ নেই, তাহলে সে কি আছে, কাকে বলে সময়ের ফসল, কে জন্মেছে তার গর্ভে, গর্ভই বা ছিল কোথায়।

? ? ? ? ? ?

□ □ □

'জলদি', 'জলদি কিজিয়ে'…

ট্যাক্সিওয়ালা চটে যাচ্ছে, তবে সে বেশি চটে ওঠার আগেই নরম একতাল মাংসের যুবতী ট্যাক্সির পাল্লা টান মেরে বন্ধ করে, কাচ তোলাই ছিল।

ঘাউরা পুরুষ কাচের কফিনে, লোহা আর পেট্রোলের গন্ধে ধোঁয়ায় মেয়েটিকে আশ্রয় নিতে দেখে ঘেন্নায়, রাগে, যৌন আক্রোশে খিস্তি করে।

রাস্তাঘাটের এই সেক্সভায়োলেন্স, এই রগরগে নাটকে যে বিনোদন কোনো সাহিত্য-পত্রিকা, মঞ্চ বা ফিল্মের সাধ্য নয় তেমন বিদ্যুৎবিনোদন সৃষ্টি, তাই ওসব উঠে যাবে, থাকবে না।

ঘটনাটি এরকম :

ওদের মুখে গরম শ্বাস ছিল, ওই শ্বাসই ছিল উৎস, 'কথা'-দের জন্ম হচ্ছিল উত্তাপে, আগুনে। আর তারা জন্মানো মাত্র রাস্তার নারী পুরুষ হয়ে পড়ে নির্জীব মাধ্যম।

কথারা সেই মাধ্যমে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে, তাদের ঠোঁট, জিভ ফাটিয়ে ছুটে আসছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল চারদিকে। কথার সেই ছুট, সেই বিস্ফোরণের মধ্যে একটা দেখনাইপনাও ছিল। তারা তরঙ্গের মতো, ডেকে-ডেকে বলছিল 'শোন, শোন'··· না শুনি সাধ্য কী! এই ঘটনা, সংলাপের ঘটনা এসপ্ল্যানেডে, ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে।

কালো আর হলুদে দু' টুকরো ট্যাক্সির পেট হাঁ-করে খোলা, যুবতী তার নরম শরীর (নাকি শরীর যুবতী) ট্যাক্সির গদিতে ছুঁড়ে ফেলার আগেই সংলাপে মেতেছিল বছর চল্লিশের ঘাউরা লোকটির সঙ্গে :

দেখা হবে না।

কেন ?

থাকব না।

মানে ! থাকবে না মানে, হাওয়া হয়ে যাবে নাকি ?

হাওয়া তো হবই, আজই।

কোথায় ?

কোথাও একটা।

এই পর্যন্ত বেশ, রহস্যটহস্য আছে কিন্তু তারপর কথাবার্তা তিক্ত ও দ্রুত হতে থাকল, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না কে কোনটা বলছে : পাহাড়ে / না / সমুদ্রে / না / কার সঙ্গে / আমার সঙ্গে / আর কে / এক জন / কে এক / যে কোনো কেউ / চিনি / আমিই চিনি না···

এখানেই শেষ নয়, পুরুষটি বার-দুয়েক খিস্তি করেছিল, মেয়েটার গালে জমা হচ্ছিল রক্ত, হঠাৎ সে ফেটে পড়ল,

'যে-ই হোক, তোমার কী, কী করবে জেনে, কেন অ্যাতো জানতে চাও অ্যাঁ, রাক্ষসের মতো, পেটের মধ্যে ঢুকে পড়তে চাও, আমার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে খাবে, আমার সব জানতে হবে ওকে, তোমার কেনা নাকি, যার সঙ্গে খুশি যাব, আমার খুশি, খুশি, খুশি।'

···একগাদা ধোঁয়া তখন। আর বিশাল বেলুন চুপসে যাওয়ার মতো 'স স' শব্দ। ঘাউরার খিস্তি ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে কিছুদূর পর্যন্ত ট্যাক্সিটির পিছু নেয়।

□ □ □

আজ ২৬ জুন, ১৯৯২।

কাগুজে মানুষ আমি, কাগজ খাচ্ছি, কাগজ ওগড়াচ্ছি, নিরাময়হীন, এক প্রাচীন ব্যাধি। কাগজ পুড়বে, পুড়ব আমিও, সহমরণ।

স্বাস্থ্যবান লোকেরা, পুরুষ ও নারীরা করুণা করবে এই কাগজ লেখককে।

কেন লিখি আমি ? আমার এইভাবে দাগ কাটার ইতিহাসটাই বা কী ?

'যোগসূত্র' পত্রিকার ফর্মাপূরণের জন্য এই লেখা,[১] ব্রত সাহায্য করল বলে যা এতদূর

১. নাহলে আমি রাঘব এ সম্পর্কে বলব, এ এক প্রকার মক্‌সো মাত্র, লেখার ভিতরে লেখা।

হল, যা দেখে শেষতক বিনয় বলবে ‘হ্যাঁ, অন্যরকম তবে’…সঞ্জয় মিটিমিটি হাসবে, বিধান চাটুজ্জে দাড়ি মুচড়ে বলবেন ‘কিন্তু রাঘব তোমার লেখায় শ্রমজীবী মানুষ থাকে না কেন ?’ …

এই সব ‘তবে’, ‘কিন্তু’, ‘কেন’ হাঁ-করে ছুটে আসছে, কাগজ লেখকের ঠিকানা হবে তাদের উদর।

□ □ □

রত একফালি কাগজে, জরুরি খবর দেওয়ার অভিপ্রায়ে বা যেন ঠিকানা লিখে রাখার মতো একটি চিরকুটে কথা ক'টি লিখেছিল :

ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা আত্মজীবনী লিখছি না। কলকাতার বাইরে কোনওদিন যাইনি, আমার এই দাগ কাটায় বাড়ির ঠিকানা, বাপের নাম, বউ-ছেলের কথা কিছুই নেই। এইসব নেই লেখায়। কিন্তু লেখাটা আছে, লিখছি, ধীরে আত্মহননের মতো। কীরকম সেটা ?

স্বেচ্ছায়, স্বাধীনতায় মানুষকে হয়ত কিছু করতেই হয় একা-একা, সেইটাই বিশুদ্ধ কাজ। বিশুদ্ধ এই জন্য যে তা সহজ, স্বস্তির, কোনো বাইরের চাপ নেই। আমার লেখা এরকম একটা কাজ। আশ্চর্যের কথা এর মধ্যে কে এক দ্বিতীয় জন প্রচ্ছন্ন থেকে যায়। তার আভাস পাচ্ছি। সেই দ্বিতীয়ের অলক্ষ্য উপস্থিতি প্রত্যক্ষের থেকে ঢের গভীর। আত্মরক্ষার কথা ভেবে ফেলি। আমি ল্যাংটো হব আর সে দেখে ফেলবে ! এরকম সংকোচে গুটিয়ে যাই। ল্যাংটো হতে পারি না।

□ □ □

লেখার বাইরে বাঁচা, আমার সামাজিক-পারিবারিক জীবন, যাতে প্রতিদিন কম করে ১৫/১৬ ঘন্টা কাটে, দিনের ওই বৃহৎ অংশটিকে আমি খুন করি। রোজ। খুন শেষহীন। কিন্তু কে আমাকে ঘাতক বলবে !

রূপকথার ধোপানীর গল্পের মতো, বাচ্চাটা জ্বালাতন করছিল ধোপানি এক চড়ে তাকে মেরে ফেলল, চুপ করিয়ে দিল। কাজ শেষ হলে বাচ্চাটার হাত ধরে গল্প করতে-করতে বাড়ি চলে গেল।

বালিতে মুখ থুবড়ে মরতে বসেছি, ওই রকম, ধোপানির নির্দেশে আমারও বাঁচা-মরা চলছে।

□ □ □

কিন্তু এ শখের কথা, মৃত্যু বিলাস, আমি ভাবি। আমাদের এই দেশে, এই পোড়া দেশে মৃত্যু তো এক অনন্ত চিতা।

বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আইন তাকে ঘিরে রেখেছে সুরক্ষা বলয়ের মতো। তবু মানুষ মরছে। কাতারে-কাতারে। না খেয়ে, অবিচারে, অবহেলায়, নির্যাতনে।

□ □ □

তিন হাজার বছর কারো বয়স হতে পারে না। কিন্তু আমার প্রেমিকা যেন তার

থেকেও প্রাচীনা। আবার সে এতটা বাস্তব যে আমরা পরস্পরকে বস্তুর মতো ব্যবহার করতে পারি। তুলে রাখতে পারি আলমারিতে। হাঁটতে পারি পিঠে নিয়ে।

□ □ □

কাগজে দাগ কাটা ব্যক্তির কথা বলা নয়। কিন্তু কাগজের দাগ কথা বলতে পারে, এ যেন কথারা কথা বলছে, তারা ভাবছে, মাথা চুলকোচ্ছে, চটে উঠছে।
এখানে ব্রত কোন শালা!

□ □ □

জীবনানন্দ ঋত্বিক কমলকুমার ঋত্বিক জীবন কমল কমলজীবন জীবনঋত্বিক...
এই সব নাম আমরা ভুলে যাব, আমাদের সন্তানরা ভুলে যাবে, তারা পিতৃহীন হবে।
এরকম সাতপাঁচ কথার মধ্যে কে যেন বলল, 'কে কার বাপ', 'ছেলেই বাপ, বাপই ছেলে'...

ি ী ে ৈ

এরা শুধু দাগ, আ-কার, ই-কার, অক্ষর শব্দ ইত্যাদি থাকলে দৃশ্যত আর সাঙ্কেতিক লিপি মনে হবে না। সম্প্রতি লিপি জিনিসটায় খুব টান ফিল করছি, তাদের দেখি ছবির মতো, ভাবি এরা হল জীবাশ্ম।
সমুদ্রের বালিতে দাগ কেটেছি আমরা, গুহার দেয়াল আর মৃত পশুর চামড়ায় আঁচড়। শুয়োরের বিশ্বাস্য ছবি না এঁকে টানে টোনে ধরে রেখেছি তার গতিটুকু। ওই গুহাচিত্র দেখে কোন শালা বলবে ওটা শুয়োর!

□ □ □

হালকা, ফিচেল ঢঙে একটা ডেড-এণ্ড বোঝাতে আমরা পরস্পরকে খিস্তি করি কিছুক্ষণ, সে খুব খারাপ-খারাপ কথা, পৃথিবীর যত কাঁচা খিস্তি আছে। হ্যা-হ্যা করে হাসি। মৃতদেহের উপর আতর ঢালছি আমরা, ফুল ছড়াচ্ছি, জীবিতদের নয় মৃতদের আমরা বড় ভালবাসি। তাই ঢালছি তো ঢালছিই, ছড়াচ্ছি তো ছড়াচ্ছিই..
কঙ্কালের উপর কঙ্কালের মাথার উপর নক্ষত্রের ক্ষয়। গোদার, সঞ্জয় মুখুজ্জের অনুবাদে : নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, মাদলেইন নক্ষত্রের মতন হৃদয়।

□ □ □

আমি কেন রামাশ্যামা বামপন্থী-ডানপন্থীদের মতো চুটিয়ে চাকরি করে, পেপার লিখে, দশের এক হয়ে, ইউনিটট্রাস্টের কাগজ কিনে, হেলথ ইন্সিওর করে দেশের কথা ভাবতে পারি না?
রামাশ্যামা বলে ডেকে আমি মোটেই ওদের তাচ্ছিল্য করতে চাইছি না। ওটা একরকম ধরে নেওয়া, যেমন বলা যেত ক খ ইত্যাদি, একটা টাইপ, বাজি জেতা ঘোড়ার টাইপ, বেতো নয়, খোঁড়া নয়। এরাই সুস্থ, সবল, ক্ষয় বিরোধী, অবিনশ্বর। এদের ক খ না বলে ত্রিভুজ-চতুর্ভুজ কিংবা হেম-অশীন নামেও ডাকা যেত। রামাশ্যামা টর্মডিক কেটে দেওয়া যাক, হেম আর অশীন থাক, ওরা অবিনশ্বর।

হেম-অশীন বেশ শক্তপোক্ত জীবন পেয়েছে, এই জীবন কমনীয় নয়, ভঙ্গুর নয়, টাটা স্টিল। হয়ত ছেলেবেলায় ওরা দুধ-মাংস-ফল খেয়েছে ঢের। আর এ হল পারিবারিক সামর্থের প্রশ্ন, অর্থাৎ ইতিহাস, খাদ্যের ইতিহাসসূত্রেই তাদের যা কিছু বিকাশ ও সাফল্য। আর যখন হাড়-হাভাতে ঘরের ছেলে হেম-অশীন হয় তখনো সেই ইতিহাস ক্ষুধার, উচ্চাশা সেখানে প্রতিহিংসার মতো।

হুদমদ্দ একটা পুরুষ, চাকরি করা, বিয়ে করা, বাপ হওয়া মাঝবয়সী একটা লোক কি সত্যি বালক থেকে যেতে পারে, বিভূতিভূষণের অপুর কি মৃত্যু নেই (সাহিত্যের চরিত্র হয়ে যাস যদি তাহলে আর লাইফে সাহিত্য করতে হচ্ছে না : ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় আমার এক পেছন-পাকা বন্ধু বলেছিল।)!

□ □ □

ধানবাদের ক্ষ্যাপা দিলীপ তুমুল বৃষ্টির সন্ধ্যায় আমহার্স্টস্ট্রিট পোস্টাপিসের সামনে দাঁড়িয়ে, ট্যাক্সির জন্য হাত নাড়তে-নাড়তে 'জীবন রস' কথাটা সুরে উচ্চারণ করেছিল টলতে টলতে।

আউল বাউল কথা। বাউল গানের কোনো স্মৃতি আমার শৈশবে নেই, আমি শুনেছি লারেলাপ্পা,, 'ইচক দানা বিচক দানা'···দেখেছি হিজড়ের খ্যামটানাচ। নিশ্চয় তাতেও জীবন রস আছে, খ্যামটায়, লারেলাপ্পায়। নাহলে অত গভীরভাবে মজে যেতাম কেন ? এখনও কত কিছুতে মজে যাই, এক ধরনের বিস্মরণ, সচেতন তত্ত্বজ্ঞ মানুষের কাছে তা নির্ঘাৎ লজ্জার।

ব্যক্তি জীবনের ছাতানাতা, তার কার্যকারণহীন ইতিহাস, উদ্ভট মানচিত্র, সমুদ্র তরঙ্গ থেকে রাস্তার ধুলোর ঝড়, কান ফাটানো শব্দে বাইকের ছুটে যাওয়ায় যে আলোড়ন, আক্রমণ, তার ওঠাপড়ায় আন্দোলিত হই। আবার বিবর্ণ হয়ে যাই। যেন মরতে-মরতে বেঁচে উঠি। এই নাবালকত্ব কোনোদিন যাবার নয়।

□ □ □

বান্ধবী বলেছিল, 'ন্যাকা।'

বলেছিল, 'তোমার দ্বারা কিসসু হবে না।'

বান্ধবীর আরও কথা, 'সাহিত্য ছুঁয়ে বাঁচতে গিয়ে শেষতক অপদার্থ হলে'।

বান্ধবীর চোখ ঝিকিয়ে ওঠে, 'আমি অনেক লেখক দেখেছি, বাঘা-বাঘা লেখক,
সমাজ রাজনীতি ও শেয়ার বাজার নিয়ে কথা বলে তারা, লেখকরা,
হেলথ ক্লাবে যায়, মেয়ে পটাতে পারে,
মদ খেয়েও খাড়া থাকে
রং কোম্পানির ডিরেক্টর এবং পুলিশ কমিশনার তাদের দুই বগলে
স্যানিটারি ন্যাপকিনের মডেলিং করে যে মেয়েটি তার সঙ্গে সলমন রুশদি নিয়ে কথা বলেছিল, দেখেছি'···

□ □ □

কোনো পরিকল্পনা এঁকে নিতে মস্তিষ্কের কথাগুলি ছুটোছুটি করেনি। ভেবে-চিন্তে, প্লট ও বক্তব্য সাজিয়ে নিয়ে শুরু করিনি, এখানে 'করা' এই ক্রিয়াপদটি ছিল অভিভাবকহীন।

শুরু হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ, কাগজে চাবুকদাগ, কাগজে ক্ষতচিহ্ন। এর, তার অভিজ্ঞতা-অনুভব, আদিকালের উৎস থেকে আসা কিছু চিন্তাঝলক, মহাশূন্যের রশ্মি, ধ্বনি, এক সুদূর পরিক্রমান্তে সাদা পৃষ্ঠায় সে সবই কার্ডিওগ্রাফের মতো। এঁকেবেঁকে পিরামিড, বড় বড় গর্ত, ফাঁক, আগুনেপাখি, ধারাবাহিক নয় ওই রেখা ও বিন্দুগুলি…

'ডিসকনটিনিউটি'

'এর তলায় দাগ দাও'

'কনটিনিউটিও আছে'

□ □ □

যদি ফুলস্কেপ কাগজে, দুধারে মার্জিন ছেড়ে, পৃষ্ঠা সংখ্যা বসিয়ে দিতাম মাথার উপর টিকির মতো, সেইভাবে সাজিয়ে করে গেলে, ভেবে-ভেবে লিখে গেলে, দাগ কাটা কাগজের স্তূপটি পাণ্ডুলিপি হত, যার পিছনে থাকেন একজন লেখক,

'আইটালিকসের আই'।

'হু ইজ হি' ?

'হু আর য়ু ?

□ □ □

'যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না'—এই প্রতিজ্ঞার গাম্ভীর্যপূর্ণ রগড়টি খাসা।

□ □ □

আমাদের কী আছে ?

শোনামাত্র আমরা চার মন্দা প্যান্টের দু পকেট উল্টে দিই, সাদাটে ন্যাকড়া জিভ দেখানোর মতো ঝুলে পড়ে কোমরের দুপাশে। দেখি, না, কিছু নেই, আমরা ফতুর। শুরু হল হা-হুতাশ, ছিল কিন্তু নেই, মিসিংম্যাটার।

'ওইটাই কি আমরা' ?

'আমরা কি মিসিংম্যাটার' !

'আর যারা খুঁজছে ?'

'কি রে শালা, আছি নাকি' !

খোয়ারি শেষ, একজন পকেট হাতড়ে পঞ্চাশ টাকার একখানি নোট শূন্যে মেলে ধরে পতাকার মতো নাড়তে থাকে, আমরা চিৎকার করে উঠি, 'জাগো, জাগো, জাগো সর্ব—হা-আ-রা…'

সংলাপ কন্টিনিউ করেছিল (কী ভাষা!), ওই কন্টিনিউটি আমি ভাঙতে চাইছি না আমার হঠাৎ-ই একটা কথা মনে পড়ে গেল এখানে, সেই কথাটাও ঢুকে রাখতে চাই, আমাদের ঘিরে আদতে কোনো ঘটনা ছিল না। নিজেদের জীবন ও চারপাশ সম্পর্কে আমরা ঠান্ডা, নিস্পৃহ। ভেঙে পড়িনা কারো মৃত্যুতে, কাউকে কিছু বলার নেই, শোনার নেই। প্রেম, শিল্প বা এমন কোনো জীয়ন কাঠিই নেই যা আমাদের জাগাতে পারে। কী ভাবে এই জীবন্মৃত অবস্থাটা গোপন রাখা যায়, মৃতের লাশ গায়েব করা যায় সেই ধান্দায় উৎসর্গিত। মদের প্রভাবে ওই ধান্দাটিই আরো গভীর হয়েছিল, মদ্যপ আমরা মিথ্যের গভীরে পৌঁছে যাব।

বলা হল : দ্যাখ, এই আমাদের সম্বল।
এই শুধু আমরা?
কেন আমরা দেহের মালিক নই, দেহ আছে দেহের মধ্যে হাড় মাংস, রক্ত, জল···
ক্ষিতি, অপ, ব্যোম
ধ্যাত, শালা
দেহ-ই আমরা
আমার এই দেহখানি···
তুলে ধর—ও

সংলাপ কন্টিনিউ করে···
বি সিরিয়াস / বেশ তাহলে এভাবে বলা যায় আমাদের সম্বল শুধু জীবনটুকু / 'টুকু' কেন / খুব কম হল কি / জীবনের বেড়া পছন্দ নয় / বেড়া ভাঙতে চাস / জমি যতই বাড়াও চাষা শালা চাষাই থেকে যাবে / ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও···
হঠাৎ সবাই ভাঙা কাঁসরের মতো বেজে উঠলাম, 'তা ছাড়া কী।' অর্থাৎ আমরা চিত্তেয় উঠলেই পাড়া জুরোল।
তারপর কথা আরো, তাতে জানা গেল :
আমাদের বাপমারা গৌণ, তারা বিস্মৃত ইতিহাস, মাঝখানের সেতু উড়িয়ে দিয়েছে মারণাস্ত্র।
দেখা গেল এত ছিঁচ কাঁদুনেপনা, গোস্‌সা আর আক্রোশের মধ্যে ঘাপটি মেরে আছে একটিই প্রবৃত্তি—আমরা ক্ষমতা চাই, ক্ষমতা কব্জা করার জন্য বিখ্যাত হতে চাই, যেসব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আক্রোশে ফুঁসছি আদতে আমরা তাদেরই কেনা গোলাম হয়ে আছি।

উল্টোদিক থেকে বিশ্বাস করি দুর্লভ প্রতিভা আছে আমাদের প্রত্যেকের, সেটাই আমাদের পয়েন্ট অব ইউনিটি। হাঃ মূর্খের দল ! পেট মোটা সম্পাদক আর পুরস্কার কমিটির পাকাচুলো মাথা আর বেঁটে পন্ডিত আর সাংস্কৃতিক রাজনীতির মোড়ল ও তাদের রক্ষিতারা'[১]...হা মূর্খ ! তোদের কি উচিত নয় এই চার মন্দাকে মাথায় তুলে নাচা ? রাজনৈতিক দলের তকমা পাওয়া সংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ, টি ভি কর্তা, য়ুনিভার্সিটির কোটাল, খপরের কাগজ...নেক্সাস নেক্সাস। ব্যাটাদের আই কিউ কম বলেই আমাদের ছুঁয়েও দেখছে না। মুরুব্বি থাকলে অবিশ্যি এমনটা হত না।

মুরুব্বি বোলাও।

অ্যাই ভাই।

হ্যায় কোই ? মুরুব্বি !

বেয়ারা চার হুইস্কি...

□ □ □

চারজনের একজন, অবশ্য আর একটু সিরিয়াস সে, নেশা বেশি হয়েছে তারই, দাঁড়াতে পারছিল না, বলল, 'চাকরিটা ছাড়তে পারলে বেঁচে যেতাম।'

সঙ্গেসঙ্গে হুক্কাহুয়া :

মাস্টারির জন্যই মরলাম।

ব্যবসার জন্য।

উফ, চাকরি ! নরক !

চাকরি করতে গিয়ে, রোজগার করতে গিয়ে একটা জাত নিঃস্ব হয়ে গেল, গোটা একটা জাত। তার জীবন থেকে আবিষ্কার-উদ্ভাবন-নতুনত্ব, যা কিছু মৌলিক সব শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, রাস্তার কুকুরের মতো থেঁতলে, চিৎপাত পড়ে থাকল...

এ কখনো হয় ! নিজেকে ভালবাসার, আতুতুতুরও তো একটা সীমা থাকবে, আমার গা গোলাতে লাগল। অনির্বাণের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি আর গা গোলাচ্ছে। মুখে হাত চাপা দিতে গেলাম কিন্তু তার আগেই ওয়াক শব্দে সোজা অনির্বাণের মুখে রামধনুর মতো বেঁকে শত জল ঝর্ণার ধারায় বমন...

□ □ □

অতঃপর আমি রামাশ্যামাদের নিয়ে ভাবতে থাকি, আমার বন্ধুরা তা নয়, তারা পণ করেছে রামা শ্যামা না-হওয়ার। তারা অনেক টাকা চায়, বাড়িগাড়ি, বিদেশ সফর, ক্ষমতা, যশ আর সুন্দরী ছিপছিপে মেয়ে চায়—ভালগারিটি, ভালগার, ভালগার,...মনে হচ্ছিল বন্ধুদের খুন করি, খুন করি নিজেকে, খতম শ্রেণীশত্রুদের নয়, খতম করি বন্ধুদের নিজেকে, স্বজাতি নিধন, এরা আমার শত্রু নয়, বন্ধু,

আমার কোনো শত্রু নেই, অজাতশত্রু আমি, আমার শুধু বন্ধু আছে এই হাস্যকর যুক্তিতে যে আমার কোনো শত্রু নেই, নিজে আমি পারিনা সব কিছু থুঃ থুঃ করে ছুঁড়ে ফেলতে,

---

১. ব্রত প্রবল আপত্তি করেছিল। মানুষের শরীর গঠন ও চরিত্রটরিত্র নিয়ে এভাবে খিস্তি করাকে সে ঘৃণা করে বলেছিল।

বিমল, রেমণ্ড, ক্যাথে প্যাসেফিকের মুখোমুখি নিজের মন্ত্রদণ্ডটি বের করে ছরছর করে মুততে।
গুলিয়ে যাচ্ছে, আক্রোশ আমার প্রভু এখন, শুধু জেগে আছে একটি ধারাল অস্ত্র, বোনলেস চিকেন বল গেঁথে খাওয়া কাঁটাটি আমার হাতে, আমি খুন করবই বন্ধুদের।

□ □ □

রিপোর্টার বন্ধু রজত বলছিল, 'দ্যাখ যদি দেশভাগ না হতো, তাহলে আমি আমার ঠাকুর্দার মতোই কমলাদিঘির ধারে ছিপ হাতে বসে থাকতাম, হোগলা বনে যেতাম হাগু করতে, আমাকে দিনের ভার বইতে হতো না।'
সাচা কথা, কথাখানা ঠিক।

□ □ □

ভারত মহান! য়ুরোপ আমেরিকার ভোগের মহাপৃথিবী তার কাছে এক বিন্দু সর্ষে।

কোথায় এই বাণী শিল্প হয়ে উঠেছে, কোন উপন্যাসে, কোন ফিল্মে, পেইন্টিং-এ? কোথায়? কোথায়?
য়ুরোপ আমেরিকা ভারত খুঁজছে: কোথায় সে? সে কোথায়?
সেই ভারতটি তাকে দিতে হবে, সেইভাবে লেখ, সেইভাবে সাজাও, জেনে নাও হতাশ সাহেব কী চায়।
সাহেব তুমি আমার মা বাপ। তুমি রাখলে আছি, মারলে শেষ। আমি নদী নালা কাদা ভেঙে ধোঁয়া-ধুলো-শব্দ অনাহার-অপুষ্টির এঁদো গ্রাম কলকাতা থেকে তোমার জন্য এই রচনাটি নিয়ে এসেছি, একবার তাকিয়ে দ্যাখো সাহেব।

... □ □ □

পচা পুকুর, হোগলা বন, বাঁকুড়ার পাথুরে জমিতে কি সে ছিল? নোনা পুকুর ট্রাম ডিপোর পিছনের বস্তি কিংবা দর্জিপাড়ার কোনও কানাগলিতে? যেখানে সব গল্প এক, গল্প নেই আর, জীবনাদর্শ বলে কিছু নেই, নানাভাবে, নানারকমে, বিচিত্র সব জ্যামিতিক আকারে শুধু দারিদ্র, দারিদ্রই···

□ □ □

সময় ভাগ ক'রে এদিকে কাঁচপোকা ঝলকায়
আর ওদিকে জোনাকির তারাবাজি।
কিন্তু এটাই সব নয় আট পহরে,
কাক আছে কুকুর আছে
তাদের মাতন সেরা মাতন,
তারা ধ্বনিবিলাসে ভোর গোধূলির রং চড়ায়
আর ওই নীলান্ত থেকে প্রায়ই
স্নেহস্রাবে গ'লে পড়ে চাঁদ :
আয় বাছা কোলে আয়।

বাছারা অমৃতনিষ্যন্দী গন্ধ পায়
অমনি কান্না জোড়ে,
অথচ চারদিকে হাওয়ার চৌদ্দুন :
সিঁড়ি নেই সিঁড়ি নেই।
তখন কেবলই ব্যগ্রতা :
কোথা দিয়ে উঠে যাই, কেমন ক'রে পেঁছই ?[১]

□ □ □

সমাপ্ত।

□ □ □

চ্যাপলিনের ছবি শেষ হয় 'ফিন' শব্দটি এঁকে, বঙ্কিমের উপন্যাসের শেষেও 'সমাপ্ত' শব্দটি পাওয়া যেতে পারে, শেষ বলে কিছু নেই, শেষ হয় না তাই, হয়ত লিখতে হয়— 'সমাপ্ত।'

□ □ □

'কপি শেষ ?' শোভনবাবু জিজ্ঞেস করেন।
'হ্যাঁ, আর নেই, শেষ'—আমি।

□ □ □

বেড়ে মজা, যেন আমিই শেষ, খুন হলাম তাহলে! বাহ! লেখার তাড়না শেষ। কাম শেষ। শেষ, শেষ।

□ □ □

ব্রতটা মহাখচ্চর, শালা বলল, 'শোভনবাবু এক পণ্ডিত ব্যক্তি'
কেন, কেন।
তিনি সমস্ত লেখাকেই কপি বলেন বলে। □

১. অরুণ মিত্র।

সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত,
উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও
প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়,
একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য
সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম, জড়ের জীবনে যা সত্য
মানুষের জীবনেও তাই
সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের
জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে
লাগলাম আমি। এইভাবে শুরু হল কবিতার জগতে
আমার পদযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হলো
'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'।

—বিনয় মজুমদার

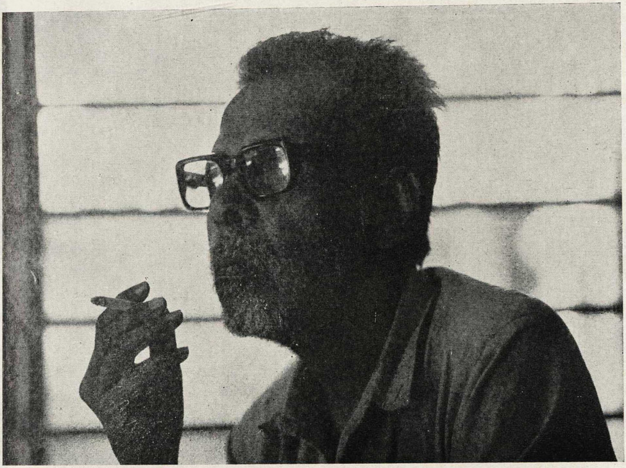

বিনয় মজুমদার
১২.২.১৯৯৩

বিনয় মজুমদার : তাঁর কবিতা

উৎপল কুমার বসু

বিনয় মজুমদার প্রসঙ্গে আমার পক্ষে কিছু লেখা দুরূহ। আমরা সমবয়েসী এবং প্রায় একই পরিমণ্ডলে আমাদের যৌবন কেটেছে। বহুলাংশে তা আজ গল্প কাহিনী, মীথ ও নিন্দা-প্রশংসায় পর্যবসিত। সে সব নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। টেবল-টক হয়েছে তারও বেশি। এবং বিস্ময়ের কথা এই যে খুব বেশি দিন আগের ঘটনা নয় আমাদের যৌবনকাল। আমরা পঞ্চাশ পেরিয়েছি। সুতরাং পঁচিশ বা ত্রিশ বছর কাটল মাত্র। মনে হয় কত হিমযুগ, কত পর্বতনিক্ষেপ, কত জীবাশ্মের স্তরীভবন দেখলুম যেন। মানচিত্র পাল্টাচ্ছে এবং মহাদেশগুলি নতুনভাবে, নব সমুদ্রচিহ্নে, অপরিণত ভূগোলে এবং সদ্য আবিষ্কৃত মরু-মেরু-অরণ্যে চিহ্নিত হচ্ছে। বিনয় মজুমদার বাংলা কবিতায় তেমনই এক অস্থির ভূপ্রকৃতির অংশ।

□ □ □

আমার এই রচনার সঙ্গে বিনয় মজুমদারের বেশ কিছু কবিতা—ইদানীং কালের লেখা—সংযুক্ত আছে। এই সংগ্রহটিকে আমি দুটি ভাগে ভাগ করেছি। আমার বর্তমান পাঠ ও মন্তব্য প্রথমাংশের কবিতাগুলি (ক) নিয়ে। দ্বিতীয়ার্ধের লেখাগুলি (খ) অতিরিক্ত।* সেগুলি নিয়ে পাঠক স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করে দেখবেন। অন্যভাবে ভাবিত হবেন।

□ □ □

কবিতা, আমরা জানি, কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়। কবিতা পাঠক এবং কবির মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া-সৃষ্টিকারী পদ্ধতি। এই পদ্ধতিকেন্দ্রিক চরিত্রের জন্য কবিতায় ব্যাকরণ, শৈলী এবং নশ্বরতা তৈরী হয়েছে। অপরদিকে প্রতিক্রিয়ার জন্মদাত্রী বলে কবিতায় প্রাণ আরোপিত হয়। কবিতায় আমরা প্রায়শ শ্বসিত বস্তু বা "অরগানিক" অস্তিত্বের চিহ্ন দেখে থাকি। এই দুই কেন্দ্র—অর্থাৎ বস্তু ও প্রাণ, ব্যাকরণ ও বিদ্রোহ, শৈলী ও প্রথামুক্তিকে জুড়ে রয়েছে এক সেতু যার নাম নশ্বরতা। কবিতার মৃত্যু হয়। লুপ্ত হয় তার ভাষা, সংকেত, উপদেশ ও কলাকৈবল্য।

*'আঠাশটি কবিতা' অংশে (ক) ও (খ) অংশের কবিতাগুলি যথাক্রমে প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয়ভাগে মুদ্রিত হয়েছে।

বিনয়ের অনেক কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয়েছে আমরা বুঝি কবিতার তেমন এক অন্তিম অবস্থায় পোঁছে গেছি। যেন এরপর আর কোনও কবিতা হয় না। অর্থাৎ এই কবিতাগুলির মধ্যে "ফাইনালিটির" উপাদান আছে। রবীন্দ্রনাথেও এমন উদাহরণ পাই : "রূপ-নারানের কূলে/জেগে উঠিলাম/জানিলাম এ-জগত স্বপ্ন নয়…।" জীবনানন্দেও এমন অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর বিনয় মজুমদার-য়ে। এটি কবিতা রচনার কোনও কৌশল নয়। এটি নির্ণয় বাক্য বা প্রপোজিশনের উপস্থাপন।

যেমন : …"সন্তরণ-অধ্যাপক আরো
আছে কেউ কেউ এই বজ্রপাতময় পৃথিবীতে।
যেন বা অবিবাহিত শিশু দেখে অচিরেই নিশ্চিত মরণ।"

এবং

"কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি—একটা গরুর ছটা শিঙ ;
এ-দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হলো না ;…বোঝা যায়
যা নেই তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয় হে
শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব।
এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে।"

এবং

"…চীৎকার করে ওঠে নাপিতের দোকানসমূহ
বলে, শোনো, মুকুরে তো ডান হাত হয় বাম হাত।
তবু বুকে ঠাঁই দেয়, মুকুরের যেটুকু ক্ষমতা।
শোনো মদ, শোনো ফুল, ঘুমের ভিতরে কাউকেই
খোঁজা তো সম্ভব নয়, অতএব কাউকে খুঁজি না।"

[এই পংক্তিগুলি (ক) কবিতা অংশ থেকে নেওয়া]

*

আধুনিক দর্শনশাস্ত্রের একটি প্রধান বিচার হল নির্ণয় বাক্যের ন্যায়সম্মত বিশ্লেষণ। যদি বিশ্লেষণ ন্যায়সম্মত না হয় তবে সঠিক অর্থ সৃষ্টি হয় না অথবা বলা যায় বক্তা বা লেখক একটি নির্দিষ্ট অর্থ সৃষ্টি করা সত্ত্বেও—পাঠকারী তার অন্য পাঠ সৃষ্টি করে। যৌগিক নির্ণয় বাক্য, যা বিনয় মজুমদার তাঁর কবিতায় প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন, সমস্যাটিকে আরও জটিল পর্যায়ে উন্নীত করে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি আলোচ্য কবি অবলীলায় একজাতীয় নির্ণয়বাক্য থেকে আরেক প্রকারে চলে যান। কখনও ফিরে আসেন মূল সূত্রে। কখনও স্থির হন এক মাঝামাঝি অবস্থায়। আমি সেদিন বসে বসে একটা তালিকা তৈরী করছিলুম কী-জাতীয় নির্ণয়বাক্য বিনয় মজুমদারের প্রিয় প্রকরণ। এই তালিকাটি দিচ্ছি :

স্বয়ংনির্ভর (Categorical)
যদি-তাহলে (Hypothetical)
বিকল্পাত্মক (Disjunctive)
অস্তিত্ববাচক (Affirmative)
নিষেধাত্মক (Negative)
সাকুল্যব্যাপক (Universal)
পূর্ণনিশ্চয় (Necessary)
সম্ভাবনাবাচক (Problematic)
এবং
বস্তুবিষয়ক (Real)

এগুলির উদাহরণ এই লেখার সঙ্গে যুক্ত কবিতাবলীতে আপনারা খুঁজে বের করুন। আমি শুধু প্রস্তাবাকারে এর হদিশ দিলুম। তালিকাটিও হয়ত সম্পূর্ণ নয়।

*

অত্যন্ত প্রভাবশালী এই বৈশিষ্ট্যের জন্য বিনয় মজুমদারের কবিতা তার অনেক অলঙ্কার বর্জন করেছে। ছন্দোগুণ, উপমা, ধ্বনিসৌকর্য, অন্তমিল এবং আরও বহুবিধ চরিত্র লক্ষণ অর্থাৎ শাঁখা-সিঁদুর থেকে পান-আলতা—যা দিয়ে আমরা কবিতাকে চিনে থাকি—তা সবই প্রায় তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। তাঁর কবিতার এই নিরাভরণ রূপটি বড় মনোলোভা। কমলকুমার মজুমদারের প্রভাবে বলা যায় এই "রূপের কখনো রূপান্তর হয় না"।

*

কিন্তু কবির উক্তি বা নির্ণয়বাক্যকে কি আমরা সত্য বলে মেনে নেব? আমরা কি নিম্নলিখিত পংক্তিকে স্বীকার করব :—

"দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় এই তিন এককের কথা
প্রায়শই উচ্চারিত হয় পৃথিবীতে,
যেন আর কিছু নেই এই তিন একক ব্যতীত…
আলোকের পরিমাণ মাপার একক আছে, আরো
শব্দ কত জোরে হল, তা মাপার একক রয়েছে
এবং মানুষ-দিন নামেও একক আছে এই পৃথিবীতে"

('ক' ভাগের কবিতা দ্রষ্টব্য)

আমরা যদি এই প্রসঙ্গে "ইউজ থিয়োরী" বা ব্যবহারতত্ত্ব প্রয়োগ করি তবে দেখব উক্ত থিয়োরী যে-তিনটি পদ্ধতি অবলম্বনে বিশ্লেষণ করে থাকে তার তৃতীয়টি এই কাব্যাংশের প্রতি প্রযোজ্য।

প্রথমটি :
সূত্র (Premise) → সিদ্ধান্ত (Conclusion)
দ্বিতীয়টি :

সঙ্গত কারণ (Ground) → পরিণতি (Consequence)
তৃতীয়টি :
অনুশাসনিক (Cannonical)

অর্থাৎ প্রথম দুটি প্রয়োগ করলে আমরা উক্ত কাব্যাংশের তল পাবো না। এই পয়ারকে অর্থহীন, অবাস্তব এবং অযৌক্তিক বলে মনে হবে। কিন্তু আমরা যদি জানি যে এটি অনুশাসনিক অর্থাৎ এটি কবির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের সমন্বয় এবং এই জ্ঞান আসলে ব্যাপ্তিজ্ঞান—তবে হয়ত আমরা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবো। তখন আমরা ভাবতে বসবো তবে মানুষ কি এতই যান্ত্রিক নাকি? সে কি দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের সমতুল্য আরেকটি মাপক। নিশ্চয় নয়। বিনয় মজুমদার কি আমাদের শেষপর্যন্ত নীতিশিক্ষা দিচ্ছেন?

এই রচনাটি আমি এই ধাঁধাঁয় শেষ করতে চাই। বিনয় মজুমদার তার কবিতায় বারবার ব্যাপ্তি জ্ঞানাত্মক অনুমান (induction) এবং স্বজ্ঞামূলক ন্যায় (intuitive logic) ব্যবহার করে আমাদের একটি বিশেষ পথে চালিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই পথ কি শেষ হবে নীতিবিচারে? ভালো-মন্দর মায়াবী আলোয় কি আমরা প্রকৃতি ও পথচারীদের দেখার জন্য তৈরী হব? □

বিনয় মজুমদার প্রণীত

আঠাশটি কবিতা

রচনাকাল ১৯৯১-৯২

প্রথম ভাগ

আকাশে অনেক তারা

আকাশে অনেক তারা, একটু আগেই আমি বারান্দায় গিয়ে
দেখলাম তারাগুলি, আমার ধারণা এই—আমি মরে গিয়ে
ভস্মীভূত হয়ে গেলে ওইসব তারাদের কাছে চলে যাব।
এই পৃথিবীতে আর না থাকাই ভালো তার চেয়ে বেশী
আনন্দদায়ক
ওই মহাশূন্যে ঘোরা, অন্তত আমার তাই ধারণা, যেহেতু
আমি প্রায় প্রতি রাত্রে তারাদের দেখি।
আমি তারাদের সৃষ্টি করি নি, আকাশে ওরা আছে।
পৃথিবীও এককালে একটি তারাই নাকি ছিল।

ঘরে তো এলো না কেউ

ঘরে তো এল না কেউ ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতকালে।
প্রদীপ জ্বালার কেউ নেই ফলে, আকাশের দিকে
চেয়ে ফের মৃত্তিকার দিকে চাই, যা পাই তাকেই
জড়িয়ে ধরি যে আমি, লাঠিকেও জড়িয়ে ধরেছি
লাঠি নাকি রক্ষাকর্তা, এত জোর এ লাঠির ফলে
লাঠি দেবতার কথা ভেবে ভেবে চুপচাপ থাকি।
এবং আমার রাজ্যে আমার প্রধান সেনাপতি
ও আমার রাষ্ট্রপতি ও আমার জনগণ এদের আমি তো
সাঁতার শেখাই ফলে বর্তমানে আমার দলেই
রয়েছে অনেকে এই সমুদ্রে লাইফবয়ে সাঁতার শিখিয়ে
আমার সময় যায়, সন্তরণ-অধ্যাপক আরো
আছে কেউ কেউ এই বজ্রপাতময় পৃথিবীতে।
যেন বা অবিবাহিত শিশু দেখে অচিরেই নিশ্চিত মরণ।

কল্পনা করার চেষ্টা

কল্পনা করার চেষ্টা করি আমি—একটা গরুর ছটা শিঙ ;
এ দৃশ্য কল্পনা করা সম্ভব হলো না ; একজন
মানুষের বুকে এক হাত আছে গলার নীচেই
এ দৃশ্য কল্পনা করা অসম্ভব বলে দেখা গেল ।
একটি সারমেয়র দুকানের পাশে দুটো হাত
এ দৃশ্য কল্পনা করা কখনো সম্ভব নয়, ফলে
বোঝা যায় যা নেই তা কখনো কল্পনা করা সম্ভব নয় হে ।
শুধুমাত্র যা আছে তা কল্পনায় দেখাই সম্ভব ।
এর বিপরীতভাবে যা সব কল্পনা করি তাই সব আছে ।

শোনো মদ, শোনো ফুল

শোনো মদ, শোনো ফুল, ঘুমের ভিতরে কাউকেই
খোঁজা তো সম্ভব নয়, অতএব কাউকে খুঁজি না।
ফলে ষড়রিপুগুলি চীৎকার করে ওঠে শুনি
তারা যেন সসম্মানে মৃত্যু অবধিই অঙ্গে রবে।
চীৎকার করে বলে তাড়াতাড়ি আফিম আনো তো,
আনো মদ, আনো গাঁজা, আনো কফি, আনো সিগারেট।
তৎপরিবর্তে আমি এখনো আনতে চাই ভাব
এখনো আনতে চাই পাউরুটি আমার প্রাণের
ভিতরের থেকে এই আমার মুকুর নেই আর।
চীৎকার করে ওঠে নাপিতের দোকানসমূহ
বলে, শোনো, মুকুরে তো ডান হাত হয় বাম হাত।
তবু বুকে ঠাঁই দেয় মুকুরের যেটুকু ক্ষমতা।
শোনো মদ, শোনো ফুল, ঘুমের ভিতরে কাউকেই
খোঁজা তো সম্ভব নয়, অতএব কাউকে খুঁজি না।

যাদুকর আমি হাতে

যাদুকর আমি হাতে একটি রুমাল নিয়ে তাতে
আগুন ধরিয়ে দিই দেশলাই জেবলে।
রুমালে আগুন লাগে, আগুনের বহ্নি দেখা যায় ;
কয়েক সেকেন্ড পরে একখানি বই চাপা দিয়ে
আগুনকে ঢেকে দিই, আগুন নিভিয়ে ফেলি পুস্তকের দ্বারা।
তার পরে দেখালাম রুমাল পোড়ে নি
রুমাল ধবল রঙা আগুনে পোড়ার কোনো চিহ্নমাত্র নেই।

আসলে ব্যাপার হলো গলিত মোমের মধ্যে রুমাল ডুবিয়ে
রুমালকে মোমে ঢেকে আগেই রেখেছিলাম অগ্নি সংযোজন
করার আগেই সেই মোমমাখা রুমালেই আগুন লাগিয়ে দিই আমি।

মাঘের বিকালবেলা

মাঘের বিকালবেলা জানালার কাছে বসে শুনি
অনেক বিশেষ্য ডাকে ওইখানে গাছে বসে উড়ে।
প্রত্যহই শুনি আমি বিশেষ্যের কাকলি, তবুও
পুরাতন একঘেয়ে লাগে না এদের ডাক কখনো বরং
খুব বিশেষণ লাগে, মুগ্ধ হয়ে কান পেতে শুনি।
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত যেন বাণী নেই শুধু ধ্বনি আছে।
সর্বনাম বসে আছি পশ্চিমের জানালার কাছে।
অব্যয় কাগজ নিয়ে বর্তমানে ক্রিয়াপদ করি।

আমরা কল্পনা করি

আমরা কল্পনা করি নানা দৃশ্য নানান চেহারা
এ হলো কল্পনালোক, কল্পনালোকের সব প্রাণীরা জীবিত
যাদের কল্পনানেত্রে দেখা যায়, যেমন পরীরা।
ইহলোক, স্বপ্নলোক এবং কল্পনালোক—এই তিন লোক
আমরা দেখছি দেখি। এ ভিন্ন অন্যান্য লোক থাকাও সম্ভব।
একটি ব্যক্তিকে এই স্বপ্নলোকে এবং কল্পনালোকে দেখি,
এমন কি একজন ব্যক্তিকে কল্পনালোকে স্বপ্নলোকে আর ইহলোকে
দেখে থাকি মানুষেরা। ইহলোকে দেখা যদি বন্ধ হয়ে যায়
তাহলেও স্বপ্নলোকে এবং কল্পনালোকে দেখা যেতে থাকে।
তার মানে মরে গেলে মানুষ জীবিত থাকে স্বপ্নলোকে কল্পনালোকেও।

ধরো যে আমরা যদি

ধরো যে আমরা যদি একটানা একশ বছর
ঘুমোতে ঘুমোতে স্বপ্ন দেখতাম, তার পরে দশটি বছর
জেগে থাকতাম তবে সত্য হতো কোনটি বলো তো।
স্বপ্ন সত্য হয়ে যেত, জাগরণ অপাংক্তেয় হতো।
একথা অনেককেই আগেই বলেছি, স্বপ্ন আর জাগরণ
দুটিই সত্য তা বেশ বোঝা যায়, স্বপ্নলোক আছে
আমাদের এই ইহলোকের মতন হয়ে আছে।
স্বপ্নে দেখা বাড়িঘর লোকগুলি বর্তমান আছে।

আমার ধারণা ছিল

আমার ধারণা ছিল কেন্দ্রস্থলরূপে সূর্য
পুরো সৌরজগতকে তার
সঙ্গে নিয়ে মহাশূন্যে ধাবমান, সূর্য স্থির নয়।
তাই যদি হয় তবে সূর্য আর পৃথিবী তো একতলবর্তী নয় মোটে,
শঙ্কুর আকারে আছে পৃথিবী ও সূর্যটির যোগরেখাগুলি।
এমত সময়ে শুনি আমার বাঁ কানে কার স্বর
বলছে যে 'সত্য কথা, সূর্য ঠিক এরূপ চলছি।'
রেলগাড়ি চলে গেল দ্রুত বেগে এই রেলগাড়ি
বানাবার বিদ্যা আমি অর্জন করেছিলাম কোনো এককালে।

আমার টেবিলটিতে

আমার টেবিলটিতে মোমবাতি জেলে জেলে এমন করেছি
যাতে এই টেবিলের উপরে মোমের আস্তরণ
পড়ে গেছে, এ টেবিল আর সাফ করা কি যাবে হে ?
আজো মোমবাতি জেলে কাজে ব্যস্ত আছি।
চারটি লাইন আর তা হলেই হয়ে যায় একটি কবিতা।
তারা নামে একজন মহিলাকে চিনি আমি, আর একজন
মরা নামধেয় লোক, এর থেকে কারো মনে হয় কি মশায়
লোকের নামের সঙ্গে কাজকর্ম ক্ষমতা ইত্যাদি
যুক্ত থাকে—এইরূপ মনে হয় নাকি ?

দৈর্ঘ্য ভর ও সময়

দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় এই তিন এককের কথা
প্রায়শই উচ্চারিত হয় পৃথিবীতে,
যেন আর কিছু নেই এই তিন একক ব্যতীত
অন্যান্য একক নেই এইরূপ কথা শোনা যায়।
আসলে একক বহু আরো আছে নানান একক
যেমন আমার ঘরে মোমবাতিটির
আলোকের পরিমাণ মাপার একক আছে, আরো
শব্দ কত জোর হলো তা মাপার একক রয়েছে
এবং মানুষ-দিন নামেও একক আছে এই পৃথিবীতে।

দ্বিতীয় ভাগ

এই সীমাহীন

এই সীমাহীন জায়গায়
প্রায়
অনন্ত সময়ব্যাপী উড়ে
আজ আছি পৃথিবীতে জুড়ে।
যেই
দেখলাম এই
শরীর পেয়েছি
হাত পেয়ে গেছি
অমনি আমার মনে হলো
আর সব কাজই ফুরোলো
লেখা শুধু লেখা প্রয়োজন।
আমার জীবন
এইভাবে শুরু হয়ে গেল পৃথিবীতে,
সুরু করলাম আমি লিখে লিখে দিতে।
খাদ্য নয় বায়ু নয় মানুষের আশা
শুধু ভালোবাসা।
যার
মনে অমরার
ভালোবাসা নেই
সেই
নরটিকে নারীটিকে মৃত মনে করি,
তাই আমি ধরি।
যদিও সে হাঁটে
পৃথিবীর শহরে বা মাঠে
তবুও সে মৃতদেহ, অন্য কিছু নয়
এই ভাবি সকল সময়।
তবুও যাহোক
এই বিশ্বলোক

টিকে আছে পরস্পর আকর্ষণ করে
এই আকর্ষণ আছে তারার ভিতরে
এই আকর্ষণ আছে পৃথিবীর পরে।
নারীতে ও নরে
এইরূপে আকর্ষণ থাকা প্রয়োজন।
এই হলো আমার বাচন।
একে বলি প্রেম ভালোবাসা।
আসল তামাসা
আমি একা একা লোক, প্রিয়জন নেই
সেই হেতু এই
পৃথিবীর অগণন মানুষকে অমর করেছি।
ভালোবেসে গেছি
যে নারীকে সেও
নিয়ে নিল তার যা পাথেয়।
স্বামী নয় পুত্রকন্যা নয়
আমার নামের সঙ্গে তার নাম রয়।
আমার হৃদয়ে আছে ঠাসা
এই ভালোবাসা।
ভালোবাসবার
প্রতিযোগিতায় জিতে গেছি আমি আর
ভবে
আমার নামের সঙ্গে তারই নাম উচ্চারিত হবে।
এইভাবে আমি গেছি বেঁচে।
সেই নারী কোথায় থেকেছে
কী করে যে গেছে।
বর্তমানে তার নেচে নেচে
আমাকেই ভালোবাসা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।
আমি বুঝি এই
কারণ সে হয়েছে অমরা
অথচ সে দিল না তো ধরা
আমার নিকটে।
এই কথা অতি সত্য বটে।
পুত্র নয় কন্যা নয় কোনো পত্নী নয়
আমাদের মনে মনে রয়
অমরত্ব সকল সময়
এবং বিলয়
পেয়ে যাবে যখন শরীর

এই পৃথিবীর
নরনারীদের
মুখ দিয়ে ঢের
কথা বলে যাব আমি ভবিষ্যতে তার
মানে হলো তখনো আমার
প্রাণ রয়ে যাবে ;
সেই নারী সেও এইভাবে
বেঁচে রবে, যেই
দেখলাম এই
শরীর পেয়েছি
হাত পেয়ে গেছি
তখন ভেবেছি আমি এই মওকায়
এইসব লিখে রাখা যায় ।

এইসব কথা লিখি

এইসব কথা লিখি, আমি বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে এসে।
জমিতে তো খাদ্যশস্য উৎপাদন না করে জমিতে
করছে ফুলের চাষ বছর পনেরো আগে থেকে।
দেশে নাকি অপর্যাপ্ত পরিমাণে ধান উৎপাদন
হয় না তবুও লোকে গ্রামে গ্রামে ফুল চাষ করে
যেহেতু ধানের চেয়ে ফুল বেচে ঢের বেশি টাকা লাভ হয়।
একটি শালিক পাখি উচ্চৈস্বরে ডেকে
আমার তো ধ্যানভঙ্গ করে দিল এখনি এখানে।

পৃথিবী বিনীত হয়ে

পৃথিবী বিনীত হয়ে গেছে খুব বুঝি
তবু সোজাসুজি
পৃথিবীর এ বিনয় ইতিহাসে রবে
আপন গৌরবে।
কোথাও তো যুদ্ধ নেই আজ পৃথিবীতে।
বসন্তের শীতে
মোমবাতি জেবলে
আমার সেকেলে
ছন্দে সুরে ভাবি আমি আজ—
এই মোমবাতিটির আগুনের মতো পূত মানবসমাজ।
ধীরে ধীরে চলে গেছে সব মহারাজ
সেরে নিয়ে যার যার কাজ।
যুদ্ধ না থাকুক খুন আছে
দূরে আর কাছে ;
পৃথিবীর এ সকল অবিনয় আজো
দেখে যায় মানবসমাজও।
খুন হওয়া মৃতদেহ কাঁধে বয়ে নিয়ে
ওই পথ দিয়ে কারা চলেছে এগিয়ে।
এই খুন হওয়া
আর কাঁধে বওয়া
লোকটির শ্রাদ্ধের সময়ে
মন্ত্র পড়ে যাবে তার আপন আলয়ে
'মধুর বাতাস বয়ে যায়
সিন্ধু থেকে মধু ঝরে…' আমরা কোথায়
চলেছি মৃত্যু কি তবে হাস্যকর কিছু,
আনন্দের কথা নাকি মৃত্যু, আগুপিছু,
ভেবে ভেবে কূল বা কিনারা
না পেয়ে আমরা আজো যারা
বেঁচে আছি তারা
দিয়ে যাই জীবন পাহারা।
ডুবে গেছে আজ রবি—তারো চেয়ে অধিক বিনয়
পৃথিবীতে এই এক অনিন্দিত জয়।

স্মৃতি

মাথার ভিতরে তবু রয়ে যায় কবেকার স্মৃতি।
যৌবনে কেবলি আমি বটানিক উদ্যান দেখেছি—
নানান দেশের সব ফুল একত্রিত হয়ে আছে সেইখানে।
তবুও আমার ভাগ্যে কোনোদিন স্বর্ণভস্ম জোটে নি জোটে নি।
অথচ সারাজীবন নানাভাবে হীরক কেটেছি ;
অপরের অঙ্গুরীয়ে সেসব হীরক জাদুবলে
চলে গেল, বটানিক উদ্যানের ফুল থেকে সন্তান চারাও হয়ে গেছে।
গোলাপী নীলাভ লাল চিরন্তন সেইসব স্মৃতি।

কে বলে আমরা সব

কে বলে আমরা সব পশুর চেয়েও বেশি অসভ্য ইতর ?
দ্যাখ এক বোমা ফেলে এক লক্ষ মানুষ মেরেছি।
এত বড় বৈজ্ঞানিক আমরা সকলে মাসে এক লক্ষ টাকা
বেতন পাই তো আমি। তোমার বেতন মাসে দুহাজার টাকা।
তোমরা বানাও দেখি এরকম বোমা যাতে দুহাজার মানুষ মরবে।
পার না বানাতে ফলে তোমরা কিছুই নও, সভ্য আমরাই।
মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি এত বেশি বাড়িয়ে ফেলেছি।
তোমরাই অশিক্ষিত সেহেতু শান্তির বুলি আওড়াও বসে।

বয়স বাড়লে ফল

বয়স বাড়লে ফল পেকে যায় ফলে আমি বুঝি
আমার সারাজীবনে একটি নারীও আমাকে তো
ভালোই বাসে নি যথা হরিদাস পালকে বাসে নি,
কাঁচি দিয়ে ছেটে ফেলে হরিদাস পালকে নারীরা।
কিম্বা যথা বোঝা যায় অবাঙমনসোগোচরকে
ভালোবাসা অসম্ভব, কিছুই যায় না যার বোঝা।
আমি আজ পৃথিবীর মতো হয়ে গেছি
পুরোটা মৃত্তিকা, পুরো পৃথিবীই আমি।

আত্মহননের দিকে

আত্মহননের দিকে যাই কারা, কারা যাই ভেসে
আকাশগঙ্গায় আজ হাতে নিয়ে গূঢ় ধূমকেতু ?
ছুঁড়ে ফেল ছুঁড়ে ফেল রব ওঠে বিশ্বাকাশময় ;
তবুও আমরা নেশা করি আজো সকল সময়।
খাঁচা ভেঙে পালিয়েছি ছয়দিন ছিলাম বাহিরে ।
সেই যে উপরওয়ালা তার ইচ্ছা পূর্ণ হল ফের—
দেখা গেল আমি ফের বন্ধ সেই আবিষ্ট খাঁচায় ।
আমি রাহু চাঁদ খাই, চাঁদও শেষে হয়ে গেল বুড়ি ।
কায়ক্লেশে খাই আমি সীমাহীন স্থানের খিচুড়ি ।
বহু ধূমকেতু আছে এইখানে আমার নিকটে।
হঠাৎ এসব ভাবি সীমাহীন স্থানে বসে একা ।
আমরা আগুন নিয়ে খেলা করি দু ঠোঁটের ফাঁকে ।
খুব ভালো মিল হতো সেই এক শব্দে ও আমাকে ।
আত্মহননের দিকে যাই কারা, কারা যাই ভেসে ?

আমার নিকটে আর

আমার নিকটে আর রচনারা বিশেষ আসে না।
যাও আসে তারা সব দাদা দাদা বলে ডাকে এখন আমাকে।
একদা যেসব কথা লিখেছি সেগুলি পাশে নিয়ে
শুয়ে থাকে পিপড়েরা শুয়ে থাকে উইপোকাগুলি।
পোকাকাটা সেইসব রচনাসমূহ তবু আমার একথা বলে লোকে।
সেই সব পুরাতন বিরহবেদনাগুলি মুখস্ত রেখেছি
এখনো অনেকগুলি, ঘন ঘন বিরহের মুখ ভেসে ওঠে।
আমার এ বর্তমান রচনাসমূহ তবু বুঝি
নিশ্চিতই মদিরার মতন বিস্বাদ লাগে পানের সময়ে।

মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা

মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে
ভাবি যে 'আমার তৈরী কুকুর ডাক তো'।
তার পরে কান পেতে থাকি আমি কুকুর ডাকে না।
এর পরে ফের ভাবি 'দশ গোনবার
ভিতরে নিকটে কোনো কুকুর ডাক তো'।
দশ গুনে যাই তবু কুকুর ডাকে না।
কিন্তু তবু মাঝে মাঝে বছর বছর
ভাবি যে 'আমার তৈরী কুকুর ডাক তো'।

মন্দিরেও আবর্জনা

মন্দিরেও আবর্জনা জমে বহু প্রতিদিন দেখি।
সেইসব আবর্জনা আমার হৃদয় থেকে ঝাট দিয়ে বার করি আমি।
যেন শিশু সেইসব আবর্জনা নিয়ে খেলা করি ;
যেন বা পূজারী সেই আবর্জনা মেখে নিই আমার ললাটে ;
যেন পাখি আবর্জনা নিয়ে যাই বাসা বাঁধবার
নিমিত্ত, এসব আমি নিজেই করছি বর্তমান
মুহূর্তেই, এইসব আবর্জনা পচে ক্রমে মাটি হয়ে যাবে।
হয় তো বা সেই মাটি দিয়ে কেউ ভবিষ্যতে দেবতা বানাবে।

মনে রেখ মনে রেখ

মনে রেখ মনে রেখ বলে কোনো লাভ আছে নাকি ?
মুকুরের সম্মুখের থেকে সরে গেলে আর মুকুরের বুকে
চিহ্নই থাকে না কোনো। মুকুরকে জাদুবলে আমি
পায়রা বানিয়ে নিয়ে দেখি এ পায়রা আমাকে তো
চিনতে সক্ষম হয়। এই চেষ্টা ফলবতী হয়ে গেছে কবে।
এক মন্দিরের দ্বারে লেখা আছে তোমার এবং
আমার নামটি তবু এ মন্দিরে তুমিও থাকো না
আমিও থাকি না কিন্তু মন্দিরে তো আমাদের বিগ্রহ রয়েছে।
এই কথা জেনে নাও সুদূর আমেরিকাতে বসে।

কিলবার্ন কোম্পানির

কিলবার্ন কোম্পানির অফিস দেখেই আমি লাফ মেরে উঠি,
তাড়াতাড়ি চলে আসি এই গ্রামে শিমুলপুরেই ।
সে অনেক বৎসর আগেকার কথা তার পরে
তেরশ আটানব্বুই বঙ্গাব্দের ফাল্গুন এখন
আমার হাতের কাছে কোলগেট টুথপেস্ট,
বাম হাত দিয়ে আমি ধরি
এ টুথপেস্টের এই টিউবকে এবং তখন
মনে আসে সে যুবতী নারীটির কথা
সে তো বলেছিল এই চারমিনারের
মানে তো, বিনয়বাবু, আসলে ইনার চার্ম
সে যুবতী এতদিনে বৃদ্ধা হয়ে গেছে

শব্দ দিয়ে সাগরের

শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয়।
প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা।
এককালে সে তো ছিল বাঙলায় আমার কোণেই।
তুড়ি মেরে বৌদ্ধ হয়ে সবাক কল্পনা হয়ে গেল!
অনুমানে বোঝা যায় বহু আগে হয়ে গেছে মাছ।
নাকি ইতিমধ্যে সে কি ঠাকুরমাছই হয়ে গেছে?
শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয়।
প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা।

ভাবতে আমার খুব

ভাবতে আমার খুব কষ্ট হয়, পৃথিবীটি গোলাকার এই
কথা ভাবা কষ্টকর, অথচ আকাশে সূর্য চাঁদ
উভয়েই গোলাকার উভয়েরই সব পাশ ফাঁকা,
উভয়ে কোনোকিছুর সহিত ঠেকানো নেই
সব দিকে শুধু শূন্যস্থান।
আমাদের পৃথিবীও এরকম চাঁদ আর সূর্যের মতন।
এই কথা জানি আমি জানে পৃথিবীর
সকল মানুষ, তবু আমেরিকা সিধে
পায়ের নীচের দিকে পৃথিবীটি গোলাকার বলে
এই কথা ভেবে নিতে আমার কেবলই কষ্ট হয়।

জনৈক যুবাকে আমি

জনৈক যুবাকে আমি বুঝিয়েছিলাম
আমাদের বৃদ্ধদের হৃদয়ে আনন্দ আছে তার
কারণ আমরা যারা বৃদ্ধ তারা জীবনের সব
কাজকর্ম শেষ করে ফেলেছি আগেই
আমাদের আর কোনো কাজ নেই, ভালো হোক মন্দ হোক
এইসব কাজ
আমাদের বৃদ্ধদের করা সারা। আর তোমাদের
যুবাদের সম্মুখেই পড়ে আছে ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট আগামী ;
করবে কী চাকরি না ব্যবসায় নাকি সাহিত্যিক
হবার বাসনা আছে মনে মনে, কী যে হবে কিছুই জানো না।

বসে জানালার পাশে

বসে জানালার পাশে দেখি যে বরুণ আসে
নিজের বাড়ির অভিমুখে।
হাতে তার কেরোসিন তেলের একটি টিন
বরুণ রয়েছে বেশ সুখে।
আমিও তো সুখে আছি বরুণের কাছাকাছি
একা একা আমার বাড়িতে।
আজ এই দুপুরের সময়ে পাখিরা ঢের
ডাকছে যে যার মতো গীতে।
সীমাহীন জায়গায় আমরা রয়েছি হায়
কোনো কিছু দেখা তো হলো না
ওই চাঁদ ওই তারা রয়েছে কেমনধারা
কত দূরে কেহই জানো না।
তাহলেও ধরণীতে ঘুরি ফিরি শোধ দিতে
যেন কার দেনা আগেকার।
দেখা হয় দিনে রাতে পরিচিতদের সাথে
এটাই তো অবাক হবার
কারণ ও সীমাহীনে পথ ঠিক চিনে চিনে
দেখা করি ভেবে দেখ আর
পাখিরাও রাতে দিনে এই নীল সীমাহীনে
পথ চেনে কোন বাসা কার।

বৃহৎ হীরক

বৃহৎ হীরক বলে অবশেষে ক্রমে ক্রমে পৃথিবীবিখ্যাত।
এই কথা জেনে নিয়ে সে কি খুশি হয়?
কখনো বা ফুলবনে কখনো বা নগরীর ভীড়ে
অথবা পুস্তকালয়ে গিয়ে তার হীরকের কথা মনে পড়ে?

আমি তাকে সঙ্গে নিতে পারিনি তখন,
শুধু তার নামটিই সঙ্গে রেখে গেছি;
অক্ষরের সাহায্যেই তার চিত্র সর্বদা এঁকেছি।
তার দিব্য হাসি আজো মনে পড়ে। তার মনে পড়ে
ভাঙা চশমার ডাটা আঠা দিয়ে জোড়া?
এবং আমার বিশ্বসৃষ্টির মহড়া?

তার যোগ্য আমিই তো তখনি ছিলাম।
সেই কথা বোঝে নি সে, কী আশ্চর্য, একথা বোঝাতে
বুড়ো হয়ে গেছি।
বেঁচে গেছি, বেঁচে গেছি, আমি তো ফোকটে।
মনে তবু ব্যথা বাজে, কী যে হতে পারত যদি সে
টের পেত গুণাবলী এবং ক্ষমতাবলী আর ভবিষ্যৎ
সে কি বেছে নিত এই পথ?

সহজ হয়েছি আমি, বাধ্য হয়ে সহজ হয়েছি।
রোগে ভুগে ভুগে ক্রমে মনে আর জটিলতা নেই;
জটিল বাক্যও নেই মনে আর, ফুল
চাঁদ আরো নানা কিছু দেখলেই তাকে মনে পড়ে।
আমি কবে পড়ে যাব অসময়ে ঝড়ে।
করেছি তো ডালা সৃষ্টি, তাস সৃষ্টি, মুকুট সৃষ্টিও
বোঝা যায় এতদিনে আমি তার প্রিয়।
এত কাল চলে গেল। ভেবে ভেবে অবাক হয়েছি।

আমাকে তারারা বলে 'বিনয়দা, বেদনা ভুলুন,
প্রেম হলো নুন।'
আমিও নিজেকে তাই বলি
তারাদের কথা মতো চলি।

বিভিন্ন সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা'

তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্য তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের চিনে নিতে আগাগোড়াই যথেষ্ট দেরি করেছে। তথাপি, বিনয় মজুমদারের ক্ষেত্রেও এই ঐতিহ্যেরই অনুসরণ দেখে ক্ষুব্ধ হই, বিচলিত হই, ভেতরে-ভেতরে লজ্জিত ও পীড়িত বোধ করি। বাংলা কবিতার আকাশে দু-দুটি সূর্য জ্বেলেছেন বিনয় : 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। তবু নগণ্য কিছু কবিতা-প্রাণ পাঠক ব্যতীত ব্যাপক পাঠক-সমাজে বিনয় আজও অপরিচিত, অজ্ঞাত। বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সঙ্গে যুক্ত বা কবিতা-টবিতা পড়েন বলে দাবি করেন এমন মানুষজনের কাছেও যখন বিনয় মজুমদার অপরিচিত থাকেন, বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি বা সমালোচকও যখন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা বিষয়ক আলোচনায় বিনয় মজুমদারের নাম উল্লেখ পর্যন্ত করেন না, তখন লজ্জিত ও বিচলিত হওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকে কি ? সাহিত্য নিয়ে আমাদের এত উচ্ছ্বাস, হই-চই ; চারিদিকে এত পত্র-পত্রিকা এ-সবের মধ্যে কি বড় কোনো ফাঁকি বাসা বেঁধেছে ? নিজের ও বন্ধু-বান্ধবের লেখা সংগ্রহ করে পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য আমাদের যে উৎসাহ, তার কতটুকু আমরা ব্যয় করি আমাদের সময়ের মূল্যবান লেখাপত্র সম্পর্কে আমাদের মতামত জানানোর জন্য ? পুরনো বা অতিপুরনো বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্নগুলি পুনরাবিষ্কৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আমরা স্মৃতিভ্রষ্ট। আত্মকেন্দ্রিক ও বন্ধুকেন্দ্রিক আমরা এ কোথায় চলেছি ?

তথাকথিত সাহিত্য সমালোচকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীন সাহিত্যের আস্বাদগ্রহণে সক্ষম নন। সৃষ্টিশীল ও চক্ষুষ্মান সাহিত্যিক সাহিত্যের নতুন যে ভূষণগুলি আবিষ্কার করে চলেছেন, সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ভার এঁদের ওপর ফেলে রাখাটা কোনো কাজের কথা নয়। এই দায়িত্ব নিতে হবে তাঁদেরই যাঁরা সৃষ্টিশীল সাহিত্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত, নচেৎ আমাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলি পাঠকসমাজের কাছে অপরিচিতই থেকে যাবে।

বিনয় মজুমদারের মতো বড়ো মাপের কবি পৃথিবীর যে কোনো ভাষাতেই খুব বেশি নেই এবং এত বড়োমাপের আর একজন কবির আবির্ভাবের জন্য বাংলা সাহিত্যকে নিশ্চিত-ভাবেই দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। অথচ বিনয় মজুমদার ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমরা জানি কত কম ! বিনয়কে যাঁরা জানেন, তাঁদের অধিকাংশের কাছেও বিনয় প্রায় কিংবদন্তীর পুরুষ। তাঁকে নিয়ে নানা জনশ্রুতি তাঁর ছোট পাঠকমহলেও দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত। এর কারণ, তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল এবং গভীর এক দার্শনিক অন্বেষণে আহত, ক্ষতবিক্ষত এই কবি তাঁর গ্রামে নিজেকে প্রায় স্বেচ্ছানির্বাসিত রেখেছেন। কিছু তরুণ কবি ছাড়া তাঁর খোঁজ এখন বিশেষ কেউ আর নেন না।

১৯৯২ খৃস্টাব্দের, ১৭ই সেপ্টেম্বর দিনটিকে আমরা নিঃশব্দে চলে যেতে দিয়েছি। বাংলা কবিতা পাঠকের কাছে চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য এই দিনটির কথা অধিকাংশ বাঙালি পাঠকই খেয়াল করেননি। বিনয় মজুমদার এই দিনেই তাঁর আটান্ন বছর বয়স পূর্ণ করেন এবং এই দিনেই 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম 'ফিরে এসো চাকা' নামে প্রকাশের তিরিশ বছর পূর্ণ হয়। এখনকার বাংলা কবিতার পাঠক অরুণা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'র সঙ্গেই পরিচিত। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটির একটি নাতিদীর্ঘ ইতিহাস আছে। নিচে এই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম 'গায়ত্রীকে'। 'গায়ত্রীকে' পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে 'ফিরে এসো, চাকা' নামে প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ'-এর শ্রী দেবকুমার বসু, ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর। 'ফিরে এসো, চাকা' এরপর 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৯৬৫ খৃস্টাব্দের ৩১শে জুলাই প্রকাশিত 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে 'আমার ঈশ্বরীকে'র সমস্ত কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়। 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে আবার 'ফিরে এসো, চাকা' নামে এই গ্রন্থের কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয়, প্রকাশ করেন মীনাক্ষী দত্ত, ১লা মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দে। কলকাতা সংস্করণের পর 'ফিরে এসো, চাকা'র নাম আর পরিবর্তন করা হয়নি। ১৩৮৩ বঙ্গাব্দের, অগ্রহায়ণ মাসে 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই অরুণা সংস্করণই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে ১৯৯০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে। নিচে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল।

গায়ত্রীকে

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম। এই তথ্য 'ফিরে এসো, চাকা'র বহু পাঠকেরই অজানা। বিনয় মজুমদার তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে 'গায়ত্রীকে' সম্বন্ধে লিখেছেন : 'অবশেষে সেই এক ফর্মা পুস্তিকা প্রকাশিত হলো। নাম 'গায়ত্রীকে'। চোদ্দটি কবিতা ছিলো তাতে। মোট ষোলো পৃষ্ঠার বই। আগেই ভেবেছিলাম যে দ্বিতীয় সংস্করণে আরো অনেক কবিতা যুক্ত ক'রে পুস্তিকাখানিকে একখানি পূর্ণাঙ্গ বই ক'রে ফেলবো। ফলে আমি লিখে চললাম। ইতিমধ্যে দুর্গাপুরে একটি চাকরি পেয়ে আমি কোলকাতা ছেড়ে দুর্গাপুরে যাই। সেখানে তিন শিফটে কাজ করতে হতো। সকালের শিফট সন্ধ্যার শিফট এবং রাত্রের শিফট। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই তিন শিফটেই কাজ করতে হতো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি কবিতা লিখতাম। মাস আড়াই কাজ করার পর আমি 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাকে পরিবর্ধনের ব্যাপার শেষ ক'রে ফেলি। সাতাত্তরটি কবিতা সম্বলিত পাণ্ডুলিপি আমি দেবকুমার বাবুকে দিয়ে গেলাম। বই এর নাম 'ফিরে এসো, চাকা'।'

'গায়ত্রীকে'র প্রথম সংস্করণের আখ্যাপত্রের পেছনের পৃষ্ঠা নিচে দেওয়া হল :

'প্রথম প্রকাশ : ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ ; মার্চ, ১৯৬১। প্রকাশক : দেবকুমার বসু, গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট্, কলকাতা-১২

মুদ্রাকর : নির্মল কৃষ্ণ পাল, নির্মল মুদ্রণ, ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট্ কলকাতা-৬

মূল্য—·৭৫ টাকা'

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র নেই।

লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের ১০-ম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বিনয় মজুমদারকে সম্বর্ধনা জানানো হয় এবং 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত হয়। পুনর্মুদ্রণের তারিখ ৮ আষাঢ়, ১৩৯৫, ২৩ জুন, ১৯৮৮ এবং প্রকাশক : বুলবুল দত্ত, হার্দ্য, ১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

বুলবুল দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে বিনয় মজুমদারের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং বিনয়ের রচনাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তবে, 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থটি যে 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণের নাম—এ-তথ্যের উল্লেখ এখানে করা হয়নি। তাছাড়া 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের একটি মুদ্রণপ্রমাদ এই পুনর্মুদ্রণে অপরিবর্তিত অবস্থাতেই থেকে গেছে। মুদ্রণপ্রমাদটি হল : 'খরগোশগুলি সব **ধূসরঙ** রোম ত্যাগ ক'রে' (গায়ত্রীকে'র নবম কবিতার চতুর্থ পংক্তি)। এই পংক্তিটির প্রকৃত পাঠ হবে : 'খরগোশগুলি সব **ধূসরাভ** রোম ত্যাগ ক'রে'।

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করে বুলবুল দত্ত বাঙালি কবিতা পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

'গায়ত্রীকে'র খুব উল্লেখযোগ্য একটি সমালোচনা লেখেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়েছিল অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' পত্রিকায়। এই বিষয়ে বিনয় মজুমদার তাঁর লেখা 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলো শক্তি। লিখেছিলো যে আমি যে-কোনো বস্তু নিয়ে সার্থক কবিতা লিখতে পারি।…শক্তির এই সমালোচনা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত কোনো পত্রিকাতে আমার কবিতা কেউ চেয়ে নিতো না। সম্পাদকেরা চাইতো না এবং আমিও দিতাম না। ফলে এখন যদি কেউ আমার লেখার সন্ধানে পুরোনো পত্রিকা ঘাঁটেন তবে হতাশ হবেন। কবিতার জগতে আমার প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে।'

'গায়ত্রীকে'র কয়েকটি কবিতা 'ফিরে এসো চাকা'য় সরাসরি গ্রহণ করা হয়েছে, কিছু কবিতা গ্রহণ করা হয়েছে পরিমার্জনার পরে, কিছু কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছে। বই দুটি পড়লেই এসব জানা যাবে। এই গ্রহণ ও পরিমার্জনার বিষয়টি, তথাপি একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি। এই আলোচনাটি বোঝার জন্য 'ফিরে এসো, চাকা'র সাতাত্তরটি কবিতাকে ১, ২, ৩…এইভাবে চিহ্নিত করে নিতে হবে। 'ফিরে এসো, চাকা' বলতে এখানে আমি অরুণা প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'কে বোঝাতে চাইছি।

'গায়ত্রীকে' ও 'ফিরে এসো, চাকা' (অরুণা প্রকাশনীর) অন্তর্ভুক্ত একই কবিতার পাঠভেদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যের একটি তালিকা :

'গায়ত্রীকে'র প্রথম কবিতাটিই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম কবিতা, পরিবর্তন করা হয়েছে কেবল ১৩ নম্বর পংক্তিতে। 'ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাসে আলোড়িত করে' পংক্তিটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় হয়েছে 'দীর্ঘ দীর্ঘ ক্লান্তশ্বাসে আলোড়িত করে'। স্তবকবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র দ্বিতীয় কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় কোনো পরিমার্জনা ছাড়াই গৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রেও স্তবকবিন্যাসের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র তৃতীয় কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩ নম্বর কবিতা, কেবল প্রথম দুটি লাইন বাদ দেওয়া হয়েছে এবং তৃতীয় লাইনের শুরুতে 'শিশুকালে' শব্দটি যোগ করা হয়েছে ও ১৩ নম্বর লাইনের 'হায়য়ে' শব্দটি বদলে করা হয়েছে 'অথচ'। 'গায়ত্রীকে'র মতো 'ফিরে এসো, চাকা'য় কবিতাটিকে স্তবকে বিন্যস্ত করা হয়নি।

'গায়ত্রীকে'র চতুর্থ কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৭ নম্বর কবিতা। এক্ষেত্রে কেবলমাত্র স্তবকবিন্যাসে পরিবর্তন করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে'র পঞ্চম কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র ৬ নম্বর কবিতা। 'গায়ত্রীকে'র মতো এক্ষেত্রে কবিতাটিকে স্তবকে বিন্যস্ত করা হয়নি। এই কবিতাটির ৭ ও ৮ নম্বর লাইন দুটি 'ফিরে এসো, চাকা'য় বর্জন করা হয়েছে। এবং ৯ নম্বর লাইনে 'অতিস্থূল অর্থহীন' পালটে 'অর্থহীন অতি স্থূল' করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে'র সপ্তম কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২৫ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র নবম কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৮ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র একাদশতম কবিতাটির সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৯ নম্বর কবিতাটির মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র দ্বাদশতম কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকের সঙ্গে 'ফিরে এসে, চাকা'র ২৩ নম্বর কবিতার মিল লক্ষণীয়।

'গায়ত্রীকে'র ত্রয়োদশতম কবিতার সঙ্গে 'ফিরে এসো, চাকা'র ২২ নম্বর কবিতার প্রচুর মিল রয়েছে।

'গায়ত্রীকে'র চতুর্দশতম কবিতার ৭ ও ৮ নম্বর লাইন দুটি 'ফিরে এসো, চাকা'র অবিস্মরণীয় 'অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতায়' কবিতাটির বীজ।

'গায়ত্রীকে'র ৬, ৮ ও ১০ সংখ্যক কবিতাগুলি 'ফিরে এসো, চাকা'য় বর্জন করা হয়েছে।

'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাটির নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে লিখেছেন : 'গায়ত্রী

চক্রবর্তী প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তো। এবং ১৯৬০ কি ১৯৬১ খৃস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজীতে বি.এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথমা হয়ে পাস করেছিলো। সেই আমার কবিতা বুঝতে পারবে ভেবে তাকেই উদ্দেশ্য ক'রে 'গায়ত্রীকে' বইখানি লেখা। সেইহেতু বই-এর নাম 'গায়ত্রীকে' রেখেছিলাম।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, বিনয় মজুমদারের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'নক্ষত্রের আলোয়'। এটি প্রকাশিত হয় ১৩৬৫ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন এবং প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশন সংস্থার দেবকুমার বসু। কাব্যগ্রন্থ হিসেবে 'নক্ষত্রের আলোয়'কে বলা যায় 'একজন নবীন কবি যশোপ্রার্থীর আবেগতাড়িত সৎ ও অপটু রচনা।' জীবনানন্দের প্রভাব এই কাব্যগ্রন্থটির আস্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'ও বেশ দুর্বল রচনা, তবু 'ঝরাপালক'এর কোনো কোনো কবিতায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিকে খুঁজে পাওয়া যায়, কিন্তু 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থে 'ফিরে এসো, চাকা'র কবির সামান্যতম পূর্বাভাসও নেই।

গায়ত্রীকে' এবং 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থ দুটির কবিতা অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে 'পয়ার' বলে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ করা দরকার, পয়ার কোনো ছন্দের নাম নয়, আট+ছয় মাত্রার চালের ছন্দকেই পয়ার বলা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'ছন্দসরস্বতী' গ্রন্থে লিখেছেন : 'আটছয় আটছয় পয়ারের ছাঁদ কয়'। পয়ার অক্ষরবৃত্ত, স্বরবৃত্ত এবং মাত্রাবৃত্ত এই তিন ছন্দেই হওয়া সম্ভব। যাই হোক, বিনয় এই প্রসঙ্গে তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'কিন্তু দুঃখের বিষয় নির্ভুল পয়ার আমি একবারও লিখতে পারতাম না। কোথায় ভুল হচ্ছে সেটি স্পষ্ট টের পেতাম। কিন্তু সে ভুল শোধরাবার কোনো উপায় খুঁজে পেতাম না। তখন থেকে শুরু ক'রে চারবছর আমার লেগেছিলো পয়ার লেখা শিখতে—আবিষ্কার করতে লেখাটাই ঠিক ছিলো মনে হচ্ছে। এবং ১৯৬০ সালের শুরুতে আমি পয়ার লেখার নিখুঁত পদ্ধতি আবিষ্কার করি। তারপর পয়ার ভিন্ন অন্য কোনো ছন্দ লিখিই নি। এখন পয়ারই আমার প্রিয়তম ছন্দ। শুধু পয়ারই লিখি।'

প্রকাশিত হবার পর 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থটি চেনাজানা অনেককেই পড়তে দিয়েছিলেন বিনয় মজুমদার। কিন্তু এই গ্রন্থটি নিয়ে কেউই কোনো আলোচনা করেননি। 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্যগ্রন্থের ব্যর্থতাই বিনয়কে নতুন ভাবে, নতুন আঙ্গিকে কবিতা লিখতে প্ররোচিত করেছিল। ফলে আমরা পেয়েছি 'গায়ত্রীকে'র মতন একটি কাব্যগ্রন্থ। 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কয়েকটি পাতার মধ্যেই মহৎ একজন কবির পূর্বাভাস অভিজ্ঞ পাঠক মাত্রই টের পাবেন। কী গভীর ভাবনাচিন্তা এবং পরিশ্রম 'নক্ষত্রের আলোয়' গ্রন্থের কবিকে 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কবিতে পরিণত করেছিল তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়।

ফিরে এসো, চাকা : দ্বিতীয় সংস্করণ : গ্রন্থজগৎ সংস্করণ

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের কিছু কবিতা গ্রহণ করে, কিছু কবিতার সংস্কার করে, কিছু

কবিতা বর্জন করে এবং বহু নতুন কবিতা যোগ করে 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশিত হয় ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ খৃস্টাব্দে; বিনয় মজুমদারের ২৮তম জন্মদিনে (বিনয় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর)। এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেন 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশন সংস্থার দেবকুমার বসু। এই প্রবন্ধে দেবকুমার বসুর 'গ্রন্থজগৎ' থেকে প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'কে আমরা 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণ নামে উল্লেখ করব। 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হল :

আখ্যাপত্র

'ফিরে এসো, চাকা / বিনয় মজুমদার / গ্রন্থজগৎ-কলকাতা ১২'

আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা

'প্রথম প্রকাশ : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ / ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / গ্রন্থজগৎ, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, / কলকাতা-১২ / প্রচ্ছদ : পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক : শ্রীনির্মল কৃষ্ণ কাঞ্জিলাল / ৮-ব্রজদুলাল স্ট্রিট, / কলকাতা-৬ / দুই টাকা'।

'ফিরে এসো, চাকা'র এই সংস্করণে কবিতার সংখ্যা সাতাত্তর।

গ্রন্থজগৎ সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা' যে 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ—এ কথা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণে প্রচুর ছাপার ভুল ছিল। এই প্রসঙ্গে বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে লিখেছেন : 'এরপরই বেরোলো 'ফিরে এসো, চাকা'। তখন আমি দুর্গাপুরের চাকরি ছেড়ে কোলকাতায় ফিরে এসেছি। 'ফিরে এসো, চাকা' কোলকাতায় ফেরার আগেই ছাপা হয়ে গেছলো। ফলে আমি প্রুফ দেখতে পারিনি। অনেক ছাপার ভুল রয়ে গেসলো। যেমন 'শুভ্রগান' এর জায়গায় ছাপা হয় 'শুভগান'। অনেক জায়গায় শব্দও বাদ চ'লে গেসলো। আর কবিতার শব্দ বাদ যাওয়া মানেই তো ছন্দ পতন।'

'গায়ত্রীকে' গ্রন্থেই বিনয় তাঁর নিজস্ব ভাষা আবিষ্কার করতে তৎপর হয়েছিলেন, এই গ্রন্থে আমরা দেখা পেয়েছি একজন সম্ভাবনাময় কবির। 'ফিরে এসো, চাকা'য় আমরা পেলাম পরিপূর্ণ একজন কবিকে। জীবনানন্দের কবিতা রচনার রীতিকে আত্মস্থ করে বিনয় খুঁজে নিয়েছেন তাঁর নিজস্ব ভাষা ও নিজস্ব জগৎ। 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের ভীতিপ্রদ গভীরতা ও বহুমাত্রিক ইঙ্গিত বাংলা কবিতায় নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হয়েছে : শ্রীমতী গায়ত্রী চক্রবর্তীকে। 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে গায়ত্রী চক্রবর্তী সম্বন্ধে বিনয়ের বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে। 'কবিতীর্থ' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৮৬ সংখ্যায় 'কোনো গোপনতা নেই' শিরোনামে সমর

তালুকদারের নেওয়া বিনয় মজুমদারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ নিচে দেওয়া হল :

'জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করল—

গায়ত্রীকে কি তুমি ভালো বাসতে ?

—আরে ধ্যুৎ, আমার সঙ্গে তিনচারদিনের আলাপ—প্রেসিডেন্সি কলেজের নামকরা সুন্দরী ছাত্রী ছিলেন ইংরাজি সাহিত্যের—তারপরে কোথায় চলে গেলেন—আমেরিকা না কোথায়—ঠিক জানি না।

—তাহলে ওকে নিয়ে কবিতা কেন ?

—কাউকে নিয়ে তো লিখতে হয়—আমগাছ, কাঁটাগাছ, রজনীগন্ধা নিয়ে কি চিরদিন লেখা যায় ?'

এই প্রসঙ্গে বলি, অনেকেরই ধারণা 'ফিরো এসো, চাকা'র কবিতাবলী গায়ত্রী চক্রবর্তীকে নিয়ে লেখা কবিতার সংকলন মাত্র। বিনয় নিজেও কোনো কোনো জায়গায় এই কথা সমর্থন করেছেন। বাহ্যত, 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতা নিশ্চিতভাবেই প্রেমের কবিতা, ব্যর্থ প্রেমের কবিতা। কিন্তু সচেতন এবং বিপদজনক এক দার্শনিক অন্বেষণে আহত, রক্তাক্ত এক কবির পদচিহ্ন এই গ্রন্থের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। 'ফিরে এসো, চাকা'র দার্শনিক অন্বেষণের কথা বিনয় নিজেই লিখেছেন তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে : 'সৃষ্টির মূলে যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরে সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্র তিনের ভিতরে বিদ্যমান। এই সার সত্য সম্বল ক'রে ভেবে দেখলাম, জড়ের জীবনে যা সত্য মানুষের জীবনেও তাই সত্য, উদ্ভিদের জীবনে যা সত্য মানুষের জীবনেও তাই সত্য। অতএব জড় এবং উদ্ভিদের জীবন অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগলাম আমি। এইভাবে শুরু হল কবিতার জগতে আমার পদযাত্রা, আমার নিজস্বতা। এইভাবে সৃষ্টি হল 'গায়ত্রীকে', 'ফিরে এসো, চাকা'।'

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থের নামকরণ প্রসঙ্গে বিনয় মজুমদার আমাকে জানিয়েছেন : 'আমার এক বন্ধু ছিল, নাম সরোজ চক্রবর্তী। বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুরে আমার সঙ্গে পড়ত। একবছর পড়ার পর ইংল্যান্ডে চ'লে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। কিন্তু সেখানে পড়া শেষ না ক'রেই বাড়ি ফিরে আসে বছর দুই ইংল্যান্ডে থেকে। সরোজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এস সি. পাশ। সুতরাং দেশে ফিরে 'মেটাল বক্স' কোম্পানিতে চাকরি পায়। চৌরঙ্গী রোডে 'মেটাল বকস' কোম্পানির অপিসে গিয়ে দেখি সরোজের দরজায় লেখা : 'সরোজ চাক'। 'চাক' এর স্ত্রীলিঙ্গ 'চাকা'। গায়ত্রী চক্রবর্তীকেই আমি গায়ত্রী 'চাকা', বানিয়েছি। 'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থটির নামকরণের ইতিহাস এই।'

বলাই বাহুল্য, 'ফিরে এসো, চাকা'র 'চাকা' আসলে গতির প্রতীক। গতিহীন কবি তাঁর লুপ্তগতি পুনরুদ্ধারের জন্য হাহাকার করেছেন : 'আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো ; ফিরে

এসো, ফিরে এসো চাকা.'। তবু, 'ফিরে এসো, চাকা' নামকরণের এই ইতিবৃত্তে আমরা যথেষ্ট কৌতুক বোধ করি।

'ফিরে এসো, চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ : আমার ঈশ্বরীকে

'ফিরে এসো, চাকা'র তৃতীয় সংস্করণ 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত হয়। নিচে 'আমার ঈশ্বরীকে'র আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করা হল, এখান থেকে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য জানা যাবে :

'কপি রাইট : মীনাক্ষী দত্ত / ৪০।১-এ রড স্ট্রিট, / কলকাতা-১৯ / প্রথম সংস্করণের নাম : গায়ত্রীকে / প্রকাশের তারিখ : ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ। / দ্বিতীয় সংস্করণের নাম : ফিরে এসো, চাকা / প্রকাশের তারিখ : ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬২ / ৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৯ বঙ্গাব্দ / বর্তমান তৃতীয় সংস্করণের নাম : আমার ঈশ্বরীকে / প্রকাশের তারিখ : ১৩ই জুন, ১৯৬৪ খৃস্টাব্দ / প্রকাশক : বিনয় মজুমদার / ব্যক্তিগত প্রকাশনী / কলকাতা-১২ / মুদ্রক : বিভাস গুহঠাকুরতা, / ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস / ৯৩ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, / কলকাতা-৯ / প্রচ্ছদ লিপি : বিনয় মজুমদার / মূল্য : ৩·৩৩ টাকা'

বইটির উৎসর্গপত্রে লেখা আছে : 'আমার ঈশ্বরীকে'।

পাঠকের কাছে 'ফিরে এসো, চাকা'র 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণটি তিনটি কারণের জন্য উল্লেখযোগ্য। কারণগুলি হল : ১. এই গ্রন্থে 'প্রারম্ভিক' শিরোনামে একটি অনবদ্য ভূমিকা আছে। যা 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠকের অবশ্যপাঠ্য। 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এই ভূমিকাটিকে বর্জন করা হয়েছে। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে (এই প্রবন্ধের অন্যত্র এই গ্রন্থটিকে নিয়ে আলোচনা করা হবে।) এই ভূমিকাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে দু-একটি লাইন বাদ দিয়ে। নিচে কিছু মন্তব্যসহ এই ভূমিকাটি দেওয়া হয়েছে।

২. এই গ্রন্থে ৬টি নতুন কবিতা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'র অন্য কোনো সংস্করণে নেই। 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র 'আমার ঈশ্বরীকে' অংশে অবশ্য এই ৬-টি কবিতাই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। একটু নিচে এই প্রবন্ধের পাঠককে আমি এই ৬-টি কবিতাই উপহার দিয়েছি।

৩. এই গ্রন্থে বিনয় মজুমদার নানা কবিতায় অল্পবিস্তর পরিমার্জনা করেছেন। এই প্রবন্ধের অন্যত্র এই পরিমার্জনার বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে কবিতার সংখ্যা ৭৯টি। 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের ৭৭টি কবিতার ভিতর ৭৩টি কবিতা 'আমার ঈশ্বরীকে'তে গ্রহণ করা হয়েছে। বাদ দেওয়া হয়েছে এই চারটি কবিতা : ১. স্বপ্নের আধার তুমি ভেবে দ্যাখো, অবিকৃত দু-জন যমজ (৩৮ সংখ্যক কবিতা), ২. চিৎকার আহ্বান নয়, গান গেয়ে ঘুম ভাঙালেও (৭২ সংখ্যক কবিতা), ৩. করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ

ফোটেনি (৭৪-সংখ্যক কবিতা) এবং ৪. আঘাত দেবে তো দাও, আর নেই মৃত স্মৃতি-রাশি (৭৬-সংখ্যক কবিতা)।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের ভূমিকা

॥ প্রারম্ভিক ॥

একজন বান্ধবকেন্দ্রিক এই শুধুমাত্র প্রেমার্তের কাব্যখানি যথাযথ দিনপঞ্জি বিশেষ। তবে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে রচনা করার ফলে কাব্যের অন্তর্গত সংখ্যাত প্রতিটি অংশ যে কোনো পাঠক কিংবা পাঠিকার নিজেরই জীবনের কোনো পরিস্থিতির বিশিষ্ট রূপায়ণ ব'লে মনে হবার কথা। সেই উদ্দেশ্য মনে রেখেই প্রতিটি সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

আবার যেহেতু যে কোনো একটি মাত্র অংশই প্রেম, সমাজনীতি, দর্শন, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ের সঙ্গে বিজড়িত পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য সেহেতু যে কোনো পাঠক কিংবা পাঠিকার জীবনের যে কোনো পরিস্থিতিরই সফল রূপায়ণ এ কাব্যে খুঁজে পাবার কথা। আমরা যে মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে স্বপ্ন দেখি (দৃশ্যের পর দৃশ্যের সমন্বয়ে) সেই পদ্ধতিতে কাব্যখানি এবং কাব্যের অন্তর্গত প্রত্যেক সংখ্যাত অংশ রচনা করা হয়েছে।

প্রত্যেক সংখ্যাত অংশই এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। এবং কালানুক্রমে দিনপঞ্জি রূপে লিখিত কবিতাবলী একযোগে একখানি পূর্ণ কাব্যও। অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যাত অংশই পৃথকভাবে হ্রস্ব কবিতারূপে বিবেচিত অবস্থায় পাঠ করা সম্ভব।

এই সংকলনে সব সমেত ৭৯টি কবিতা আছে এবং কবিতার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না। কাব্যের নামও আর পরিবর্তিত করা হবে না।

এই তৃতীয় সংস্করণই এই কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ। স্থান সঙ্কুলান হলে ভবিষ্যতে মুদ্রণকালে বই-এর একপৃষ্ঠায় একটি ক'রে সংখ্যাত অংশ ছাপা যেতে পারে।

৫ই জুন, ১৯৬৪ বিনয় মজুমদার'

এই ভূমিকাটিতে বিনয় মজুমদার স্পষ্টতই 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলীর বহুমাত্রিকতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী এই বহুমাত্রিকতা অর্জন করেছে 'বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে' রচিত হওয়ার ফলেই। যদিও বিনয় এখানে ঘোষণা করেছেন যে 'কবিতার সংখ্যা আর বাড়ানো হবে না। কাব্যের নামও আর পরিবর্তিত করা হবে না।' পরবর্তী সংস্করণে বিনয় কাব্যের নাম পরিবর্তিত ক'রে করেন 'ফিরে এসো, চাকা' এবং কবিতার সংখ্যাও কমিয়ে দেন। তাছাড়া, এই ভূমিকায় বিনয় 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণটিকেই 'এই কাব্যের একমাত্র প্রামাণ্য সংস্করণ' হিসেবে ঘোষণা করলেও 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণে 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠ বর্জন করে 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠকেই গ্রহণ করেন।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের ৭৯টি কবিতা ১, ২, ৩, ৪…৭৯ এইভাবে সংখ্যায়িত করে ছাপা হয়েছে।

'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণ থেকে ৬টি কবিতা

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে এমন ছটি কবিতা আছে যা 'ফিরে এসো, চাকা'য়, 'আমার ঈশ্বরীকে'র পরবর্তী কোনো সংস্করণে গ্রহণ করা হয়নি। নিচে এই কবিতাগুলি দেওয়া হল। রচনাগুলির নিচে রচনাকাল উল্লেখ করা হয়েছে।

এই কবিতাগুলি কেন 'ফিরে এসো, চাকা'র পরবর্তী সংস্করণগুলিতে গ্রহণ করা হয়নি—আমার এই প্রশ্নের উত্তরে বিনয় মজুমদার আমাকে জানিয়েছেন: '…মূল বই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণই মূল লেখা। এই কথাই আসল।…'ফিরে এসো, চাকা' বইটি পুরোটাই গায়ত্রী চক্রবর্তীকে আমার বক্তব্য। সুতরাং, এই বইয়ে পরে লেখা কবিতা যোগ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

উল্লেখ করা দরকার, এখানে "মূল বই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রথম সংস্করণ" বলতে গ্রন্থজগৎ সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র কথাই বলা হচ্ছে।

১

স্বপ্নের সুযোগে তুমি দিয়েছিলে সবকিছু—সব
সমাজ বন্ধের ঊর্ধ্বে তোমাকেই অনুভব ক'রে
প্রিয় বাষ্পময় রূপে নিজেকে করেছি অনুভব,
আবার বিশাল রৌদ্রে মনোলীনা হয়ে গেছো ভোরে।
এই যে মুহূর্ত, এই কাব্য, গীতি অমেয় তৃষ্ণায়
অমেয় আকাঙ্ক্ষা থেকে কতদিন কতকাল ব্যাপী
রচনা করেছি তা তো আমি জানি, স্বপ্নের নীলিমা।
উদ্দাম তড়িতাহত শিশির মধুও হয়ে যায়,
কুসুমের অভ্যন্তরে মধু হয়ে শান্ত হতে পারে।
সেহেতু নিদ্রার প্রতি শরীরের, হৃদয়ের আর
অন্যবিধ বিষয়ের, ব্যাপারের সুনিদ্রার প্রতি
এখনো শিথিল প্রীতি আমাদের হৃদয়ে রয়েছে।
এইভাবে যেন থাকে, যেন কোনো ভূগর্ভ যুগীয়
অন্ধকারও নিভে গেলে সুনিদ্রায় শূন্যায়িত হই।
১৯.১২.৬৩

২

এইভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ ডাকে,
ডাক দিয়ে যায় সব সর্বশ্রেষ্ঠ হৃদয়, জীবন,
নির্ভুলতা, যুগ যুগ এইভাবে প্রিয় প্রার্থিতের
নির্বাচন হয়ে থাকে—স্বপ্ন এসে বলে দিয়ে যায়,

সুনির্দেশ দিয়ে যায়, আমাদের স্নিগ্ধ, স্থির করে।
করবী, করবী তুমি কালরাত্রে…রাত্রিতে তোমাকে
অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে না পেলেও সিক্ত হয়ে গেছি।
মৃদু পায়ে চলমানা ছায়াময়ী কোমল স্বপ্নের
প্রলেপ প্রার্থনা করি, তাই আরো—আরো ঘুম চাই।
রূঢ়তা ও কর্কশতা তরল সুস্বাদু ক'রে নিয়ে
অবচেতনার গান গেয়ে যাও মিলন বশত।
অজ্ঞতা, দোলায়মান বিমূঢ়তা থেকে নির্দিষ্টতা
স্বপ্ন, তুমি দিতে পারো, বাস্তব আলোক না জ্বেলেও
সমাজের অগোচরে প্রকৃত আলোকে নিয়ে যাও।
১৯.১২.৬৩.

৩

শুনেছো, স্বপ্নের মাঝে আমাদের অতৃপ্তিরা আসে।
অথচ অধিকতর তত্ত্ব আছে, চিন্তা রয়ে গেছে।
সে সব জটিলতর সমস্যার অনায়াসলীন
সমাধান কোনোদিন চেতনায় না-পেয়ে থেমেছি,
কষ্ট পেয়ে গেছি, তার সমাধান অবচেতনায়
হলে সেই বিষয়ের স্বপ্ন দেখি, সাধপূর্ণ হয়,
বোঝা যায় সমস্যার সমাধান অবচেতনায়
হয়ে গেছে, চেতনায় সত্বর সঞ্চার লাভ ক'রে
সব বলে দিয়ে যাবে ; অন্ধকার, বিষয়, সময়
এইভাবে স্থিরীকৃত হয়ে থাকে, তবুও তোমার
শিল্পময় সব অঙ্গ, অঙ্গাঙ্গী যমক বাস্তবের
মতো স্পষ্ট পেতে হলে বাস্তবের অভিজ্ঞতা চাই
না হলে যথাসময়ে সবকিছু অন্তর্হিত হয়,
অদ্ভুত ধোঁয়ার মাঝে মিশে যায় বদ্বীপ, দোলন
তাহলেও তৃপ্তি আছে, সর্বশেষ তৃপ্তি পাওয়া যায়।
১৯.১২.৬৩.

৪

বহু সম্ভাব্যতা দেখি, দেখি দুটি আপ্লুত নয়ন
প্রাণে ছায়াপাত ক'রে অতীন্দ্রিয় সারসের মতো
মৃদু পায়ে হেঁটে যাও সম্মুখের সুস্পষ্ট প্রসারে।
উত্তোলন পটিয়সী, মাঝে মাঝে কেয়ারির ধারে
উদ্‌গত চুম্বন হয়ে রোমাঞ্চ বিস্তার ভালোবাসো।

কখনো শ্রবণা ঘিরে, কখনো কৃত্তিকা ঘিরে ঘিরে
পার্থিব বয়সগুলি নিঃশ্বসিত সদা নিঃশ্বসিত—
'যদি কোনোদিন তারা পূর্ণতার অবকাশ দিতো।'
তাদের পশ্চাৎ আছে, প'ড়ে আছে অনেক সম্মুখ।
অথচ মসৃণভাবে সেতু রচনায় সুপ্রয়াসে
বাধা আসে, বাধা আসে, অবিরাম বাধা এসে পড়ে,
যেহেতু পার্শ্বও আছে, সকলের পরিপার্শ্ব আছে।
তবু দেখা যায় কিছু পিছে ফেলে বিজয়িনী হয়
সক্রিয় মহিলাগণ—পরিপার্শ্বে মহিলা নিচয়।
২৯ ১ ৬৪.

৫

বিষণ্ণতা, অতি স্পষ্ট ভবিষ্যৎ প'ড়ে আছে আজ,
পৃথিবীতে স্বাদোত্তীর্ণ জীবন সম্ভবপর নয়।
সম্মুখে তাকালে দেখি স্বাদহীন বর্তনশীলতা—
নিরর্থক, প্রতিরুদ্ধ বর্তনশীলতা প'ড়ে আছে।
পাথরের প্রতি চেয়ে বোঝা যায় তার এ-সকল
ব্যথা নেই, ক্ষোভ নেই, পৃথিবীর পাখিদের শিরে
প্রাপ্ত বোধসমূহের সংশ্লেষণজাত কোনো রূপ
সুকল্পনা কোনোদিন জন্মলাভ করে না, অর্থাৎ
অতৃপ্তির হাহাকার তাদের হৃদয়ে বেশি নেই।
পাথরের পাখিদের থেকে সব মানুষের মন
পরিক্রমা ক'রে তবে আমার হৃদয়ে আসা যায়।
ফলে বুঝি, নেই, নেই, মানবীর মনে নেই এত
দিগন্তময়তা, আলো, পথে নেই হিংসাজাত বাধা,
তাই শুধু আমাদের প্রাণে বাজে আমাদের কথা।
৩১.১.৬৪.

৬

বহুতর আয় আজ মানুষের চতুষ্পার্শ্বময়।
বহুতর আয় যেন জনপ্রিয় রূপে জ'মে গেছে
তবু কী গোপন এক অপব্যয় স্পৃহা অবশেষে
আবিষ্কৃত হয়ে গেলো, অনিঃশেষ, বিনষ্টীকরণ
প্রতি মানুষের মনে, স্বভাবে দুরপনেয়ভাবে
ওতপ্রোতভাবে আছে, জীবনেরই বিনষ্টীকরণ।
আলোকেরও চেয়ে বেশি কালিমায় লুক্কায়িত লোভে
শিখা যেন প্রজ্বলিত হতে চায়, প্রজ্বলিত হয়।
প্রিয়তমা, এই জ্ঞানে চতুর্দিক উদ্ভাসিত আজ।

বিক্ষোভময়তা ক্রমে পৃথিবীতে ভয়াবহভাবে
বৃদ্ধি ক'রে দিতে হলো, কোনো এক অগ্রগমনের
ভূমিকা স্বরূপ ক'রে, কোনো কালে কিছু স্বচ্ছ হবে
প্রথম প্রণয় চেষ্টা, পারিবারিকতা, তবে আজ
মূক ও বধিরগুলি চ'লে গেলো কেমন নীরবে।
৮.২.৬৪.

'আমার ঈশ্বরীকে' থেকে আরও একটি কবিতা

দেবকুমার বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠ-ই অল্প-স্বল্প পরিবর্তন সহ 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। অরুণা সংস্করণই এখন বাজারে প্রচলিত। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে কবিতার পাঠে বিনয় যথেষ্ট গুরুত্বর নানা পরিবর্তন করেন এবং নিচের একটি উল্লেখপঞ্জীতে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩৬ সংখ্যক কবিতার যে পরিবর্তন 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে ঘটেছে, তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করায়, সে বিষয়ে এখানে একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল।

'গ্রন্থজগৎ সংস্করণে 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩৬ সংখ্যক কবিতার প্রথম পংক্তিটি হল : 'ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে'। কবিতাটি স্পষ্টতই জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে লেখা। কিন্তু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, জীবনানন্দ সম্পর্কিত এই অনবদ্য কবিতাটি 'ফিরে এসো, চাকা'র মূল সুরের সঙ্গে মেলে না। 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত লেখাটি কী ভাবে জায়গা পেল—এই প্রশ্ন নিজেকে আমি বহুবার করেছি। বিনয় মজুমদারকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত তিনি আমার এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি। আলোচ্য কবিতাটির 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠটিকেই আমার 'ফিরে এসো, চাকা'র পক্ষে বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় কারণ 'ফিরে এসো, চাকা'র মূলসুরের সঙ্গে এটি মিলে যায়। হয়ত-বা 'আমার ঈশ্বরীকে' সংস্করণের পাঠটিই এই কবিতার মূলপাঠ, কিন্তু এই বিষয়ে বিনয় মজুমদার কিছু না বলা পর্যন্ত আমরা নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। আলোচ্য কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত পাঠে বিনয় মজুমদার দ্রষ্টার মতো তাঁর ও তাঁর কবিতা-বলীর ভবিতব্য বর্ণনা করেছেন—

'বৃষ্টির নিমিত্ত ছিলো, এখনো রয়েছে, চিরকাল
রয়ে যাবে ; সঙ্গোপন লিপ্সাময়ী, কম্পিত প্রেমিকা—
তোমার কবিতা, কাব্য ; সংশয়ে সন্দেহে দুলে দুলে
তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে।
ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
কতিপয় চিল শুধু বলেছিলো, 'এই জন্মদিন'।

এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ
দর্শনে বিফল ব'লে ভেবেছিলো, অক্ষমের গান।
সংশয়ে সন্দেহে দুলে, একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
একদিন সচেতন হরিতকী ফলের মতন
ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, শুধু ভবিষ্যত হেসে ওঠে।
এখন সকলে বোঝে, মেঘমালা ভিতরে জটিল
পুঞ্জীভূত বাষ্পময়, তবুও দৃশ্যত শান্ত, শ্বেত'

'ফিরে এসো, চাকা'র নাম পরিবর্তন প্রসঙ্গে

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের যে কোনো সচেতন পাঠকের মনেই খুব স্বাভাবিক ভাবে যে প্রশ্নটি উঁকি মারবে সেটি হল 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পালটে 'আমার ঈশ্বরীকে' করার কারণ কী এবং 'ঈশ্বরীকে' বলতে বিনয় কী বোঝাতে চাইছেন ? পাঠকের নিশ্চয়ই খেয়াল আছে যে 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি বিনয় উৎসর্গ করেন তাঁর ঈশ্বরীকেই। —এই প্রসঙ্গে 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় নিজে কী বোঝাতে চাইছেন তা আমরা আগে দেখব।

'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে এবং ১৯৬৪ খৃস্টাব্দেই বিনয় আশ্চর্য দ্রুততার সঙ্গে তাঁর 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের তিন-তিনটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি বিষয়ে বিনয় আমার নানা প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর দিয়েছেন। আমি এখানে বিনয়ের সেই উত্তরের প্রাসঙ্গিক অংশগুলি উদ্ধার করছি :

"ঈশ্বরীর' বইখানা তোমায় ভাবিয়েছে বুঝতে পারছি। 'ঈশ্বরীর' বইখানা আমি যখন লিখি তখন আমি সত্যিই ভাবতাম যে

১) আমি ঈশ্বরীর স্বামী

২) ঈশ্বরীই বইখানা ব'লে ব'লে দিয়েছে, জানিয়ে দিয়েছে আমার চিন্তাজগতে এবং আমি লিখেছি। 'সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এই কাব্য, কবিতাসহ / ঈশ্বরীর স্বরচিত, আমি তার লিপিকার স্বামী।' —একথাতো বইতে ছাপাই আছে।......

৩) বইখানার নাম 'ঈশ্বরীর' দেবার দুটো কারণ আছে। একটা কারণ আমি আগেই লিখেছি —'সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এইকাব্য, কবিতা সমূহ / ঈশ্বরীর স্বরচিত'

দ্বিতীয় কারণটি গোপনই ছিল এতকাল। তুমি যে পরিস্থিতিতে আমার কাছে জানতে চাইছো সে পরিস্থিতিতে তোমাকে জানিয়ে দেওয়াই ভালো। বই-এর মলাটেই ছাপা

ঈশ্বরীর
বিনয় মজুমদার

এটিকে তুমি একটি বাক্য হিসেবেই গ্রহণ করো। অর্থাৎ ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার। এটা একটা বাক্য। এটা যে বইএর নাম সে কথা আপাতত ভুলে যাও। সাধারণ একটি বাক্য হিসেবেই পড়। নামপত্রেও ছাপা বাক্যটি 'ঈশ্বরীর বিনয় মজুমদার'। অর্থাৎ

বিনয় মজুমদার কার? ঈশ্বরীর। অর্থাৎ আমি তখন এমন আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক অবস্থায় প'ড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছিলাম। নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরীর হাতে সমর্পণ করেছিলাম, বাঁচবার জন্য।" দীর্ঘ এই উদ্ধৃতি একটু মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করলে বিনয় 'ঈশ্বরী' বলতে কী বোঝাতে চাইছেন তা যেন আমরা বুঝতে পারি। যেন মনে হয়, 'ঈশ্বর' বলতে সাধারণ ভাবে যা বোঝায়, বিনয় 'ঈশ্বরী' বলতে তেমনই কোনো ধারণাকে বোঝাতে চাইছেন। কিন্তু এই মনে হওয়াটা ভুল।

'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে বিনয় মজুমদারের একটি প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। আখ্যাপত্রের পিছনের পাতায় প্রচ্ছদপরিচিতিতে লেখা হয়েছে : 'প্রচ্ছদচিত্র : ঈশ্বর-ঈশ্বরীর স্বপ্রতিকৃতি / প্রচ্ছদলিপি : বিনয় মজুমদারের (ঈশ্বর ঈশ্বরীর) হস্তলিপি'। এই প্রচ্ছদপরিচিতি থেকে এ কথা জানা যাচ্ছে যে বিনয় তাঁর নিজের আঁকা নিজের ছবিকেই ঈশ্বর-ঈশ্বরীর 'স্বপ্রতিকৃতি' হিসেবে ঘোষণা করছেন এবং তাঁর হাতের লেখাকেই তিনি ভাবছেন ঈশ্বর-ঈশ্বরীর হস্তলিপি বলে। 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থটি পড়লে দেখতে পাওয়া যাবে বিনয় এই গ্রন্থে নিজেকেই ঈশ্বর ভাবছেন এবং তাঁর অন্বিষ্ট 'ঈশ্বরী'কে তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন। এই ধরনের ভাবনাচিন্তার তাৎপর্য দার্শনিক বা মনস্তত্ত্ববিদরাই ব্যাখ্যা করতে পারবেন। নিজেকে ঈশ্বর ভেবে বা 'ঈশ্বরী'কে নিজের মধ্যে কল্পনা করে মহৎ কবিতাও হয়ত রচনা করা যায়। কিন্তু 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থের কবিতার পর কবিতায় দেখি বিনয় তাঁর নিজেরই মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে তাঁর মানস-সঙ্গমের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন এবং ঘোষণা করেছেন : 'চিন্তার সঙ্কট এলে এইরূপ কথা ভাবা, দৃশ্য ভাবা নিরাপদ, ভালো / তবেই আদর ক'রে ভালোবাসে সময়, আকাশ অগ্নি, নক্ষত্রের আলো।' ('আমি আর করবী কুসুম' কবিতা, 'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত)। দেখা যাচ্ছে, বিনয় তাঁর চিন্তায় সঙ্কট আসার কথা স্বীকার করছেন এবং এই সঙ্কটের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি তাঁর নিজের মধ্যে কল্পিত ঈশ্বরীর সঙ্গে মানস-সঙ্গমে রত হয়েছেন।

'ফিরে এসো, চাকা'য় অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন কবির কোনো চিহ্নই 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। যৌন সঙ্গমের এবং শুধুমাত্র যৌন সঙ্গমেরই অনর্গল বর্ণনা থাকার ফলে 'ঈশ্বরীর' গ্রন্থটি একটি অশ্লীল এবং অপাঠ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি পড়লে যে কোনো সহৃদয় পাঠকেরই মনে হবে, বিনয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন।

'ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বিনয় মজুমদারের তরুণ বয়সের পাতাজোড়া ভারি সুন্দর একটি ফটোগ্রাফ আছে। এই ফটোগ্রাফের পিছনে কয়েকটি টেলিফোন রিসিট্-এর ফটোকপির নিচে লেখা আছে: 'Receipt of telephone calls I made to converse with my goddess-wife.' বুঝতে বাকি থাকে না মানসিক বিপর্যয়ের কোন পর্যায়ে বিনয় এই সময়ে ছিলেন। আমার নিজের ধারণা, বিনয় মজুমদারের

এই মানসিক বিপর্যয়ের কারণ অংশত 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতার মধ্যেই নিহিত। এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র মধ্যে বিনয় যে দার্শনিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা করলেই 'ঈশ্বরী' বলতে বিনয় কী বোঝাতে চাইছেন তা জানা যাবে।

'ফিরে এসো, চাকা' বাহ্যত 'প্রেমার্তির কাব্য', কিন্তু একটু গভীর ভাবে দেখলে বোঝা যায়, বিনয় তাঁর ঈশ্বর-জিজ্ঞাসাকেও এই কাব্যে প্রকাশ করেছেন।

জীবনানন্দ দাশ লিখেছিলেন :

'মানুষ কাউকে চায়, তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোন সাধনার ফল।'

(সুরঞ্জনা / বনলতা সেন)

জীবনানন্দ ঈশ্বরকে 'নিহত' হিসেবেই ধরে নিয়েছিলেন, তাই তাঁর কাব্যে ঈশ্বর বিষয়ে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা বা অন্বেষণ নেই। ক্ষুরধার, বিপদজনক এবং প্রায়শই বিধ্বংসী এই জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত চরম নাস্তিবাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবং এই জিজ্ঞাসার আগুনই বিনয় মজুমদারকে প্রায় সম্পূর্ণই পুড়িয়ে দিয়েছে।

বিনয়ের আধুনিক মন সনাতন ঈশ্বরের ধারণায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি, অথচ ঈশ্বরের অনস্তিত্বকে তিনি নাস্তিকের মতো মেনেও নিতে পারেননি খোলা মনে। চিন্তা ও চেতনায় তিনি নাস্তিক, অথচ নিজের জীবনে তিনি আস্তিকের স্বস্তি ও শান্তি কামনা করছেন। তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্বে কবি আশ্রয়হীন, গতিহীন, একা। 'ফিরে এসো, চাকা'র কবি এই জীবনের মূল অবলম্বনের মতো গতিরই (অর্থাৎ ঈশ্বরেরই) অন্বেষণ করছেন, যদিও একথা তাঁর জানা যে, যে লুপ্ত গতি উদ্ধারের জন্য তাঁর এত হাহাকার, আকুলতা—তা তিনি কোনোদিনই লাভ করতে পারবেন না। 'ফিরে এসো, চাকা'র চাকা আসলে গতির প্রতীক, লুপ্ত ঈশ্বর-বোধের প্রতীক। নাস্তিক হয়েও জীবনে আস্তিকের স্বস্তি ও শান্তি কামনা করে বিনয় আসলে সচেতন ভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছেন। সচেতন ভাবে ভুলে থাকার প্রয়াস—এই 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থ—কবিতার জগতে সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছে।

'ফিরে এসো, চাকা' গ্রন্থে কোনো এক সুদূর নিষ্ঠুর, 'শাশ্বত মাছের মতো বিস্মরণশীলা'র বিরহে কবি কাতর। সুদীর্ঘ পথ হেঁটে হেঁটে তিনি ক্লান্ত, তাঁর দু-পায়ে রক্ত, তবু বিস্মরণশীলার দেখা নেই। 'ফিরে এসো চাকা'র বহু কবিতাতেই এই বিস্মরণশীলা'র শারীরিক অস্তিত্ব প্রকট। আবার অনেক কবিতাতেই এই 'বিস্মরণশীলা'কে ঈশ্বরীর প্রতীক হিসেবে চিনতে কষ্ট হয় না :

'অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতায়
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে, বাতাসের
নীলাভতাহেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।

বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি মনোলীনা।...
বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ নড়ে—এই দৃশ্য দেখেই কখনো
সে নিজে দোলনক্ষম—এই কথা পাখীদের মতো
ভুল করে ভেবেছো কি, তোমার বাতাসে সে তো দোলে।'

আকাশের বর্ণহীনতার সংবাদের মতো কবি যাকে জেনেছেন, 'বৃক্ষের প্রত্যঙ্গ' যার বাতাসে নড়ে, সে তো রক্তমাংসের কেউ হতে পারে না! কিন্তু এই ধরনের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই কবির এমনও মনে হয়:

'দৃষ্টিবিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়তো লুপ্ত মৃত।'

যাকে 'কাল্পনিক ব'লে মনে হয়' অস্তিত্বহীনা, লুপ্ত অথবা মৃত মনে হয় তাকে খুঁজে পেতে চাইলে তো মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেবেই। নিজের এই ব্যাকুল অন্বেষণের অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতার বিষয়েও কবি পূর্ণমাত্রায় সচেতন, কারণ তিনি বলছেন:

'করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ ফোটেনি
এই শোকে ক্ষিপ্ত আমি, নাকি ভ্রান্তি হয়েছে কোথাও?'

করবী তরুতে গোলাপ ফুটবে কী করে? এই অন্বেষণের জন্য কবির মনে সুতীব্র এক মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। সীমাহীন অবিশ্বাস নিয়ে তিনি সুদূর, নিষ্ঠুর, অলীক এক মানস-প্রেমিকার প্রেমে মগ্ন হয়ে নিজস্ব এক মানসিক শান্তি খুঁজেছিলেন। মানস-প্রেমিকার জন্য এই হাহাকার ও অন্বেষণ অংশত ঈশ্বরের জন্য বিনয়ের হাহাকার ও অন্বেষণের প্রতীক। বিনয়ের প্রজ্ঞাই তাঁকে জানিয়েছিল—তাঁর এই অন্বেষণের ফল শূন্য। তীব্র অনুভূতিশীল বিনয় সম্ভবত এই নিষ্ফল অন্বেষণের ফলেই তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন।

নিজস্ব অভিজ্ঞতার বিশ্বে তাঁর ঈশ্বরীকে খুঁজে না পেয়ে বিনয় শেষ পর্যন্ত নিজেকেই একই সঙ্গে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলে ঘোষণা করেন' ঈশ্বরীর' কাব্যগ্রন্থে। এবার প্রশ্ন হল: তিনি নিজেই যদি ঈশ্বর হন এবং ঈশ্বরী যদি তাঁর ভিতরেই অবস্থান করেন তাহলে 'ফিরে এসো, চাকা'র ব্যাকুল ও হাহাকারময় অন্বেষণের অর্থ কী? বোঝা যায়, নিজের বিক্ষুব্ধ মনকে শান্ত করতেই বিনয়ের এই জোড়াতালি। বিনয় তাঁর 'বিস্মরণশীলা'কে 'ফিরে এসো, চাকা'য় যুক্তিসঙ্গত ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। যে নেই যেন তারই জন্য 'ফিরে এসো, চাকা'য় অন্বেষণ করা হয়েছে, অপেক্ষা করা হয়েছে। এ যেন 'করবী তরুতে সেই আকাঙ্ক্ষিত গোলাপ' ফুটবে বলে অপেক্ষা করা। ঈশ্বরীকে অর্থাৎ 'বিস্মরণশীলা'কে নিজের মধ্যেই কল্পনা করে নিয়ে বিনয় তাঁর অযৌক্তিক অন্বেষণকে যুক্তিসিদ্ধ করতে চেয়েছেন। 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী যেন তাঁর নিজের মধ্যকার ঈশ্বরীকেই নিবেদিত। তাই 'ফিরে এসো, চাকা'র নামটি পরিবর্তন করে বিনয় করেন 'আমার ঈশ্বরীকে'। 'ফিরে এসো, চাকা' নামটি পালটে কেন 'আমার

ঈশ্বরীকে' করা হয়েছিল এবং কেনই বা আবার 'আমার ঈশ্বরীকে' নামটি পালটে 'ফিরে এসো, চাকা' করা হয় ? আমার এ প্রশ্নের জবাবে বিনয় আমাকে লিখেছেন : "'ফিরে এসো, চাকা'র নামটি পালটে কেন আমি 'আমার ঈশ্বরীকে' করেছিলাম তার কারণ সোজা। তখন আমি আর্থিক, সামাজিক রাজনৈতিক এমন অবস্থায় পড়েছিলাম যে আমি ঈশ্বরীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। ধরো ঈশ্বরী স্বয়ং আমার নাম পালটে মূল নাম 'ফিরে এসো' চাকা' করেছেন।"

ফিরে এসো, চাকা : কলকাতা সংস্করণ

'আমার ঈশ্বরীকে'র পরে 'ফিরো এসো, চাকা'র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন মীনাক্ষী দত্ত, ৯ পঞ্চানন ঘোষ লেন, কলকাতা-৯ থেকে। প্রকাশের তারিখ : ১লা মার্চ, ১৯৭০ খৃস্টাব্দ ; দাম : তিন টাকা। কলকাতা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠে গ্রন্থজগৎ সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র পাঠ দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে।

'ফিরে এসো, চাকা'র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশের সময়, জ্যোতির্ময় দত্ত বিনয় মজুমদার সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন রচনা ও প্রকাশ করেন। কোনো কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এত ভালো বিজ্ঞাপন বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন রচিত হয়নি। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই বিজ্ঞাপনটির কথা সোনার অক্ষরে লিখে রাখা উচিত। নিচে এই বিজ্ঞাপনটি হুবহু পুনর্মুদ্রিত করা হল। বিজ্ঞাপনটির শেষ পংক্তিতে লেখা হয়েছে : 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ'। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' কিন্তু কলকাতা সংস্করণে প্রকাশিত হয়নি, এটির প্রকাশক : অরুণা বাগচী, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগল কিশোর দাশ লেন, কলকাতা-৬, গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮১ বঙ্গাব্দের, শ্রাবণ মাসে।

'বিনয় মজুমদার

....

ফিরে এসো, চাকা

এই কবিতাগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়
সাত বছর আগে। বিশাল পাঠকসমাজ যদিও
এটির অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না, বাংলা কবিতার সবচেয়ে
অগ্রসর পাঠক ও ওয়াকিবহাল পর্যবেক্ষক মহলে 'ফিরো এসো, চাকা'
এই কয় বছরে একটি গুপ্ত ক্লাসিকের স্থান ক'রে নিয়েছিলো। অবশ্য
এমনকি এই সব মহলেও এর খ্যাতির ভিত্তি ছিলো প্রধানত কল্পনা,
জনশ্রুতি ও কবির জীবন-বিষয়ে কিংবদন্তি, বইটির প্রথম সংস্করণ খুঁটিয়ে
পড়া তো দূরের কথা, এমনকি হাতে ধরার, এমনকি চোখে দেখার
সৌভাগ্যও মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র রসিক, অন্তরঙ্গ, অধ্যবসায়ী ও
অনুসন্ধিৎসু পাঠকের হয়েছে। ফলে, 'ফিরো এসো চাকা'
গ্রন্থে কেবল এক সংকীর্ণ গোষ্ঠীর ছিলো অধিকার।

বর্তমান কলকাতা-সংস্করণ এই গুপ্ত, ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থটিকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'ফিরে এসো, চাকা' কেবল কোনো ক্ষুদ্র, ভূগর্ভস্থ গোষ্ঠীর গোপন সম্পদ নয়, তা বাংলা কবিতার প্রধান ধারারই এক অর্ধচক্রাকার বাঁক। 'ফিরে এসো, চাকা', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কি 'অর্কেস্ট্রা'-র তুল্য গ্রন্থ। এবং এর কবি কেবল জীবিত নন, তিনি বাংলা কবিতার অমরদের একজন।

কলকাতা-সংস্করণে

বিনয় মজুমদার-এর কবিতা গ্রন্থ

*

ফিরে এসো, চাকা তিন টাকা

অঘ্রানের অনুভূতিমালা যন্ত্রস্থ'

ফিরে এসো চাকা : অরুণা সংস্করণ

কলকাতা সংস্করণের পর প্রকাশিত হয় 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণ। প্রথম অরুণা সংস্করণের আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা নিচে দেওয়া হল :

'প্রথম অরুণা সংস্করণ / অগ্রহায়ণ ১৩৮৩ / প্রকাশিকা / অরুণা বাগচী / ৭ যুগল কিশোর দাস লেন / কলকাতা-৬ / প্রচ্ছদপট / পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় / মুদ্রক / দুর্গাপদ ঘোষ / শ্রীঅরবিন্দ প্রেস / ১৬ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রিট্ / কলকাতা-৬ / © বিনয় মজুমদার'

জুলাই ১৯৯০ খৃস্টাব্দে 'ফিরে এসো, চাকা'র অরুণা সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম অরুণা সংস্করণে কয়েকটি মুদ্রণ প্রমাদ ছিল। গুরুতর একটি মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছিল ৭৩ নম্বর কবিতার প্রথম লাইনে। 'যাক, তবে জ্ব'লে যাক, জলস্তম্ভ ছেঁড়া ঘা হৃদয়' লাইনের 'ছেঁড়া ঘা' এর জায়গায় ছাপা হয়েছিল 'ছেঁড়া যা'। অরুণা সংস্করণের দ্বিতীয় মুদ্রণে প্রথম সংস্করণের ভুলগুলি শুধরে দেওয়া হয়নি, তাছাড়া নতুন মুদ্রণ প্রমাদও কিছু ঘটেছে ; সবথেকে উল্লেখযোগ্যটি হল : ২১ নম্বর কবিতার 'বিকাশের রীতিনীতি এই।' অংশটি হয়েছে 'বিকাশের রাজনীতি এই।'

ঈশ্বরীর কবিতাবলী

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' বিনয় মজুমদারের স্বতন্ত্র কোনো কাব্যগ্রন্থের নাম নয়। এই গ্রন্থে বিনয় তাঁর ইতিপূর্বে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে বিভিন্ন কবিতা সংকলিত করেছেন, তাছাড়া পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'অধিকন্তু'র ১০টি কবিতাও এই গ্রন্থে আছে। নিচে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র আখ্যাপত্রের পিছনের পাতা উদ্ধৃত করা হল :

"'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'র কপিরাইট ধারক : বিনয় মজুমদার / প্রথম প্রকাশের তারিখ : ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ / ৩১শে জুলাই, ১৯৬৫ / প্রকাশক : দেবকুমার বসু / ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট্, / কলকাতা-১২ / মুদ্রক : নির্মল কৃষ্ণ পাল। নির্মল মুদ্রণ / ৮ ব্রজদুলাল স্ট্রিট, / কলকাতা-৬ / মূল্য ২.০০ টাকা।'

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' ছাপা হয়েছে খুব সাধারণ ব্রাউন পেপারে, বই বিক্রির সময় বই বিক্রেতারা সাধারণত এই কাগজেই বই মুড়ে দেন।

এই গ্রন্থে 'আমার ঈশ্বরীকে' এবং 'ঈশ্বরীর' তৃতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া, এই গ্রন্থে 'নক্ষত্রের আলোয়' থেকে ৭টি এবং 'অধিকন্তু'র প্রথম ১০টি কবিতা গৃহীত হয়েছে। 'অধিকন্তু' কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের, ১৭ই সেপ্টেম্বর।

'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলিকে পংক্তিতে বিন্যস্ত করে মুদ্রিত করা হয়নি, মুদ্রিত করা হয়েছে গদ্যের মতো সম্পূর্ণ লাইন জুড়ে। দুটি লাইনের ভিতর পার্থক্য বোঝাবার জন্য '/' —এই চিহ্নটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে বিনয় কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন।

'ফিরে এসো, চাকা' : বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ সংক্রান্ত একটি উল্লেখপঞ্জী :

'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণে নানা কবিতায় বিনয় পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। বিনয় আমাকে জানিয়েছেন, 'ফিরে এসো, চাকা'র গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠই 'ফিরে এসো, চাকা'র প্রকৃত পাঠ। নিচের উল্লেখ-পঞ্জীটিতে 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হল। উল্লেখপঞ্জীতে শুধুমাত্র পরিবর্তিত / বর্জিত পংক্তি / পংক্তিগুলির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যাক।—

'ফিরে এসো, চাকা'র ১৬ নম্বর কবিতাটির বিষয়ে উল্লেখপঞ্জীতে লেখা হয়েছে : "১৬ নম্বর কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই। এই কবিতার শেষ লাইন : যেন কোনো নিরুদ্দেশে, কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে। [আ. ঈ ও ঈ. ক]" এখানে বুঝতে হবে 'ফিরে এসো, চাকা'র ১৬ নম্বর কবিতায় 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি 'আমার ঈশ্বরীকে' ও 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে বর্জন করা হয়েছে এবং শেষ লাইন, 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে ইটের মতোন ফেলে রেখে' 'আমার ঈশ্বরীকে' ও 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে ; 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে।' কবিতার বাকি অংশ সর্বত্রই এক।

এই উল্লেখপঞ্জীটিকে ব্যবহার করতে গেলে অরুণা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাগুলিকে ১, ২, ৩, ৪...এইভাবে সংখ্যায়িত করে নিতে হবে। অরুণা সংস্করণের 'ফিরে এসো, চাকা' বাজারে প্রচলিত হওয়ায় এই সংস্করণের পাঠটিকেই মূল পাঠ ধরে নিয়ে উল্লেখপঞ্জীটি প্রস্তুত করা হয়েছে। 'গায়ত্রীকে' গ্রন্থের যে সব পরিবর্তন 'ফিরে এসো, চাকা'য় করা হয়েছিল সেগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

পরিবর্তিত/বর্জিত পংক্তি/পংক্তিগুলির উল্লেখপঞ্জী

নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্তকগুলি উল্লেখপঞ্জীতে ব্যবহার করা হয়েছে : গ্র. স. = গ্রন্থজগৎ সংস্করণ আ. ই. = আমার ঈশ্বরীকে, ঈ. ক. = ঈশ্বরীর কবিতাবলী, ক. স. = কলকাতা সংস্করণ।

কবিতার স্তবকবিন্যাসের ক্ষেত্রে 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, তবে, এই পার্থক্যগুলির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ছাপার ভুলকে সর্বত্রই অগ্রাহ্য করার চেষ্টা হয়েছে।

৩ নং কবিতার শেষ লাইন : 'অতি অল্প রমণীতে ক্রোড়পত্র দেওয়া হয়ে থাকে।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৮ নং কবিতার ৪ নং লাইন : 'প্রেমিক-প্রেমিকা চায় এই সাধনায় লিপ্ত হতে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.] এবং ১২ নং লাইন : 'ক্রমে ক্রমে মুক্তো হয়ে···' [গ্র. স. ও ক. স].

১৬ নং কবিতার 'সেই কোন্ ভোরবেলা ইটের মতোন চূর্ণ হয়ে' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই। এই কবিতার শেষ লাইন : 'যেন কোনো নিরুদ্দেশে কটাক্ষের মতো ফেলে রেখে' [আ. ঈ. ও ঈ ক.]

১৮ নং কবিতার ১১ নং লাইন : '··· অবশেষে দেখি সুখ নয়···' [ঐ. ঐ.]

১৯ নং কবিতার তৃতীয় লাইন : 'ধূমকেতু প্রকৃতই অগ্নিময়···' [গ্র. স. ও ক. স.]

২১ নং কবিতার ৯ নং লাইন : 'এখন জেনেছি বহু,···' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

২২ নং কবিতার ৭ নং লাইন : 'সকল জীবন, ফুল, সব কীর্তি, প্রীত কীর্তিগুলি / ধ্বংস হয়ে যেতে পারে···' [ঐ. ঐ.]

২৩ নং কবিতার ৫ নং লাইন : 'ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের লম্ফে শূন্যে দিক পরিবর্তনের' [ঐ. ঐ.] এবং শেষ লাইন : 'কিছুটা সময় দিলে তবে প্রাণে সব ভেসে ওঠে' [ঐ. ঐ.]

২৪ নং কবিতার ৫-৬ লাইন : 'যদিও সংবাদ পাও জ্যোতির মাধ্যমে প্রতিদিন, / জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে এতেই সান্ত্বনা।' [ঈ. ক.]

'যদিও সংবাদ পাবে, পেয়েছো বেতারে প্রতিদিন, / জেনেছো অন্তরলোক, দূরে থেকে, এতেই সান্ত্বনা।' [আ. ঈ.]

'জ্যোতির মাধ্যমে' স্পষ্টতই জ্যোতির্ময় দত্তকে ইঙ্গিত করছে।

২৫ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'তোমার প্রসঙ্গে আসি, অতীতের কীর্তি সহায়ক' [ঈ. ক.]

২৬ নং কবিতার প্রথম চার লাইন :

'তিন পা পিছনে হেঁটে উন্মোচিত হয়ে ফিরে আমি।
আবার তোমার কথা মনে আসে, জ্যোতিষ্ক বহুল
আকাশেই এসে দ্রুত চ'লে যাওয়া ধূমকেতু যেন
সর্বদা স্মরণে আসো, প্রেয়সী, পূর্ণাঙ্গ জীবনের' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৭ নং লাইন : 'উন্মোচিত হয়ে ফিরি, অজ্ঞাত পূর্ণাঙ্গ জীবনের' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

২৭ নং কবিতায় ৯ নং লাইন : 'অদর্শনে ম'রে গেছে, বর্তমানে কিছু আলোকিত' [ঐ ঐ.]
এই কবিতার 'বেদনার্ত মোরগের নিদ্রাহীন জীবন ফুরালো' লাইনটি অ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে বর্জন করা হয়েছে।
১০ নং লাইন : 'জীবনে ব্যর্থতা থাকে, অসম্পূর্ণ মেঘমালা থাকে' [গ্র. স. ও ক. স.]
২৮ নং কবিতার প্রথম লাইন দুটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই।
৩০ নং কবিতার ৬ নং লাইন : 'ভাবী ইলোরার চিত্র, হরিণের মাংসের মতোন' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.] এবং শেষ দুটি লাইন : 'তবে গুহাচিত্র হতে তোমার সম্মতি আছে ব'লে মনে হয়, তুমি—নারী, নিঃসন্দেহে দীর্ঘায়ু, সফল।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৩১ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'বিরহিত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন' [ঐ. ঐ.] চতুর্থ লাইন : 'এত উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন সুরুচি' [ঈ. ক.] 'এত উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন শঠতা' [গ্র. স. ও ক. স.]
৩৩ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'দেহের উপর শীতল ভ্রমের চলা বুঝে' এবং চতুর্থ লাইন : 'হে ভ্রম, বোঝোনি তুমি, দেহ কি না, কার দেহ, প্রাণ' [ঈ. ক.]
৩৪ নং কবিতার ৯-১০ লাইন : 'যে গেছে সে চ'লে গেছে, অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে। আপন অন্তরলোকে…' [ঈ. ক.] 'দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে বারুদ ফুরায় যেন' অংশটি ঈ. ক.-তে নেই।
৩৬ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'ধূসর, ধূসরতর, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে,' অষ্টম লাইন : 'ঝ'রে গেলে অকস্মাৎ, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে' এবং শেষ লাইন : 'তুমি নিজে ঝ'রে গেছো, শুধু ভবিষ্যৎ হেসে ওঠে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক] এই কবিতাটি নিয়ে একটু আগে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।
৩৮ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই
৪১ নং কবিতার অষ্টম লাইন : পোড়া ইঁট, ভগ্নপ্রায় পুতুলের অবয়ব, বুক [গ্র. স. ও ক. স.]
৪২ নং কবিতার চতুর্থ লাইন : আমাকে ডাকে না কেউ নিরলস প্রেমের প্রসারে [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
এই কবিতার ৫-৬ লাইন :
'পুনরায় বিলম্বিত, এতকাল কুসুম কলিকে
ফোটাতে অক্ষম হয়ে শেষে দেখি কাগজে রচিত।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
অষ্টম লাইন : 'খুঁজেছি সংগত হ্রদ, দেশে দেশে, হায় অনাহত' [গ্র. স. ও ক. স.]
৪৬ নং কবিতার পঞ্চম লাইন : 'বিধ্বস্ত সময়ে, তবে আমারো তো পদদ্বয় আছে' এবং সপ্তম লাইন : 'নিজের সশস্ত্র শোভা, উলঙ্গ অবস্থা নিয়ে আর' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৪৭ নং কবিতার শেষ লাইন : 'প্রেমিকা ও প্রেমিকের অভীপ্সার রোমাঞ্চ জানে কি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]। 'লতারা কীভাবে বোঝে কাছে কোনো মহীরুহ আছে' লাইনটি

আ. ঈ.-তে নেই, সম্ভবত ভ্রমবশত বাদ গেছে।

৪৮ নং কবিতার 'উৎপাটিত রুগ্ন বৃক্ষ আর কোনো গান গায় না যে / শিকড়ের থেকে তবু নতুন অঙ্কুর অভ্যুদিত'—এই অংশটি এবং 'আমি বৃক্ষ, রোগশয্যা-পরিত্যক্ত টিপয়ের মতো / জীর্ণ ধূলিময় ম্লান। সলিল সমৃদ্ধ সিন্ধু নয়'—এই অংশটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে বর্জিত হয়েছে। এই কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'এমন আগ্রহ হীন, চ'লে গেছো পার্কের আশ্রয়ে' [গ্র. স. ও ক. স.]

৪৯ নং কবিতার প্রথম লাইন: 'একটি বৎসর শুধু লাস্যময়ী অগ্নির সহিত', এবং ৬-৭ লাইন :

'মথিত ঐশ্বর্য নিয়ে দেখি কবেকার অসুস্থতা

পৃথিবী ঘিরেছে দ্যাখো, উদ্ঘাটিত করেছি নিঃস্বতা' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

'রোগের সময়ে কোনো শুশ্রূষা পাবার বিত্ত নেই' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে বর্জিত হয়েছে।

৫০ নং কবিতার ষষ্ঠ লাইন : 'মনে নেই গোধূলিতে, সুসঙ্গীত অবশিষ্ট নেই' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫১ নং কবিতার অষ্টম লাইন : হৃদয় বেড়ায় বহু ভবনে উদ্যানে নানা ক্ষণে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]। এই কবিতার শেষ তিনটি লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই। অর্থাৎ কবিতাটি পূর্বোক্ত গ্রন্থদুটিতে অষ্টম লাইনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

৫২ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'অতি সফলতা নয়, আকাশের কৃপাপ্রার্থী আমি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]। চতুর্থ লাইন : নিমন্ত্রণ পত্র পাই প্রেরকের ঠিকানাবিহীন [ক. স.]

৫৩ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'প্রচেষ্টার সীমা আছে, নিরাশ্রয় রক্তাপ্লুত হাতে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]।

ষষ্ঠ লাইন : 'পৃথিবী নিয়ম বশে নির্বিকার, ধূসরতাবৃত' [ক. স.]

৫৪ নং কবিতার ৫-৬ লাইন :

'ঝরে কিছু, ঝরে স্মৃতি, রহস্য নিলীনা অপসৃতা,

আলিঙ্গন থেকে দূরে, আরো দূরে অবরুদ্ধ নীড়ে।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫৫ নং কবিতার শেষ লাইন : 'নিজের সখিকে পেতে, পৃথিবীর কথা সে ভাবে না' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫৬ নং কবিতার ১২ নং লাইন : 'হেঁটেছি সুদীর্ঘ পথ, রক্তাক্ত দু পায়ে…'[ক. স.]

৫৭ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'কোনো যোগাযোগ নেই, সেতু নেই, মিলনাঙ্ক নেই' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]

৫৮ নং কবিতার ষষ্ঠ লাইন : 'টীকা ও টিপ্পনীমাত্র, পরিচয় গভীর তোমার' [ঐ. ঐ.]

৫৯ নং কবিতার দ্বিতীয় লাইন : 'কেবলই বালুকা ওড়ে, গর্বোন্নত পিপাসা বাড়ায়' [ঐ. ঐ.] এবং পঞ্চম লাইন : 'শুনেছি সভার মাঝে একটি কুসুম ঘ্রাণময়' [গ্র. স. ও ক. স.]

৬১ নং কবিতার শেষ লাইন : 'উৎসুক হবে না কেউ চিন্তনীয় দেবতার শবে' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.] এবং ষষ্ঠ লাইন : 'তার দুষ্ট ব্যবহারে, মুহুর্মুহু কাদা, ইতিহাস' [ক. স.]
৬২ নং কবিতার ১-২ লাইন :
'সুস্মিতা গুলিটি মনে বিদ্ধ হয়ে বহুকাল ছিলো
সনাতন মূল কেটে, গবেষণা ক'রে সুস্থ হই।' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৬৬ নং কবিতার ৫-৬ লাইন :
'বিকৃত করেছে ; হায়, পিপীলিকা শ্রেণীতে দুজনে / ব্যথার মতোন হয়ে অনেক হেঁটেছি অন্ধকারে।' [ঐ. ঐ] এই কবিতার 'আর আমি বারংবার অসফল, ক্ষমতাবিহীন' লাইনটি আ. ঈ. ও ঈ. ক. তে নেই।
এই কবিতার ১২ নং লাইন : 'সঙ্গিনীর অভ্যন্তরে ক্ষুধার মতোন সঙ্গোপন' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৬৭ নং কবিতার ৩-৪ লাইন :
'জ্যোৎস্নায় অনুনয়, হায় এই মিলন সন্ধান।
আবৃত দূরত্বময়ী নীহারিকা, ক্লিস্ট গ্রহগুলি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক]
এই কবিতার ৭, ৮ এবং ৯ নং লাইনগুলি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৬৯ নং কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই। এই কবিতার ৪-৫ লাইন :
'সে শান্তি অমেয় তৃপ্তি আমাদের হৃদয়ে প্রেমের
মূলে আছে, আছে ফলে, মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
—অর্থাৎ এই কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে শুরু হচ্ছে এভাবে :
'তোমাদের কাছে আছে সঙ্গোপন, আশ্চর্য বদ্বীপ।
সে শান্তি, অমেয় তৃপ্তি আমাদের হৃদয় প্রেমের
মূলে আছে, আছে ফলে, মধ্যবর্তী অবকাশে প্রাণ…'
৭০ নং কবিতার প্রথম লাইন : 'আমার আশ্চর্য ফুল যেন সুকিশোরী, নিমেষেই' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
এই কবিতার ৯-১৩ লাইন :
'আমি চিরমুগ্ধ হয়ে দৃশ্য দেখি, দেখি জানালায়
আকাশের লালা ঝরে বাতাসের আশ্রয়ে-আশ্রয়ে।
কেন যেন দূরে আছো, ফিরে এসো, ফিরে এসো, ফুল
হাসি হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো অবয়বহীন' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭১ নং কবিতার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই। ঐ দুটি গ্রন্থে কবিতাটি আরম্ভ হচ্ছে : 'ভালোবাসি পূর্বাহ্নেই রূপে, ঘ্রাণে রসাপ্লুত হতে। / হয়েছি তো কোনো কালে একবার হীরকের চোখে…'

সপ্তম লাইন : 'উদ্বৃত্ত এদের প্রতি তাকাবো উদ্যত বাসনায়' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭২ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৭৩ নং কবিতার পঞ্চম লাইন : 'সুমিষ্ট আহ্বান, ছায়া মেঘ, ঝঞ্ঝা, সোনালি বিদ্যুৎ' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭৪ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৭৫ নং কবিতার ১-২ লাইন :
'কবিতা বুঝেছি আমি, অন্ধকারে একটি আশ্রয়
অলৌকিক আলো দেয়, নিরুত্তাপ কোমল আলোক' [আ. ঈ. ও ঈ. ক.]
৭ নং লাইন :
'করবী কুসুমও বলে, লম্বিত গভীর হয়ে গেলে' [ঈ. ক.]
১২ নং লাইন :
'শুয়ে শুয়ে আকাশের অনন্তের সায় পেতে পারি' [আ. ঈ. ও ঈ. ক]
৭৬ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে নেই।
৭৭ নং কবিতার প্রথম দুটি লাইন আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে বর্জিত হয়েছে। এই কবিতার ৩-৪ লাইন :
'আড়ালে থেকো না, আমি এতদিনে চিনেছি কেবল
অপার ক্ষমতাময়ী হাতখানি, ক্ষিপ্র হাতখানি' [ঈ. ক.]
শেষ লাইন :
'আড়ালো থেকো না আর একা ঘুমোবার সাধ নিয়ে' [ঈ. ক.]
উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ৭৭ নং কবিতাটি আ. ঈ. ও ঈ. ক.-তে শুরু হচ্ছে 'আড়ালে থেকো না আমি, এতদিনে চিনেছি কেবল'—এই লাইনটি দিয়ে।

উল্লেখপঞ্জীটি পড়লে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে 'ফিরে এসো, চাকা'র বর্তমান অরুণা সংস্করণের সঙ্গে গ্রন্থজগৎ সংস্করণ বা কলকাতা সংস্করণের উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে প্রকাশিত সংস্করণে বা 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী'তে গৃহীত 'আমার ঈশ্বরীকে'র পাঠে যে সব পরিবর্তনগুলি ঘটানো হয়েছিল তা যথেষ্ট গুরুতর। এই পরিবর্তনগুলি ঘটিয়ে বিনয় মজুমদার 'ফিরো এসো, চাকা'র রহস্যময়তাকে খুন করেছিলেন, বড়ো বেশি প্রকাশে এনে ফেলেছিলেন কবিতাগুলির অন্তর্নিহিত গোপনীয়তাকে। বলাই বাহুল্য, এই পরিবর্তনগুলির অধিকাংশই প্রীতিপদ হয়নি। খুব সংগত কারণেই বিনয় পরবর্তীকালে এই পরিবর্তনগুলিকে বাতিল করেন এবং 'ফিরে এসো, চাকা'র কলকাতা বা অরুণা সংস্করণে আবার গ্রন্থজগৎ সংস্করণের পাঠ ফিরে আসে। মনে প্রশ্ন জাগে : কেন বিনয় মজুমদার 'আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থে এই পরিবর্তনগুলি ঘটিয়েছিলেন? এর উত্তরে বলা যায় এই পরিবর্তনগুলি করার সময় অর্থাৎ ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে বিনয় গভীর ও জটিল এক মানসিক সঙ্কটের মধ্যে পড়েন যার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ 'ফিরে এসো,

চাকা'র কবিতায় এই পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়। একটু আগে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

এই প্রবন্ধের শেষে বিনয় মজুমদারের কবি-প্রতিভার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়টির কথা উল্লেখ করি। বিনয় 'ফিরে এসো, চাকা'র ৩১-সংখ্যক কবিতায় ('প্রত্যাখাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন') নিজেকে আগ্নেয়গিরির সঙ্গে তুলনা করেছেন। বিনয়ের কবি প্রতিভার চরিত্রও আগ্নেয়গিরির মতন। আগ্নেয়গিরির মতোই বিনয়ের কবি প্রতিভা অধিকাংশ সময়েই নিদ্রিত থাকে, জেগে ওঠে কদাচিৎ ; কিন্তু এই জাগরণ বিস্ময়করভাবে সৃষ্টিশীল। 'নক্ষত্রের আলোয়' রচনাকালীন প্রস্তুতিপর্বের কথা বাদ দিলে ১৯৬০ থেকে ১৯৯২—এই সময় সীমার মধ্যে বিনয়ের কবি-প্রতিভা জেগে উঠেছে মাত্রই দু-বার, তাও খুব অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু বিনয়ের কবি-প্রতিভার এই দুটি ক্ষণস্থায়ী জাগরণই বাংলা ভাষাকে উপহার দিয়েছে দু-দুটি মহামূল্যবান কাব্যগ্রন্থ। প্রথমবারের জেগে ওঠাটি কিছু কম, ২৮ মাস স্থায়ী এবং এই সময়ের উদ্গিরণ 'ফিরে এসো, চাকা'র কবিতাবলী। দ্বিতীয় ও শেষ বারের জন্য বিনয়ের কবি-প্রতিভা মাত্র একমাসের জন্য জেগে ওঠে এবং তার ফলে আমরা পেয়েছি 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'। 'নক্ষত্রের আলোয়' 'ফিরে এসো, চাকা' এবং 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'—এই তিনটি কাব্যগ্রন্থের কথা বাদ দিলে বিনয়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থগুলি প্রতিভার স্পর্শহীন এবং নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। 'ফিরে এসো, চাকা' ও 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র মধ্যবর্তী সময়ে বিনয় প্রকাশ করেন 'ঈশ্বরীর' (১৯৬৪) এবং 'অধিকন্তু' (১৯৬৭)। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র পরে প্রকাশিত হয় 'বাল্মীকির কবিতা' (১৯৭৬), 'আমাদের বাগানে' (১৯৮৫), 'আমি এই সভায়' (১৯৮৫) এবং 'এক পংক্তির কবিতা' (১৯৮৮)। দু-একটি স্মরণযোগ্য পংক্তি বা দু-একটি পাঠযোগ্য কবিতা এই কাব্যগ্রন্থগুলির ভিতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও—এ কাব্যগ্রন্থগুলি ব্যর্থ কবিতা এবং অকবিতায় ভরে আছে। মহৎ প্রতিভার এ-এক আশ্চর্য চরিত্র !

'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে আলোচনা শেষ হল। যেহেতু এই প্রবন্ধের বেশির ভাগটাই তথ্য-কণ্টকিত, সেহেতু এই আলোচনা রসকষহীন হয়ে পড়েছে। একই কাব্যগ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ নিয়ে আলোচনা করার ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুনরুক্তিকেও এড়ানো যায়নি। বলাই বাহুল্য, এগুলো ঘটেছে আমারই অক্ষমতার জন্য। তবু আমার এই আলোচনায় 'ফিরে এসো, চাকা'র বিভিন্ন সংস্করণ বিষয়ে পাঠকদের কৌতূহলকে যদি সামান্য পরিমাণেও নিবৃত্ত করতে পেরে থাকি তো নিজেকে ধন্য মনে করব। □

বিনয়কে

জ্যোতির্ময় দত্ত

১। ব্যক্তি

বিনয় মজুমদার-এর কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ষাটের দশকের শুরুতে কোনও এক লিটিল ম্যাগাজিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'ফিরে এসো, চাকা'-র আড়াই পৃষ্ঠার এক রিভিউ-এ তিনটি কি চারটি উদ্ধৃতির বিদ্যুৎ চমকে।

'তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে যার ভূমিতে দূরে-দূরে
চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা।'

যে-যার ভূমিতে দূরে-দূরে আমরা সকলেই। শুধু বৃক্ষ নয়। বিনয় মজুমদারের কবিতার বিষয় সেই ব্যবধান, বিচ্ছিন্নতা, শূন্যতাবোধ ও মিলনেচ্ছা যা ফরাসী দার্শনিক পাস্কালের একটি সূক্তে আছে :

'আমি অনন্ত মহাকাশের কথা ভাবি, এবং ভয় পাই সেই সব অসীম
বিস্তারের ধারণায় যেখানে আমার অস্তিত্বের ধারণাটুকু পর্যন্ত নেই।'

শক্তির রিভিউ পড়ে, মাটিতে বন্দী বিচ্ছিন্ন গাছের মতো, আমারও বিনয়কে দেখার শ্বাস-রোধী কথা মনে এল। কবিতার এমনই ক্ষমতা! কত দূর-দূর থেকে ভেসে আসা পংক্তির শিমুল তুলো বীজিত করে বন্দী, নির্বাসিত মন!

তখন আমার নির্বাসন ইংরিজি দৈনিক 'দ্য স্টেটসম্যান'-এর নিউজ ডেস্কে। এক বিকেলে, পেয়াদাদের বাধা অগ্রাহ্য করে, মলিন গিঁট দেওয়া পাৎলুন ও ঢোলা, ছেঁড়া জামায় আমার সামনে এক বিস্ময়কর মূর্তি হাজির। এই নেটিভ সমুদ্রে তখনও স্টেটসম্যান এক সাজানো-গোছানো শ্বেতাঙ্গ দ্বীপ। তার মধ্যে তো বটেই, কিন্তু এই ধুলোর কলকাতার পথেও, বস্তুত পৃথিবীর সর্বত্রই, ওই মূর্তি বেমানান। কাপড়জামা পাগলের কি ভিখিরির, কিন্তু চোখের দৃষ্টি দেবদূতের। আর আগন্তুকের হাসি ?

'মুকুরে প্রতিফলিত সূর্যালোক স্বল্পকাল হাসে।'

তথাকথিত মানসিক বৈকল্যের মেঘ বিনয়ের মাউন্ট পালোমার-এর দূরবীনের চেয়েও ক্ষমতাশালী চৈতন্যের আয়নাকে অধিকাংশ সময় ঝাপসা করে রাখে। সেই মেঘ চিরে এক ফালি আলো ওই বিকেলে হেসেছিল।

'শুনলুম, আপনি আমাকে খুঁজছেন ? আমি বিনয় মজুমদার।'

আমি ডেস্ক ছেড়ে উঠে, তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম।

ততদিনে আমি এক কপি 'ফিরে এসো, চাকা' সংগ্রহ করেছি। তাতে ৮ই মার্চ, ১৯৬০, থেকে ২৯শে জুন, ১৯৬২-এর মধ্যে—কোনও ঘুমন্ত গিরির তিন-চারবার অগ্ন্যুৎপাতের মতো—কয়েকটি অবিশ্বাস্য-ঝলকে লেখা ৭৭টি কবিতা আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। এই মহাকবি সশরীরে আমার কারাগারের গরাদ ঝাঁকা দিলেন। কাজে তুড়ি মেরে,

মেঘের উপর ভাসতে-ভাসতে, সেকালের চৌরঙ্গী রেস্তরাঁয় পৌঁছলাম। মনের ভোজ তো হলই, কাটলেট-চপ-চা ইত্যাদিও চলল।

তারপর থেকে বিনয়ের জীবনের সুতোর সঙ্গে আমার সুতোর কখনও গিঁট বেঁধেছে, কখনও গেছে ছিঁড়ে, কখনও তাঁতের মাকুর মতো ঘটনার এপাশ-ওপাশ আমাদের একেবারে একসঙ্গে বুনে দিয়েছে, কখনও সমুদ্রের ঝড়ে পালের মতো ফ্যাঁশ করে দিয়েছে ছিঁড়ে। এটা খুব স্বাভাবিক যে কখনও-কখনও বিনয় আমাকে তাঁর শত্রু মনে করতেন, বিশেষত যখন তাঁকে জোর করে হাসপাতালে ভর্তি করে দিতুম। প্যারানইয়া যখন তাঁকে অধিকার করত, তিনি আমাকে তাঁর কবিতা ও গণিত চুরি করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে অভিযুক্তও করেছেন। যখন আমাদের ব্রড স্ট্রিটের বাড়িতে তিনি থাকতেন, আমার সর্বংসহা দুই আশ্রয়কে—মা ঊষা এবং স্ত্রী মীনাক্ষীকে—তিনি এমন উৎপাত করেছেন যে তাঁরা বিনয়ের প্রতি শুধু নয়, আমার প্রতিও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবু, তাঁরা ক্ষমা শুধু করেননি, সেবাও করেছেন। কে না কত করেছেন! অমিয় দেব তাঁর ছাদের ফ্ল্যাটে দিয়েছেন মাসের পর মাস আশ্রয়। তিনি ও সুবীর রায়চৌধুরী তাঁর ভর্তি ও দেখাশোনা করেছেন সরকারপুল হাসপাতালে। লুম্বিনীতে তাঁর চিকিৎসায় সাহায্য করেছেন সন্তুল্য ডঃ মৃণাল বড়ুয়া, যাঁর নিজের কাহিনী কোনও বোধিসত্ব জাতকের হতে পারত। গোপনে কখনও-কখনও বিনয়ের ব্যয়ভার বহনে অর্থসাহায্য করেছেন সমর সেন। এইসব লিখছি কারণ, যদিও কবিতার কথা এটা নয়, এটা জীবনের বৈচিত্র্য ও ঘনত্বের প্রমাণ। বিনয়ের নিজের ভাইয়েরা যেমন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন ঠাকুরনগরের গাঁয়ের মানুষ।

আমাদের সমাজ বড় এলোমেলো, এমন কোনও সংগঠন কি প্রতিষ্ঠান নেই যে একজন প্রতিভাবান অসহায়ের ভার নেবে। ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত চেষ্টায় কয়েকটি সংকট কাটানো গিয়েছিল বটে কিন্তু যদি যত্ন, সাহচর্য ও সৌন্দর্য দিয়ে তাঁর সারাটা সৃজনশীল জীবন ঘিরে রাখা যেত তবে শুধু বাংলা ভাষাই নয়, মানবসভ্যতাই উপকৃত হতো। কারণ বিনয় মজুমদার অনন্য। আমরা বাস করি সমতলে, আমাদের জন্য ইউক্লিড, বিনয়ের জ্যামিতি আলাদা। তা পঞ্চমাত্রিক। তাঁর গণিতের কিছু বোঝার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু যেমন রামানুজের বেলায় এখন হচ্ছে, কে জানে, ২১ শতকের কোনও বিচক্ষণ কম্পিউটার বিনয় মজুমদারের সলিউশন ও সিকোয়েন্স পরম্পরার শুদ্ধতা অক্লেশে করে দেবে না প্রমাণ? আমি কেবল তাঁর কবিতার কিছু-কিছু বুঝেছি। আমার বিচারে তাঁর স্থান কোথায় তা বোঝাবার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আমেরিকায় প্রবাসকালে এশিয়া সোসাইটির তৎকালীন প্রকাশন-প্রধান শ্রীমতী বনি ক্রাউন আমার কবিতার একটি ইংরিজি অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব করেন। আমি হেসে ফেলেছিলুম। বলেছিলাম, যে কবিতা লেখার জন্য আমার জন্ম, যা জগৎকে দেখানোর একটুও ইচ্ছে আমার হতে পারে, তার প্রথম পংক্তিও এখনও আমি লিখিনি। কিন্তু যাঁর কবিতার সঙ্গে ইংরিজির মধ্য দিয়ে মানবজাতির পরিচয় ঘটানো আমার স্বপ্ন তাঁর

নাম বিনয় মজুমদার। এশিয়া সোসাইটির বৃত্তি পেয়ে আমি বিনয়ের ৪০টি কবিতার অনুবাদ করেছিলাম যার কিছু-কিছু ট্রাইকোয়ার্টার্লি, হাডসন রিভিউ, ইত্যাদি বিখ্যাত কাগজে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু কর্ণাটিক নৌকো কিংবা মরিচঝাঁপির মতোই, 'কাম ব্যাক, ও হুইল' বইটিও ছিল অভিশপ্ত।

মাঝদরিয়ায় নৌকোডুবির জন্য কুখ্যাত জ্যোতির্ময় দত্তের ট্র্যাক-রেকর্ড ছিল প্রকাশক সংস্থাটির অজানা, তাই সোৎসাহে পাণ্ডুলিপিটি যে অভাগা মার্কিন পাবলিশার মনোনয়ন করেন, সেই সংস্থাই উঠে যায়, এবং শ্রীমতী ক্রাউন কিছুতেই আর ম্যানুস্ক্রিপ্ট উদ্ধার করতে পারেননি। কিন্তু ওই অক্ষম ভাষান্তরেও বিনয়ের কবিত্ব কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার একটা হৃদয়বিদারক প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম। আমার অভিজ্ঞতায় যে ভারতীয় যুবক ছিল ইংরিজি ভাষার সবচেয়ে সম্ভাবনাময় লেখক, যার গায়ের রঙ ছিল খরমুজের ভেতরটার মতো আর যার অন্তর ছিল স্বপ্নময় ও বিশুদ্ধ, কিছুটা শেলি আর কিছুটা বিবেকানন্দ, যার জন্ম টোকিয়োতে এবং শিক্ষা কেম্ব্রিজে, সেই ধীরেন ভগৎ বিনয়ের অনুবাদ পড়ে, বিলেত থেকে কলকাতায় এসে খুঁজে-খুঁজে বার করেছিল আমাকে, এবং পুজোয় বাঙালি-সাজে প্রতিমা দর্শনের অভিলাষে কিনেছিল পাঞ্জাবি এবং ধুতি। ঋষি কি দেববালকের রূপে ও পবিত্রতায় লজ্জা দেওয়া ধীরেন দিল্লিতে ইংলন্ডের বিখ্যাত এক কাগজের প্রতিনিধি হয়ে এসেছিল, এবং জীবনরসে উপচে আমাদের পুরো পরিবারকে নিমন্ত্রণ করেছিল বড়দিনের ছুটিতে রাজধানীতে। নতুন গাড়ি কিনেছে। বাড়িটা লোদি গার্ডেনের পাশেই। দিল্লির আবহাওয়া তখন নাকি ইতালির বসন্ত। কয়েকদিন পরেই কাগজে দেখলাম, এক ইস্পাতের বর্গাবোঝাই লরির সঙ্গে তার গাড়ির ধাক্কায়, এই ধুলোর পৃথিবীতে তার মেয়াদ কাটিয়ে ধীরেন সুরলোকে ফিরে গেছে। ধীরেনের বাবা-মা এখন কোথায় জানি না। কিন্তু সেই থেকে তার জন্য আমার ব্যথা ও শূন্যতাবোধ জানাবার বাহন খুঁজছিলাম। ব্যবধান ও ইন্দ্রিয়াতীত সম্পর্কস্থাপনের কবি বিনয় মজুমদারকে উদ্দীষ্ট এই শব্দস্তবকে ধীরেনের জন্য একটি ঘাসফুল গুঁজে দিলাম।

২। কবিতা : প্রথম পর্ব

ব্যক্তি ও বিশ্বের মধ্যে বিচ্ছেদ—এটা তো সব আধুনিক শিল্পেরই মর্মকথা। তাহলে বিনয় অন্য কবিদের থেকে ভিন্ন কিসে? ভিন্ন এই বিচ্ছেদবোধের তীব্রতায়। ভিন্ন তাঁর চিত্রকল্পে। 'ফিরে এসো, চাকা' বাহ্যত একজন ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে বিচ্ছেদের কবিতা। 'চাকা' হচ্ছে 'চক্রবর্তীর' অপভ্রংশ। এই কবিতামালা গায়ত্রী চক্রবর্তী নামের এক রক্ত-মাংসের সত্তার উদ্দেশ্যে রচিত বলে কবি একদা দাবি করতেন। কিন্তু পরে অন্য নামও উৎসর্গে ব্যবহার করেছেন, এবং শেষ পর্যন্ত, বিচ্ছেদ প্রকৃতপক্ষে কার সঙ্গে তা গ্রন্থের পরিবর্তিত নামেই স্বচ্ছ : 'ঈশ্বরীর' জন্য।

জর্মান কবি, নাট্যকার ও ভাবুক শিলার তাঁর এক বিখ্যাত রচনায় প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যের পৃথক লক্ষণরূপে ব্যক্তি ও প্রকৃতির মধ্যে এই ছেদ, এই ব্যবধান, এই

বিরুদ্ধতাকেই নির্দেশ করেছিলেন। সভ্যতার ছেলেবেলায়—হোমার কি বাল্মীকির কালে—মানুষ প্রকৃতির কোলে শুয়ে, তাঁর স্তনবৃন্তে মুখ রেখে—অচ্ছেদ পান করেছে সুধা। সেই অপাপবিদ্ধ যুগের শিল্পকে শিলার আখ্যা দিয়েছিলেন 'নাইভ'—'সরল'। পরবর্তী যুগের শিল্প 'সেন্টিমেন্টাল' অনুভূতিময় ও অভিমানাহিত। 'ব্যক্তি' হওয়া মানেই জননীর সঙ্গে নাড়িচ্ছেদ। আধুনিক মানুষ প্রকৃতির ক্রোড় থেকে বহিষ্কৃত। আগে প্রত্যেক ঝর্ণা, পর্বত, নক্ষত্র মানুষের সঙ্গে কথা বলত। সহবাস করত। এখন তারা দূর, হৃদয়হীন, বিজাতীয়।

'জরায়ু ত্যাগের পর বিস্তীর্ণ আলোকে এসে শিশু
সৃষ্টির সদর্থ বোঝে, নিজস্ব পিপাসা, ক্ষুধা পায়।
অন্ধকার সীমা ছেড়ে চেয়ে দ্যাখে, আরও পরিসীমা
আকাশের নীলে, চাঁদে, নক্ষত্রের আহ্বানে নিহিত।'

এই বিচ্ছেদবোধ ক্রমে তীব্র হতে-হতে কখনও উথলে উঠেছে বিলাপে, কখনও পরিণত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বে কি ঘৃণায়। শিবনারায়ণ রায় এই আধুনিক বিচ্ছেদানুভূতির নাম দিয়েছেন 'পারক্য'। ইংরাজিতে যাকে বলি 'অ্যালিয়েনেশন'। 'আমি' হচ্ছি একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। বাকি সব কিছু হচ্ছে 'অপর'। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যেই আমাদের সকল কান্না। কিন্তু ওই 'অপর' শেষ পর্যন্ত অপ্রবেশ্য, অজ্ঞেয়, মানবের সব আকুতিমিনতিতে প্রতিক্রিয়াহীন। বের্টল্ট ব্রেশট-এর কবিতায় তাই বারংবার প্রার্থনা কি বিলাপের প্রতি বিদ্রূপ। সৌরলোক, ছায়াপথ, দ্বীপ—ব্রহ্মাণ্ডের পর দ্বীপ—ব্রহ্মাণ্ড পার হয়ে যাক ভয়েজারের চেয়ে কোটিগুণ শক্তিমান মহাকাশ যান, কোথাও পাবে না আমাদের এত ব্যাকুল প্রার্থনার উদ্দীষ্ট পরম স্নেহময় ঈশ্বরের, কিংবা বিনয়ের 'ঈশ্বরী'র দর্শন, এই 'ঈশ্বরী' কখনও প্রেমিক, কখনও মাতা, যে তাঁকে 'অবৈধ সন্তানের মত' ফেলে গেছে পথে।

'কী বিস্মিত বেদনায় একা-একা কেঁদে ফেরে শিশু।
অজীর্ণ, তোমাকে নিয়ে আর কতো গান গাওয়া হবে ?
এতোকাল চলে গেলো, তবু মাঝে-মাঝে বাতায়ন
খুলে দেখি, মহাশূন্যে গোয়েন্দার মতো জোনাকিরা
জ্বলে নেভে, জ্বলে নেভে তৃষ্ণা নিয়ে এরূপ খেলায়
কতোকাল চলে গেলো ; মরণের মতো ক্লান্তি আসে।'

আধুনিক কবিতা এই অজীর্ণের, প্লীহার গান। বিনয় 'মরণের মতো ক্লান্তি'কে জয়ের চেষ্টায় শেষের দিকের কবিতায় যা করেছেন তা, আমার উপলব্ধিতে, পয়ারবদ্ধ স্বমেহন, নয়তো সৃষ্টির সঙ্গে একত্বের হার্দিক প্রয়োজনের কাছে যুক্তির নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। কিন্তু বিনয়ের প্রথম পর্বের কবিতায় সংশয় ও বিশ্বাসের, নাস্তি ও অস্তির মধ্যে তুলার কাঁটা এ-মেরু ও-মেরু করে। অপর 'তুমি' কি বাস্তব ? হয়ত তোমাকে না-দেখতে পাওয়াই তোমার সান্নিধ্যের সবচেয়ে বড় প্রমাণ ? কিংবা তোমাকে পুরোটা পাচ্ছি না,

তা নৈরাজ্য কি বেনিয়ম কিছু নয়, তা বিশ্বনিয়মেরই অধীন কোনও মহাজাগতিক ঘটনা ! সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মন ভালো নেই' বইয়ের একটি কবিতায় শিবনারায়ণ চিহ্নিত ঐ পারক্যবোধ যথেষ্ট আছে, কিন্তু কবি তা হালকা জলরঙে এঁকেছেন, বিনয়ের যেখানে ভাষা জ্যামিতিক। সুনীল 'ক্ষণিকের কৌতুক' পানে তুষ্ট, বিনয়ের 'মরণের মতো তৃষ্ণা'। সুনীলের 'বাসনা আমার' কবিতার শেষ আট লাইন :

'আমি কেউ নই সম্মিলিত এ সুরে
যারা কাছে ছিল তারা আজ বহু দূরে
টেলিপ্রিন্টারে ছিন্নভিন্ন পৃথিবী
সকলেই বলে কী দিবি, কী দিবি, কী দিবি ?
বাসনা আমার, হে মর্ত্য লোভী বাসনা,
তুমি কি এখনো নিরালায় ভালোবাসো না
পান করে যেতে ক্ষণিকের কৌতুক ?
সাথী কেউ নেই ? আয়নায় কার মুখ ?'

সুনীলের ছন্দের মন্দিরায় আমরা মোহিত। কিন্তু বিনয়ের চিত্রকল্প উপমা নয়, তা যেন বিজ্ঞান। নিচের কবিতায় একটিও লাইন নেই যাতে শিল্পের সেই সব কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে যার—মাদকপ্রভাবে আমরা অসতর্ক হয়ে যাই, অলীক জেনেও কবির অভিপ্রেত স্রোতে নিজেদের ভাসিয়ে দিই। সমালোচকেরা যাকে বলেন 'মোমেন্টারি সাসপেনশন অফ ডিজবিলিফ' তার যেন কোনই প্রয়োজন নেই এই কলাবিজ্ঞান ও গণিত-সাধকের। এটা প্রেমের কবিতা ? না তীব্র ধর্মবিশ্বাসের ? এটা কি ধাপ-ধাপ যুক্তির পাথর বসানো অটল পিরামিড ? নাকি কয়েকটি বরফের কিউব—যা একটু চিন্তার তাপেই গলে যাবে ? এখানে উপস্থিতি লুকোচুরি খেলছে অনুপস্থিতির সঙ্গে। তুমি নেই ? তুমি কি তেমনই নেই 'অগণন কুসুমের দেশে' যেমন নেই নীল গোলাপ ? কিন্তু এই না-থাকাটা হয়ত তোমার থাকারই প্রমাণ ? এমনকি চন্দ্র-সূর্যও তো কখনও-কখনও মনে হয় নেই। পূর্ণগ্রাস গ্রহণের সময়। যা দিয়ে আমরা এত রঙ দেখি, সেই নিজের চোখের মণির তো রঙ আমরা দেখি না ? তোমার অনুপস্থিতিই তোমার নৈকট্যের প্রমাণ। মাত্র ১০টি লাইন, কিন্তু বৃত্তসংহার কাব্যের চেয়ে দীর্ঘ এর রেশ, এমনকি রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কিংবা 'যেতে নাহি দিব' কবিতার চেয়েও বিস্তার এর বেশী।

'আর যদি নাই আসো, ফুটন্ত জলের নভোচারী
বাষ্পের সহিত বাতাসের মতো নাই মেশো,
সেও এক অভিজ্ঞতা, অগণন কুসুমের দেশে
নীল বা নীলাভবর্ণ গোলাপের অভাবের মতো
তোমার অভাব বুঝি ; কে জানে হয়তো অবশেষে
বিগলিত হতে পারো ; আশ্চর্য দর্শন বহু আছে—

নিজের চুলের মৃদু ঘ্রাণের মতন তোমাকেও
হয়তো পাই না আমি, পূর্ণিমার তিথিতেও দেখি
অস্ফুট লজ্জায় ম্লান ক্ষীণ চন্দ্রকলা উঠে থাকে,
গ্রহণ হবার ফলে, এরূপ-দর্শন বহু আছে।'

আগেই বলেছি 'ফিরে এসো, চাকা' একটি শান্ত সবুজ পাহাড়ের চূড়া উড়ে যাওয়ার মতো আকস্মিক বলে প্রথমে মনে হয়। এবং কবি নিজেই জানিয়েছেন যে এই ভূগর্ভের অগ্নি-উৎক্ষেপণের কারণ 'প্রত্যাখ্যাত প্রেম'।

'প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে-আত্মলীন।
অগ্নি উদ্বমন করে এ-গহ্বর ধীরে-ধীরে তার
চারিদিকে বর্তমান পর্বতের প্রাচীর তুলেছে।
এতো উচ্চে সমাসীন আজ তার আপন শঠতা,
যাতে সমতলবর্তী প্রজাপতি, পাখিদের রঙ
তার কাছে নিরর্থক ; এমন সমস্যা কী আমি।
দূরে যাও মেঘমালা, তোমাদের দৌত্যে, আলিঙ্গনে
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না !
আমি যাবো দেশান্তরে যেখানে ফুলের মুক্তি আছে।
বৃষ্টি, ঢেউ, ত্যাগ করে রসে পুষ্ট শিল্প পেতে পারি
বর্তমানে, চারিপাশে পর্বতের প্রাচীর আসীন।
আমি আর ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সাগরের ক্রোড়ে তো যাবো না।'

প্রেমে তো অনেকেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু 'অসহ ধিক্কারে' অন্য কেউ তো এরকম ঝলকে-ঝলকে কবিতা উৎক্ষেপণ করেন না ? রবীন্দ্রনাথের ধাপে-ধাপে বিবর্তন আমরা দেখতে পাই। 'যে আঁধার আলোর অধিক' এ পৌঁছতে বুদ্ধদেব বসুকে দ্রৌপদীর শাড়ি-র কত না ভাঁজ খুলতে হয়েছে, ভাঙতে হয়েছে কবিতার কত ঘোরানো সিঁড়ির ধাপ! এমনকি জীবনানন্দেরও গেছে নজরুল-মোহিতলাল পর্ব। কিন্তু বিনয় মজুমদারের যেন কোনও প্রস্তুতি নেই! 'ফিরে এসো, চাকা' যেন মহাকাশ থেকে পড়া— বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রক্ষিপ্ত—একটি উল্কাখণ্ড। প্রথম কবিতার প্রথম লাইনেই বিনয় তাঁর নিজস্ব ভাষা, সুর, ছবির মালিক :

'একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো—এই স্মিতদৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ক রক্তিম হ'লো ফল।...'

এটার তারিখ ৮ মার্চ ১৯৬০। পরেরটি ২৬শে আগস্ট। দ্বিতীয় কবিতার শেষ ৭ লাইন :

'সুস্থ মৃত্তিকার চেয়ে সমুদ্রেরা কতো বেশী বিপদসঙ্কুল
তারো বেশী বিপদের নীলিমায় প্রক্ষালিত বিভিন্ন আকাশ,
এ সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লাগে ব'লে।
তবুও কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু,
মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'

তৃতীয় লেখাটি হল ২৬ দিন পর—২১শে সেপ্টেম্বর। পরেরটা ১১ই অক্টোবর। ১৪ই অক্টোবর। ১৫ই অক্টোবর। সময়ের ব্যবধান কমে আসছে। তাল-লয় ক্রম দ্রুত হচ্ছে। তারপর, অকস্মাৎ বিরতি। নয় মাসের। 'ফিরে এসো, চাকা'-র অষ্টম কবিতার তারিখ ১৫ই জুন, ১৯৬১। এই পর্বে কোনও-কোনও দিন—যেমন ২৬ ও ২৭ শে জুন—দু-দুটি কবিতা বিনয়ের ফার্নেস থেকে বেরিয়ে এসেছে, একেবারে নিখাদ, বুদবুদ কি ভস্ম নেই, যেন শিল্প নয়, নগ্ন প্রকৃতি। প্রত্যেকটি কবিতা যেন 'রচিত' নয়, তা সমুদ্রের তল থেকে ঢেউয়ের আবর্তে তটে ফেলে যাওয়া। কিন্তু, যদিও 'সকলপ্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া' মানুষের স্বভাব, সকলের জ্বরতপ্ত মাথা এক প্রক্রিয়ায় চলে না। বিনয়ের মাথার ভেতরের সফটওয়্যার কী ছিল তখন? সফটওয়্যারটা বাংলা কবিতা, যার মেমারিতে স্পষ্টতই জীবনানন্দের পুরোটা ঠাশা। কিন্তু সার্কিট্রি? সেটা বিজ্ঞানের। প্রথম দিকের কবিতায় দুটি স্তর আলাদা করা যায়। যেমন নিচের আট লাইনে প্রথম তিন এবং শেষ পংক্তির লেখক বি. ই. কলেজের ইঞ্জিনিয়ারিঙে ফার্স্ট ক্লাস, ৪,৫ ও ৬ লাইন বিলকুল জীবনানন্দ ; আর সপ্তম লাইন নির্ভেজাল বিনয় মজুমদার।

'তাঁবুর ভিতরে শুয়ে অন্ধকার আকাশের বিস্তার দেখেছি,
জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বলতম তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন, আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশাবোধে, অবক্ষয়ে, ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা—কীটদষ্ট নষ্ট খোসা শাঁস।
হে ধিক্কার, আত্মঘৃণা, দ্যাখো কী মলিনবর্ণ ফল।
কিছুকাল আগে প্রাণে, ধাতুখণ্ডে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল।
আলোকসম্পাতহেতু বিদ্যুৎসঞ্চার হয়, বিশেষ ধাতুতে হয়ে থাকে।'

সব শিল্পেই রেওয়াজ লাগে। পিয়ানোতে আঙুল খুলতে কারও লাগে বহু বছর, কারও বা মাস! বিনয়ের ক্ষেত্রে লেগেছিল নয় মাস। ২৭শে জুন ১৯৬১ বাংলা কবিতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ। সেদিন যে-দুটি কবিতা বিনয় লিখেছিলেন, তার একটি থেকে :

'অমল প্রত্যুষে
ঘুম ভেঙে দেখা যায়, আমাদের মুখের ভিতরে
স্বাদ ছিলো, তৃপ্তি ছিলো যেসব আহার্য তারা পচে
ইতিহাস সৃষ্টি করে ; সুখ ক্রমে ব্যথা হয়ে ওঠে।

পাঁচদিন পরে, ১লা জুলাই, তিনি আরোহণ করলেন বাংলা কবিতার এক শিখরে :

'সময়ে ভেবেছিলাম সম্মিলিত চায়ের ভাবনা,
বায়ুসেবনের কথা, চিরন্তন শিখরের বায়ু।
দৃষ্টি বিভ্রমের মতো কাল্পনিক ব'লে মনে হয়
তোমাকে অস্তিত্বহীনা, অথবা হয়ত লুপ্ত, মৃত।
অথবা করেছো ত্যাগ, অবৈধ পুত্রের মতো, পথে
জীবনের কথা ভাবি, ক্ষত সেরে গেলে পরে ত্বকে
পুনরায় কেশোদ্গম হবে না, বিমর্ষ ভাবনায়
রাত্রির মাছির মতো শান্ত হয়ে রয়েছে বেদনা—
হাসপাতালের থেকে ফেরার সময়কার মনে।
মাঝে-মাঝে অগোচরে বালকের ঘুমের ভিতরে
প্রস্রাব করার মতো অস্থানে বেদনা ঝরে যাবে।'

৩। কবিতা : পরবর্তী পর্ব

ব্যাখ্যা করে এরকম বহু-স্তর, বহু-মাত্রিক কবিতায় অনুপ্রবেশ করার রোমাঞ্চ থেকে পাঠককে বঞ্চিত করব না, তবে এটা উল্লেখ না-করে পারছিনা যে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর যেমন পুরুষ, তার আখ্যা স্বামী, কি রাজার দুলাল, কি জীবনদেবতা, বিনয়ের ক্ষেত্রে সেই স্থান নারীর—প্রেমিকা, জননী, ঈশ্বরী। রবীন্দ্রনাথের মতো, তাঁরও প্রেম ও পুজোয় মেশামেশি। প্রভেদ, রবীন্দ্রনাথের মিলনেচ্ছা যখন রথের চাকার ধুলো ও ফুলের গন্ধে মেশা, বিনয়ের পরবর্তী রচনা প্রায় তন্ত্রসাধকের মতো, তা কামুকের, এবং কোনও-কোনও কবিতা স্রেফ পর্নোগ্রাফি বলে মনে হতে পারে। যেমন 'চাঁদ' সিরিজ। সঙ্গমের ব্লো-বাই-ব্লো অ্যাকাউন্ট। এগুলি কবিতা ? না পর্নোগ্রাফি ? বিনয়ের পুরো মানসিক মানচিত্রের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, এটা নির্ভেজাল 'পর্নো' বলে ভ্রম হতে পারে। সন্দেহ জাগতে পারে, কবিতায় স্থায়ী রোমাঞ্চ নয়, এটা কেবল করে সাময়িক যৌন উত্তেজনার সঞ্চার।

'চাঁদের গুহার দিকে
চাঁদের গুহার দিকে নির্নিমেষে চেয়ে থাকি, মেঝের উপরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে চাঁদ, প্রকাশ্য দিনের বেলা, স্পষ্ট দেখা যায়
চাঁদের গুহার দিকে চেয়ে থাকি, ঘাসগুলি ছোটো করে ছাঁটা।
ঘাসের ভিতর দিয়ে দেখা যায় গুহার উপরকার ভাঁজ।

গুহার লুকানো মুখ থেকে শুরু হয়ে সেই ভাঁজটি এসেছে
বাহিরে পেটের দিকে। চাঁদ হেঁটে এসে যেই বিছানার উপরে দাঁড়ালো
অমনি চাঁদকে বলি, 'তেল লাগাবে না আজ' শুনে চাঁদ বলে
'মাখব নিশ্চয়, তবে একটু অপেক্ষা করো' বলে সে অয়েল ক্লথ নিয়ে
পেতে দিল বিছানায়, বালিশের কিছু নিচে, তারপর হেঁটে চলে গেলো…'

এটি স্পষ্টতই কোনও 'বাস্তব' অভিজ্ঞতার বর্ণনা—যদিও নারীটিকে বিনয় 'চাঁদ' রূপে অভিহিত করেছেন ('ফিরে এসো, চাকা'-য় জ্যোৎস্না হচ্ছে প্রেমের প্রতীক)। অয়েল ক্লথ, তাক, বাঁ হাতে তেল—এগুলি হচ্ছে বাস্তবের অনুপুঙ্খ, চিত্রকল্প নয়। অ্যালেন গিন্সবার্গের 'পাগল' সঙ্গী, পিটার অলোভস্কিকেও, এইভাবে দেখেছি নিউইয়র্কে, ওই অঞ্চলের নারীদের দ্বারা ষাঁড় হিসেবে ব্যবহৃত হতে। 'পাগল'দের সঙ্গে সঙ্গমে সামাজিক দায়িত্ব নেই—একটা বিপদ ছাড়া। বিনয়ের মস্তিষ্কের হার্ডওয়ার পয়ারে বাঁধা, যে-কোনও সফটওয়ার, যে-কোনও অভিজ্ঞতাই ৮।৬।৪ কিংবা ততোধিক মাত্রায় প্রসেস করে তা বার করে দেয়। কিন্তু এগুলি কি কবিতা? জানি না। কিন্তু এটাও জানা দরকার, প্রকাশের যোগ্য শুধু নয়, বিশেষভাবে পঠিতব্য ও আলোচিতব্য। যে-কবি ওই চিরন্তন শিখরের বায়ু সেবন করেছেন, তিনি কেন কোনও এক বা একাধিক গ্রাম্য নারীর ধর্মের ষাঁড়ের ভূমিকা পালন করবেন? কেন নয়? কেউ কি সৃষ্টির রহস্যে মৈথুনের চেয়ে শক্তিশালী কোনো প্রবেশিকা আবিষ্কার করতে পেরেছেন। এখানে 'ধর্মের' শব্দটি সচেতনভাবে চয়িত। শিমুলপুরের আগাছা ও জঙ্গলে ঘেরা নির্জন বাড়িতে কখনও পুকুরের নিশ্চুপ বকের মতো একপায়ে ধ্যানস্থ, কখনও কাঠঠোকরার মতো মাথা ঠুকছেন, কখনও বিড়বিড় করছেন ফুলের দিকে তাকিয়ে যে সমাজ-পরিত্যক্ত মানুষ, তিনি ঈশ্বরীর সঙ্গে এইভাবেই যোগ খুঁজছেন। একবার 'ধাতুখণ্ডে যে সুনির্মল জ্যোৎস্না পড়েছিল' তাই আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে 'চাঁদ'।

'পৃথিবী, ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখী—সবার জীবনী লেখা হলে,
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেতো বেশ।
আমার ব্যথা, প্রস্তাব, প্রয়াস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেতো।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে…'

এটা কি পাগলের ভ্রান্তি? নাকি পাস্কালের হাহাকারের উত্তর? হয়ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই 'একটি জীবন মোটে'? এই সমুদ্র-মেঘ ঘেরা, উদ্ভিদ-কীট-স্তন্যপায়ী প্রাণীময় পৃথিবী যে সামগ্রিক সত্তার শরীরে একটি কোষাণুকোষ মাত্র? যেমন রক্তের কোটি-কোটি শ্বেতকণিকার কাছে আমাদের শরীর একটি বিশাল জগৎ, বহির্বিশ্ব থেকে হানাদার এলে যাদের প্রতিহত করতে শ্বেতকণিকা বাহিনী সশস্ত্র অগ্রসর হয়। আমার শ্বেত-কণিকাগুলি কি জানে আমি কে? আমার মস্তিষ্কে যে রাসায়নিক কণাগুলির নিক্ষেপ সেই সেই বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করে যাকে আমি বলি 'চিন্তা', 'বার্তা', 'ভালোবাসা',

'ঈশ্বরানুভূতি', 'কাম' - সেই কণাগুলির কি আমার বিষয়ে আছে কোনও সম্যক বোধ কি ধারণা ?

বিনয়ের প্রতিপাদ্য সারবান ; একেবারে হালের কণাবিজ্ঞান থেকে শুরু করে উপনিষদে আছে তার সমর্থন। আমার আক্ষেপ শুধু যে বিনয়ের কবিতায় নেই আর সেই বিদ্যুৎগর্ভ উপমা-মেঘের চমকানি। তা নিরস বর্ণনা কি ঘোষণামাত্র। নেই সেই কবিত্বের ডায়নামো-উৎপাদিত বিদ্যুৎ যার দ্বারা ঠান্ডা অ্যালুমিনিয়মের কেবল পরিণত হয় হাজার ভোল্টের লাইভ ওয়্যারে। বিনয়ের কবিতার পংক্তি এখন মৃত লাইন—যাকে কোনওমতে টানটান ধরে রেখেছে পয়ারের পাইলন। □

অন্তর্জগতের কবিতা—'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'

সুতপা ভট্টাচার্য

বাইরের জগৎ আর ভিতরের জগৎ—যে-কোনো মানুষই হয়ত এই দুই জগতের অধিবাসী, কিন্তু সকলের বাঁচায় এই দুই জগতের মাপ সমান নয়। আজ, বিশ শতকের শেষের এই সভ্যতাবিশ্বে, অধিকাংশ মানুষের কাছে বাইরের জগৎ-ই প্রধান, এমনকি একমাত্র, অন্তর্জগতের অস্তিত্বও টের পায় না অনেকে। পিঁপড়ের মতো সারি বেঁধে যারা বস্তু-আহরণে ব্যস্ত, এ ওকে ঠেলে যারা এগিয়ে চলেছে, কিংবা পথ করতে পারছে না প্রাণান্ত প্রয়াস করে চলেছে—তাদের কাছে বাইরের জগতের মাপ অনেক বড়ো, বাইরের জগতের দাবি অনেক বড়ো। যে-কোনো শহরে যে-কোনো গ্রামে তারাই সংখ্যাগুরু, তারাই জনতা বা জনতার পিতা।

কেউ-কেউ শুধু জানে অন্তর্জগতের সন্ধান, কারো-কারো কাছে অন্তর্জগৎটাই প্রধান, কারো কাছে বা একমাত্র। বাইরের জগৎ আমাদের চলা-ফেরার আমাদের আচরণের নির্দিষ্ট নিয়মানুসারিতা দাবি করে, অন্তর্জগতের মানুষের কাছে সে নিয়মানুসারিতা অর্থহীন। তার কাছে বাস্তবের তাৎপর্যই ভিন্ন। ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে রাতের স্বপ্ন অধিকাংশই ভুলে যাই আমরা, যদি বা মনে থাকে—জানি, তার মানে হয় না কোনো। ঠিক তেমনই, ঘুমের জগতে প্রবেশ করি যখন, তখন দিনের যা-কিছু, সবই মনে হয় ভুল, অর্থহীন। তাহলে কী করে বলব, বহির্জগতের বাস্তবই ঠিক, আর অন্তর্জগতের বাস্তব ভুল ?

অন্তর্জগতের এই বাস্তবতার কথাই পাই বিনয় মজুমদারের কবিতায় :

> 'হে কেশর, হে পরাগ, আমাদের চারিপাশে পরিকীর্ণ' এই
> বাস্তবের মতো হয়ে, বাস্তব-বিশ্বের মতো হয়ে আমাদের
> ......
> মানসনেত্রের এক বিশ্ব আছে মানসের বিশ্বও বাস্তব।
> যত বেশি স্পষ্ট করে মানসনেত্রের মাঝে কল্পনাকে দেখি
> ঠিক তত স্পষ্ট এক বাস্তব প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি হয়ে থাকে।
> মানসনেত্রের দেখা দৃশ্যই এ-বাস্তবের দৃশ্যাবলী হয়,
> সেই হেতু এ-অঘ্রান আমাদের জননের প্রকৃষ্ট সময়।'

'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' থেকে উদ্ধৃত এই পংক্তিগুলি, যে বইকে বলা যায় অন্তর্জগতের কবির এক ভাবনা-দলিল—বিনয় মজুমদারের মতো একজন অন্তর্জগতের কবির। অন্তর্জগতের বাস্তবতা যে কবিমাত্রেরই নির্ভর, তা বলা চলে না মোটেই। অধিকাংশ কবির অধিকাংশ কবিতাতেই বহির্জগতের দখলদারিই প্রধান। সমাজ-বাস্তবতার কবিতা, রাজনৈতিক কবিতা বহির্জগতের অভিজ্ঞতাকেই মূর্ত দেয়। এমন কবিতা-বই কমই

পড়েছি, যেখানে বহির্জগৎ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেই বিরল বইয়েরই একটি 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'।

'ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম ?' এই সুধিত প্রশ্ন রেখেছিলেন এই কবি 'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে। সে বইতে, নামেই প্রমাণ, নির্দিষ্ট এক মানবী রয়েছেন ভালোবাসার আলম্বন। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বইতে পঞ্চশর দগ্ধ হয়ে সারা বিশ্বপ্রকৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে যেন—বিশ্বপ্রকৃতিতে, তা যে-ভাবে মুকুরিত সেই মানসনেত্রে ! তাঁর অন্তর্জগতের অভিক্ষেপেই গড়ে-ওঠা এই প্রকৃতিলোক।

ক. 'কী সুন্দর এ-নিসর্গ, মিলে-মিশে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়েছে
কেশর, পরাগ, ফুল, পাতা, জলপাই গাছ, জোছনা, ছায়া সেতু'।

খ. 'ক্রিসেনথেমাম ফুল—ফুলে-ফুলে একাকার ভোরের কেয়ারি ;
একটি নিটোল গোল পরিধিতে পড়ে আছে শীতের রোদ্দুরে।
জন্মমরণের কথা ভুলে গিয়ে আদরের কথা ভুলে গিয়ে
এর পাশে ব'সে পড়ি, অনেক রকম সব রঙের নিকটে'।

গ. 'অরুন্ধতী তারাটিকে খুব বেশি ভালোবাসি যদিও সে অঙ্গিরার চেয়ে বেশ ছোটো আকারে সে খুব বেশি ছোটোই তো, তবু এই ঘ্রাণময় অরুন্ধতী বেশি ভালো লাগে।'

ঘ. 'দেখা যায় একা-একা অঘ্রানের জোছনায় আমি ও বকুল,
বকুলের ফাঁকটির চারধারে সরু-সরু পাপড়ি ছড়ানো
অতি সোজা সাদা কথা যেন অবশিষ্টরূপে প'ড়ে আছে তবু—
তবু এ তো ডাল নয়, তবু এ তো পাতা নয়, এ হ'লো বকুল।'

তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনায় প্রায়শই যে জড়িয়ে থাকে যৌন-ইশারা, সে বিষয়ে কবি যথেষ্টই সজাগ। তিনি জানেন তিনি 'অন্ধকারে চোখ খুলে সবচেয়ে ভালোভাবে' দেখেন : যৌনাঙ্গের 'একক একাধিপত্য' কবি মেনে নেন, মেনে নেন 'অবচেতনার রূপ'। সেই অবচেতনার রূপের নিরর্গল উৎসার এ কাব্যের অনেকখানি জুড়ে থাকে ঠিকই, কিন্তু সবটা জুড়ে নয়। শুধুই অবচেতনা নয়, কখনো বা কবির 'সচেতনতা যেন অতিচেতনার সমপরিমাণ হয়ে যায়'। অন্ধকারের পাশাপাশি থাকে আলোর কথা : 'আঁধারের নিচে শুয়ে আরো আলো খুঁজে যেতে এত ভালো লাগে'। কবি নিজেই জানেন তাঁর কাব্যে—

'উভয় চেতনা যেন সমান কুশলী হয় সমান সক্ষম হয়ে যায়
দুই চেতনার মাঝে যোগাযোগ ব্যবস্থাটি যেন খুব স্বচ্ছলতা পায়।'

সেই অতিচেতনার দীপ্তিতে কবি অনুভব করতে পারেন আপন সত্তার দীর্ঘ প্রসারণ—বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত এক কায়া, এমনকি নিজেই যেন 'একা এই আলো, ব্যোম ও সময়।' সেই অতি-চেতনাই তো সুদূরের টান : 'কোনো সুদূরের টানে এত বিচলিত হই, উন্মাদিত হ'য়ে উঠি আমি'। সেই অতিচেতনার দ্বারাই কবি সকল জ্ঞানকে একত্রে

পুঞ্জীভূত হয়ে দণ্ডাকারে রূপ পেতে দেখেন, যার নাম দেন তিনি 'জ্ঞানদণ্ড' :

'আমাদের জ্ঞানদণ্ডে এক প্রান্ত শুদ্ধতম গণিত নামক শাস্ত্র আর
অন্য প্রান্ত আমাদের সকলের পরিচিত কবিতা ও কাব্য—কাব্যগুলি।'

২

গণিত আর কবিতা এইভাবে এই কবির ভাবনায় প্রায় সমগোত্র পেয়ে যায়। গণিতের সংজ্ঞা খুব স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় তাঁর কবিতায়, এমনকি কোথাও-কোথাও যুক্তিক্রম সাজিয়ে দেন প্রায় যেন গাণিতিকেরই ধরনে ; সাজিয়ে তোলেন বিমূর্ত সব চিন্তা। কবিতায় এত বিমূর্ত ভাবনার অবতারণা কি কবিতার পক্ষে হানিকর নয়—প্রশ্ন তুলতে পারেন অনেকেই। বিমূর্ত ভাবনাজাত বহু বিবৃতি ছড়িয়ে আছে এ কাব্যগ্রন্থে যেগুলি আদৌ ছদ্ম-বিবৃতি নয়। অথচ, বিজ্ঞান বা দর্শনের কথা যতই বলুন না কেন কবি, তাঁর চিন্তার সারবত্তা তো কল্পনারই ভিতর থেকে পাওয়া, কবিতা-জননের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। সুধীন্দ্রনাথ যেভাবে কবিতায় বিজ্ঞান বা দর্শন-প্রসঙ্গকে স্থান দেবার কথা ভাবছিলেন—'শুধু প্রেম-বেদনা ও প্রকৃতিকে নিয়েই কাব্যের কারবার চলে না, তার লোলুপ হাত দর্শন-বিজ্ঞানের দিকেও আস্তে আস্তে প্রসারিত হচ্ছে।' তার থেকে কতই না ভিন্ন স্বাদের এই কবির বিমূর্ত ভাবনা, ভাবনার যুক্তি-নিচয়। বিমূর্ত ভাবনার দিক থেকেই এ কবিতা-বই কারো কারো প্রিয় হতেও পারে। বিমূর্ত যুক্তি দেবার তিলমাত্র ক্ষমতা নেই যে কবির, কবি হিসেবে তিনি কোনো স্বাক্ষর রেখে যান না পিছনে—ভালেরির মতো কবি তো এতদূরও মনে করেন।

দর্শন-ভাবনার কথা যখন বলেন কবি, তখন তা তাঁর নিজস্ব ভাবনাই, কোনো দর্শন-গ্রন্থের পাতা থেকে উঠে-আসা নয়। ভাবনার সূত্রটি নিজেই বিবৃত করেন কবি : 'শতকরা একেবারে একশত ভাগ খাঁটি দর্শনের নাম / সংজ্ঞা অনুসারে ধর্ম…'। সেই সূত্র অনুসারেই অনেক ফুলের দৃশ্য থেকে কবি দেখেন : 'হয়তো বা ফুলও নেই, বিকশন আছে শুধু বিকশন আছে।' ক্রমাগতই তাঁর ভাবনায় উঠে আসতে থাকে বস্তুর নাম থেকে তার ধর্ম—সারাৎসার : পাখি নয় পাখিত্ব, তারা নয় তারাত্ব :

ক. '…পাখিত্ব তো পাখি নয় সেহেতু বিরাট হ'য়ে থাকে,
সেহেতু বিশাল হয় সকল পাখিত্ব আর ছাড়া ছাড়া পাখিগুলি তার
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গমাত্র নানাভাবে নড়ে-চড়ে, নানা জায়গায় নড়ে-চড়ে।'

খ. 'আসলে একটি শুধু তারাত্ব রয়েছে বিশ্বে, একটিই তারাদেহ আছে
সকল তারার যোগে, যোগফলে ; মাঝখানে ফাঁকগুলি কিছু স্বাধীনতা।'

এসব ভাবনা মনে হতে পারে দার্শনিকেরই ভাবনা। একজন দার্শনিক কি মূর্ত থেকে বিমূর্তে পৌঁছিয়েই থেমে যান না ? কবির কল্পনাপ্রতিভাই পারে বিমূর্তকে মূর্তি দিতে, পাখিত্ব বা তারাত্বকে দেহ দান করতে। 'পাখিদের থেকে সব পাখি জন্মে, আলোকের থেকে জন্মে সকল আলোক'—এই পংক্তির প্রথম অংশটি একটি সাধারণ বিবৃতি, কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি তেমন নয় ঠিক। অথচ এ তো ছদ্ম-বিবৃতিও নয়, তবুও

এ অসাধারণ কবি-দৃষ্টিরই পরিচয়। তার পরের পংক্তিগুলিতে যুক্তি-পরম্পরা চলে আসছে এইভাবে :

‘এর বিপরীতভাবে, পাখি যদি ম'রে যায় তবু সেই মৃতদেহ পাখি,
গাছ যদি মরে তবে যা থাকে তা—তাও গাছ, মৃত ব'লে অন্য কিছু নয়।
সেইভাবে আমাদের মন ম'রে গেলে পরে যা থাকে তা—তাও মন মৃত্যুর নিয়মে।’

—সাদৃশ্যের সিঁড়ি বেয়ে যুক্তির এ আরোহণও তো মূলত কবিরই, বৈজ্ঞানিকের নয়। বিজ্ঞানের নিয়মাবলি দিয়ে জ্ঞানে পৌঁছনোর পথটি বুদ্ধির পথ। কিন্তু কবি তাঁর সত্যকে খোঁজেন তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত শরীর দিয়ে। তিনি জানেন—‘সকল শরীর তার প্রতি অংশ দিয়ে ভাবে, ভাবনা ছড়ায় / মাথায় মোটেই নয়, মাথা বাদ দিয়ে বাকি অবয়বময়।’ চিন্তাগুলিও তাঁর কাছে অবয়বময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বাস্তব। জ্ঞানের ভিতর থেকেও তাই কবি মদ অথবা মধু নিষ্কাশন করে নিতে পারেন।

কিন্তু জ্ঞানের অধিকার তো শুধু মানুষেরই? চিন্তার অধিকার তো শুধু মানুষেরই? —এ হল বাইরের জগতের সত্য। কবির অন্তর্জগতে ঝর্ণার জলেরও চিন্তাক্ষমতা আছে, রোদের টুকরোগুলিও ‘ডুবে-ডুবে কোন কথা ভাবে’। না, এ সমাসোক্তির প্রাবল্য নয়, প্রতীকের রাজত্বও নয়। এ কাব্যের ফুল, পাহাড়, মোহানা বা সপ্তর্ষি বীজগণিতের রাশিমালা নয়। ‘চাঁদ চুপে ডুবে যায় -দ্বাদশীর হ'তে পারে, কোথায় কোটরে/প্যাঁচা ডেকে ওঠে যেন একা-একা ডেকে ওঠে আমোদের ঘোরে’ - এসব পংক্তি বড়ো বেশি জীবনানন্দীয় ঠিকই, কিন্তু জীবনানন্দের চাঁদ অথবা প্যাঁচা অনেকার্থের ব্যঞ্জনাঘন, আর এ কাব্যের চাঁদ নিছক চাঁদই, প্যাঁচা নিছক প্যাঁচাই। কেবল, দৃশ্যগুলির জন্ম হয় কবির অন্তর্জগতেই, বহির্জগতে এইসব ফুল পাহাড় মোহানা বা সপ্তর্ষির কোনো অস্তিত্বই নেই।

৩

কিন্তু কেন শুধু ফুলের সঙ্গে, তারার সঙ্গে, পাহাড়ের সঙ্গে কিংবা মোহানার সঙ্গেই কথা-বলাবলি চলে কবির, কেন কোনো মানুষের সঙ্গে নয়? ‘মানুষের মন চায় মানুষেরই মন’—এ কি সব কবিরই কথা নয়? হ্যাঁ, শুধু কবিই বা কেন, মানুষ মাত্রেই তো চায় মানুষের সঙ্গ। চায়, কিন্তু এ সভ্যতায় তা কি সম্ভব আর? মানুষে মানুষে কোনো সত্য সম্বধ গড়ে-ওঠা কি সম্ভব আজও? বড়ো বেদনার সঙ্গেই কবিকে বলতে হয় :

‘যে কোনো সময়ে কোনো একদল যুবক ও যুবতীর সাথে
ভাব থাকে, খুব বেশি অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বই হয়েছে আমার।
যেই ভাবা শুরু করি, এদের সহিত সখ্য, অন্তরঙ্গ ভাব
জীবনের শেষ দিন অবধিও রয়ে যাবে তখনই হঠাৎ
সেই পুরো দলটাই ভেঙে যায়, কে কোথায় যেন চলে যায়;’

মাত্র একবার নয়, বারবারই এরকম ঘটে জীবনে—পংক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি দিয়ে বোঝাতে চান কবি। এ হল 'জীবনের নিয়মবিশেষ'—'যা কেউ বিশ্বাস করে অনায়াসে মেনে নিতে কখনো পারে নি'। তবু মেনে নিতে হয়। যদি কারো জীবনে সম্বন্ধের অভিজ্ঞতাই না থাকে কোনো, তাহলে তার যে একাকিত্বের বোধ, তার মধ্যে হতাশা থাকলেও তা সাময়িক বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু কারো জীবনে যদি সম্বন্ধের অভিজ্ঞতাগুলি একটি-একটি করে না হয়ে যায়, তবে তার নিঃসঙ্গতার বোধ চূড়ান্ত, চিরকালীন নিরাশা। আজ যদি আমার কথা বলার কেউ না থাকে, তবে আশা রাখা যায় পরে হয়ত পাওয়া যাবে কথা বলার মানুষ। কিন্তু যদি দেখি যাদের কাছে আমি কথা বলছি, তারা কেউ বুঝছে না কিছু, কিংবা না-বোঝার ভান করছে, তাহলে কি নিরাশ্বাস দুঃসহ হয়ে ওঠে না ? তারই আক্ষেপ রয়েছে এই কাব্যে :

'কেন যে আমার কথা—বাজপাখি হ'য়ে আমি সমতলে নেমে গিয়ে যত
কথা বলি উড়ে উড়ে পূর্ণিমার জোছনায় একা-একা কত কথা বলি,
বলি সমতলে যত মানুষ রয়েছে সেই তাদের নিকটে ডেকে-ডেকে
অনেক গভীর রাতে চাঁদের আলোর নিচে, তারার আলোর নিচে একা
তালে তালে ডানা নেড়ে পউষে গভীর রাতে অনেক কবিতা বলে আসি।
কেন যে আমার কথা কিছুই বোঝে নি এই ভান করে, ভান করে থাকে।
রাত শেষ হলেও তো—সকালেও দুপুরেও—ভান করে কিছুই বোঝে নি'।

তাহলে আর কী করতে পারে একজন ? তাহলে তো সান্ত্বনা পেতে হয় এই ভেবে যে মানুষ না বুঝে বুঝুক, পাহাড়, চূড়া কিংবা মালভূমি হয়ত বুঝবে ! চেতন-অচেতন জ্ঞান সরিয়ে দেবার জন্যেই তখন বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্জগতে আশ্রয় নিতে হয়—'নিজে নিজে খুশি থাকা, পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়ে থাকা আত্মগরিমা' নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে ! সে অন্তর্জগতে তো কথা বলার কথা শোনার কোনো আধারের অভাব ঘটে না কখনো, সেভাবেই এই কবি বকুল কিংবা ক্রিসেনথিমামের সঙ্গে সখ্য পাতান, অত্রি-অরুন্ধতীর সঙ্গে কথা বলেন, শূন্যতাকে 'খেয়ে' ফেলেন :

'মোহানায় ঢুকে যাই, একা-একা গান গাই, মোহানার শূন্যতাকে খাই
রোজ একা-একা খাই, সকল শূন্যতা আমি একা-একা ভ'রে ফেলে খাই ;

'সকল শূন্যতা আমি একা-একা ভ'রে ফেলে খাই'—এ বাক্যাংশের ক্রিয়াপদ মুখের ভাষা থেকেই তুলে নেওয়া কিন্তু প্রতিদিনের কথ্য গদ্য থেকে বাক্যাংশটি কতই না পৃথক ! 'সব কিছু পেকে যায়, পেকে যায় এই সেতু, সুবাতাস, ফুল/কেশর, পরাগ, জোছনা'—'পেকে যায়' ক্রিয়াপদটি বড়ো বেশি চলিত ক্রিয়াপদ, কিন্তু এ বাক্যে এর প্রয়োগ আদৌ প্রচলিত প্রয়োগ নয়। 'বিশাল দুপুরবেলা চারিদিকে ফুটে আছে, ফুটে আছে আকাশে আকাশে'—এ পংক্তির 'ফুটে আছে' কিংবা 'খসাগুলি অথবা উপরে ওঠাগুলি / না হলে চলে না'—এর 'খসাগুলি' 'ওঠাগুলি'—এ সবই চলিত এবং অতিসাধারণ ক্রিয়াপদের অচলিত এবং অসাধারণ প্রয়োগ। এসব প্রয়োগ অবশ্যই কোনো শব্দ-

চাতুর্যের পরিচয় দেয় না। এ কাব্যের ভাষায় এমনকি উপমা-উৎপ্রেক্ষারও কোনো অলংকরণ নেই। একান্ত নির্ভার সরল কথ্য ভাষা, তবু কথ্য ভাষা থেকে কত পৃথক, তবু তা কবিতারই ভাষা। যাকে বলা যেতে পারে কাব্যিক ভাষা—তার থেকে এ ভাষার গোত্র আলাদা, মুখের ভাষার সঙ্গে এর গোত্রগত মিল আছে ঠিকই, তবু মুখের ভাষা, হাট-বাজারের ভাষার সঙ্গেও এর অমিল রয়ে গেছে। অমিল রয়ে গেছে, তার একটা কারণ, এ ভাষাতে কোনো চলিত বাগ্‌ধারা নেই। বাগ্‌ধারায় সঞ্চিত থাকে সামাজিক উত্তরাধিকার, সমাজ থেকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই কবি সে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেননি। মুখের ভাষার সারল্য, ভারহীনতা অব্যাহত রেখেও ভাষা কতদূর ব্যক্তিগত হয়ে উঠতে পারে কবিতার রহস্যজগৎ রচনা করতে পারে, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' তারই এক দৃষ্টান্ত।

ছন্দের দিক থেকেও, কোনো অভিনবত্বের, কোনো কলাকৌশলের প্রয়াস নেই এ কাব্যে, জীবনানন্দের ব্যবহারচিহ্নিত দীর্ঘপয়ারই এ কাব্যের অবলম্বন। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত কাব্যের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ছন্দ, অধ্যায় থেকে অধ্যায়ে পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্য বেড়ে গেছে—এই শুধু বৈচিত্র্য। 'পংক্তিগুলি যত বেশি দীর্ঘ করি পাঠকালে তত বেশি ধীরগতি হয়'—ধীরগতি চেয়েই কি পংক্তিগুলি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ থেকে অতিদীর্ঘ হয়ে উঠেছে—প্রথম তিনটি অধ্যায়ে বাইশ, তার পরের দুটিতে ছাব্বিশ তার পরেরটিতে ত্রিশ হয়েছে মাত্রাসংখ্যা ?

ধীরগতি চেয়েই, কিন্তু শুধু এইটুকু নয়। মনে হয় গোটা বই জুড়ে একটি নদীর ছবি আঁকতে চেয়েছেন কবি। নদী যেমন যতই মোহানার দিকে এগোয়, ততই তার বিস্তার বাড়ে আর স্রোত কমে, সেইভাবেই এ কাব্যের ধ্বনি-ধারা ক্রমশ বিস্তার পেয়েছে, গতি কমেছে। যেন বা নদীর ছবিকে অক্ষুণ্ণ রাখতেই চেয়েই স্তবক বা পদ্য-অনুচ্ছেদ এ কাব্যে অনুপস্থিত। পৃথক-পৃথক বহু ভাবনা এসেছে এ কাব্যে, কিন্তু অনুচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসেনি। নদীর জলধারার উপর যেমন প্রহরে-প্রহরে নানা রঙ, আলো-ছায়ার নানা খেলা আসে যায়, সেভাবেই এ কাব্যে নানারঙা ভাবনা-কল্পনা কোলাজ রচনা করে চলেছে। কবি জানেন অবশ্যই 'ভাব আর অবয়ব—এ-দুটিকে কোনক্রমে পৃথক, বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব ব'লে / ও-দুটি প্রকৃতপক্ষে দুই নামে এক বস্তু, কেবল অদৃশ্য ব'লে ভাবা হলে ভাব / আর দৃশ্য বলে যদি ভাবো তবে অবয়ব।'—তাই বলা যায়, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'-র অবয়ব কবির অন্তর্জগতেরই অবয়ব। সে অবয়ব ভাস্কর্য নয়, গান; কুঁদে-তোলা নয়, বয়ে-যাওয়া; অ্যাপোলোনীয়ান নয়, ডায়োনিসিয়াক।

অন্তর্জগতের কাব্য বলেই 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র স্বাদ আজও টাটকা। কবিতা-সংসারে আজ যখন দেখি বহির্জগতেরই দাপট, যে বহির্জগৎ সাপলুডোর ছক, দেখি তার মধ্যে ঘুটিগুলির চাতুর্যময় বিবরণ, তখন এরকম অন্তর্জগতের কবিতা গুমোটের মধ্যে স্নিগ্ধ হাওয়ার মতো মনে হয়। □

পত্রপত্রিকায় বিনয় মজুমদার

প্রভাত কুমার দাস

বিনয় মজুমদার তাঁর 'আত্মপরিচয়' শীর্ষক রচনায় নিজের কাব্যচর্চার আদিপর্বের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন : 'এক পালোয়ান বাজি ধরে একটি চলন্ত মোটর গাড়িকে টেনে পিছিয়ে নিয়ে এল'—তাঁর কৈশোরে সর্বপ্রথম কাব্যপ্রয়াসের বিষয় নির্বাচনের এই ছিল প্রাচীনতম স্মৃতি। আবার পরবর্তীকালে বাংলা কাব্য জগতের প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন : 'সময়ের সঙ্গে এক বাজি ধ'রে পরাস্ত হয়েছি।' সেদিক থেকে, বিনয়-এর কবি-জীবন ও তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে পরিচিত পাঠক হয়ত স্বীকার করবেন, বিনয়-এর কবিতা তাঁর ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষার এক দীপ্যমান উৎসব, সময়ের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধের এক অবিরল পরাজয়ের কথা-কাব্য। বস্তুতপক্ষে, আধুনিক বাংলা কাব্যচর্চায় শেষ-পঞ্চাশ থেকে পরবর্তী ষাটের সময়সীমায়, নতুন রীতির নতুন ভাবনার, নতুন উন্মাদনার যে কাব্যপ্রবাহ, সেখানে প্রথমাবধি বিনয়-এর আবির্ভাব ও উপস্থিতি কিছুটা প্রক্ষিপ্ত ঘটনা। যেন সর্বগ্রাসী আস্ফালন আর উন্মাদনার বিপরীত-প্রান্তে একটা প্রশান্ত তন্ময়তার সহজ বাতাবরণে, আমাদের নৈমিত্তিক জীবনপ্রবাহের যে নিশ্চল নৈঃশব্দের কথাহীন মুহূর্ত, তারই সরল বাক্‌ময় স্বচ্ছন্দ প্রকাশ তাঁর কাব্য-চিন্তাকে নতুন রূপ দিয়েছিল। এক অর্থে পঞ্চাশের বাংলা কবিতার যে নতুনতম উত্তাপ, বিনয়-এর কবিতা সেই সময়-সমীপবর্তী, কিন্তু সূচনাকাল থেকেই ব্যতিক্রমী। বিনয় মজুমদার শৈশবে স্বাস্থ্যবান ছিলেন কিনা, কিংবা কুস্তিবিদ্যায় ছিলেন পারঙ্গম, অথবা বাজি ধরে কোনো কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কিনা সেসব জিজ্ঞাসা অবান্তর। এমনকি উপর্যুক্ত স্মৃতির উল্লেখ এক্ষেত্রে একান্ত প্রাসঙ্গিক না হলেও, এরকম একটা ভাবনায় রঙ লাগাতে সাধ হয় : তথাকথিত নতুন কবিসঙ্ঘের শরীরী কবিতার প্রাঙ্গণে বিনয়-এর অকস্মাৎ আবির্ভাব যেন যথার্থই বীরের বেশে, অনেকটা 'এলাম, দেখলাম, জয় করলাম' ভঙ্গিতেই।

১৯৪৭ সালে মাত্র তের বছর বয়সে ফরিদপুর মহকুমা শহরে গোপালগঞ্জের কাছে বৌলতলী বিদ্যালয়ের ছাত্র-পত্রিকায় বিনয়-এর প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়, পরবর্তী বর্ষে একই বিদ্যালয়ের বার্ষিকীতে আরো একটি। এই আত্মপ্রকাশের পর থেকেই তিনি কাব্যচর্চায় মাঝে-মাঝেই বিরত হয়েছেন কিন্তু একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি। বিদ্যার্জনের কারণে কলকাতায় এসে মেট্রোপলিটন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে তালতলা এলাকায় বাস করার সময়, প্রথম বিষ্ণু দের 'চোরাবালি' পাঠ করেন এবং কাব্যানুরাগের কারণে সুকান্ত, সত্যেন দত্ত আর নজরুলের কাব্যগ্রন্থ কিনে ফেলেন। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময়, বই কেনার সূত্রে সিগনেট বুক শপ-এর প্রতিষ্ঠাতা দিলীপ কুমার গুপ্তর

বক্তৃতা শুনে কল্লোল যুগের কবিগোষ্ঠী বিষয়ে অবহিত হন। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের কিছু বইপত্র কিনেও ফেললেন, অথচ সে বইগুলি তাঁর মনে কোনো সাড়া জাগালো না। এর পর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এসসি. শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসে আবাসিক হিসাবে বাস করেন। ততদিনে নিজেই বন্ধুবান্ধবদের অগোচরে নিয়মিত কবিতা লেখা শুরু করেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই বন্ধুমহলে তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় প্রচারিত হয় ; কিছুটা তাঁদের প্ররোচনায় ছাত্রাবাসের রন্ধনশালার দেয়ালে নোটিশবোর্ডে সরাসরি নিজের হস্তাক্ষরে স্বরচিত কবিতা সেঁটে দিতেন, যদিও সেসব কবিতা নিছকই ছাত্রাবাসের দৈনন্দিন অব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক রচনা, 'ডালে কেন ডাল প্রায় থাকে না, কেবল জল, মাংস কেন ঘন ঘন খেতে দেওয়া হয় না'—এইরকম ছিল সেসব কবিতার বিষয়বস্তু। কিন্তু নিজের কাব্যরচনার অন্যতর উদাহরণগুলি বন্ধুদের কাছে গোপন রাখতেন। 'সৃষ্টির পূর্বাহ্নে, দ্যাখো, নিজেকেই সৃষ্ট করা প্রয়োজন হয়।'—এই বোধে তিনি প্রথমাবধিই সচেতন যে জন্য, প্রেসিডেন্সি কলেজের সুদৃশ্য দেয়াল পত্রিকায় কিংবা মুদ্রিত বার্ষিক সংকলনে তাঁর কবিতা স্থান পায়নি। এই সময়, জনৈক সহপাঠী বন্ধুর সাহচর্যে প্রথম 'এক পুরোদস্তুর কবি' বিমল চন্দ্র ঘোষ-এর সঙ্গে আলাপ হল, পরে তাঁর আগ্রহে 'বারোমাস' পত্রিকায় কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে।

'কবিতা জগতে আমার প্রবেশ পত্রিকায় কবিতা ছেপে নয়, বই ছেপে। কলকাতায় আর কোনো কবির জীবনে হয়েছে কিনা জানি না।'—বিনয় তাঁর 'আত্মপরিচয়'-এ এই অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটি তাঁর কাব্য জীবনে খুবই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৫৭ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রী নিয়ে পরবর্তী বর্ষে 'অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড হাইজিন'-এ তিনি অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বার সময়, কলেজের বার্ষিক সাহিত্য-সংকলনে কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কিছুটা পড়াশুনার চাপে, কিছুটা বিষয়বস্তুর অভাবে, পুরোদস্তুর কাব্যচর্চায় মনোযোগী হতে পারেননি। একটি 'স্মৃতিকথা' শীর্ষক রচনায় বিনয় তাঁর কাব্যচর্চার এই পর্বের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ১৯৫৩ খৃস্টাব্দের পূর্বে রচিত কিছু কবিতার অংশ উদ্ধৃত করেছেন। যৌবন বয়সের সেই সব রচনার পটভূমির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছিলেন : 'সেই প্রথম যৌবন আর কোনদিনই ফিরে আসবে না। তেমনি ফিরে আসে না এই প্রকারের কবিতা রচনার মেজাজ। এই গদ্য ঘেষা পৃথিবীতে গদ্যময় জীবন যাপন করতে কবিতাও আমার গদ্য ঘেষা হয়ে গেছে। জীবন সুতরাং কবিতাও গদ্য ঘেষা হয়ে যাবে—এ কথা টের পেয়েছিলাম বছর তিনেক পরে ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে।' শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়বার সময় কলেজের গদ্যময় জীবনে, সব ছেড়ে কবি হবেন একথা ভাবেননি তখনও—ইঞ্জিনিয়ার হবেন এই ছিল ইচ্ছা। তবু 'কাপড়ে বাঁধানো রয়াল সাইজের প্রকাণ্ড ডাইরি'তে পাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ে নানাবিধ রচনার পাশাপাশি অন্তত পঞ্চাশটির মতো কবিতা সে সময় লিখেছিলেন। তখনো পর্যন্ত

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সাহিত্যমণ্ডল ছাড়া বাইরের কাব্যজগতে তাঁর কোনো যোগাযোগ সাধিত হয়নি। বস্তুতপক্ষে নিজের রচনার ক্রম-অগ্রসরমান পরিণতির ভিতর দিয়েই তাঁর কবিসত্তার বিকাশ ঘটেছে। কাব্য-জীবনের সূচনাতে কোনো দক্ষ সম্পাদকের সান্নিধ্য কিংবা অগ্রজ কবির গভীর পরামর্শ পাননি। এদিক থেকে কাব্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রকাশ্য আবির্ভাব ঘটল—১৯৫৯ সালে 'নক্ষত্রের আলোয়' নামের একটি কাব্যপুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রকাশিতব্য স্মারক-পত্রিকার মুদ্রণ তত্ত্বাবধায়ক, অধুনালুপ্ত 'গ্রন্থজগৎ' নামে একটি পুস্তক প্রকাশনের প্রকাশক দেবকুমার বসুর সঙ্গে সামান্য আলাপ ছিল, পরে কবিবন্ধু কুশল মিত্র মাধ্যমে দেবকুমার-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। ইতিপূর্বে মনে হয়েছিল, এ পর্যন্ত তিনি যা লিখেছেন, তাতে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সাবালকত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে সুতরাং এখন তিনি উদ্যোগ নিতে পারেন। গ্রন্থজগতের দেবকুমার বসুর পরামর্শ ও দেবব্রত মুখোপাধ্যায়-এর প্রচ্ছদ সম্বলিত হয়ে প্রকাশিত গ্রন্থটি, পরিচিত লেখক-পরিমণ্ডলে যথারীতি বিতরিত হয়েও কোনো আলোচ্য বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়নি। বরং রুশ ভাষার অনুবাদ সূত্রে তিনি কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, যেটা তার সে সময়ের জীবিকার প্রয়োজনেও সাহায্যকারী হয়েছিল, অন্তত পাঁচটি গ্রন্থ তিনি রুশ থেকে বঙ্গানুবাদ করেন। স্মরণ করা যেতে পারে, 'দিগদর্শন' নামে একটি পত্রিকার আগ্রহে তাঁর বেশ কিছু গদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়।

কিছুদিনের মধ্যে বিষ্ণু দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এক বন্ধুর মাধ্যমে। মাঝে-মাঝে তাঁর কাছে নিজের কবিতার খাতা রেখে আসতেন। মূলত বিষ্ণু দের আগ্রহেই ১৯৫৮ সালে 'সাহিত্য পত্রে' তাঁর 'পাখি' কবিতা প্রকাশিত হয়, সম্ভবত সাময়িকপত্রের পাতায় এটিই তাঁর প্রথম প্রকাশ। কিন্তু, 'মোটা ষাটপাউন্ড অ্যান্টিক' কাগজে মুদ্রিত 'নক্ষত্রের আলোয়' কাব্য-পুস্তিকাটির প্রতি সমকালীন পাঠক ও কবিদের অমনোযোগ তাঁকে কিছুটা হতাশ করলেও, তিনি তাঁর লেখার বিষয়ে, নিজেকে ক্রমাগত পরিশীলিত করে তোলার চেষ্টায় নিমগ্ন হলেন। বরং, কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর বিদেশী কবিতার অনুবাদ মুদ্রিত হতে থাকল, সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকদের আগ্রহে, যা তাঁর কাছে কিছুটা অনভিপ্রেত ছিল। এই সময় 'বক্তব্য' নামের একটি পত্রিকায় আমন্ত্রিত হয়ে কিছু অনুবাদ করে পাঠাতে হয়, যে জন্য কিছুটা বিরক্ত হতেন। কেননা, বাংলা কবিতায় মৌলিকতার আকর্ষণে তখন তিনি নিজের রচনার স্বাতন্ত্র্যে আস্থাশীল। যে জন্য গ্রন্থ প্রকাশের প্রথম সূচনাতেই তিনি নিজের কবিতারও নির্মম সমালোচক ছিলেন; পঞ্চাশটি কবিতার মধ্যে মাত্র গোটা পাঁচেক নির্বাচনযোগ্য হয়েছিল মনে প্রথম কাব্য-পুস্তিকার জন্য।

প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশের দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যপুস্তিকা 'গায়ত্রীকে' (১৯৬১) প্রকাশিত হয়। একদিকে, তাঁর প্রণয়-ব্যর্থ উদ্‌ভ্রান্ত জীবন তাঁর নিজের কবিতার ভাষাতে : 'প্রত্যাখ্যাত প্রেম আজ অসহ ধিক্কারে আত্মলীন।' অন্যদিকে তাঁর ক্ষণস্থায়ী

চাকরির বিড়ম্বনা, হয়ত বা সবেমাত্র মানসিক পীড়ায় তিনি আক্রান্ত, যে জন্য প্রতিদিনের জীবনযাপন তাঁকে ক্রমাগত এক কিংবদন্তীর পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছিল। নানা ধরনের মুখরোচক গুজবে, তিনি নানা মহলে আলোচ্য হয়ে উঠেছেন। সে সময় কলকাতার কাব্যজগতে পঞ্চাশের কবি হিসাবে সদ্য খ্যাতিমান এমন কয়েকজন, যাঁদের কাব্যচর্চায় ও জীবনযাপনে, নতুন এক ভয়ানক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাঁদের সম্মিলিত কবিসঙ্ঘের মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে ঘিরে বাংলা কবিতায় একটা নতুন প্রবাহ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। 'কৃত্তিবাস'-পন্থীদের নৈমিত্তিক কর্মকান্ডের যে সব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছিলেন তাঁরা, তাঁদের সাম্প্রতিক রচনাতে তার প্রভাব স্পষ্ট। এই সময় সাহিত্যক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার কয়েকজন কবি-গল্পকার, সদ্যসংগঠিত নতুন 'হাংরি জেনারেশন' নামে একটি দলে যোগদান করেন, প্রাথমিক পর্বে এই দলের সাময়িক নেতা হিসাবে শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। 'গায়ত্রীকে' প্রকাশিত হওয়ার বছর খানেক পরে, হাওড়া থেকে অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সম্প্রতি' পত্রিকায় (১৩৭৯) 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব / হাংরি জেনারেশন' শীর্ষক একটি গদ্য লেখেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, এই আলোচনার উত্তরভাগে 'গায়ত্রীকে' কাব্যপুস্তিকাটির সমালোচনাও অন্তর্ভুক্ত হয়। অনেকেরই ধারণা, শক্তির এই আলোচনাই বাংলা ভাষায় 'হাংরি আন্দোলনে'র প্রথম আভাস হিসাবে প্রকাশিত। এই একই সংখ্যায় 'সম্প্রতি'তে, 'কী যে হবে কী যে হয়' নামে বিনয়-এর একটি কবিতাও মুদ্রিত হয়। রহস্যময় ভাষায়, শক্তি এই নতুন হাংরি-আন্দোলনের স্বপক্ষে গদ্যটি লিখেছিলেন, নিজেদেরকে 'ক্ষুধার্ত' পন্থীর প্রবক্তা দেখতে চেয়ে, যেন সেই সূত্রেই বিনয়-এর কাব্যপুস্তিকার আলোচনাটি উপস্থাপিত হয়। শক্তি, তাঁর বিশ্লেষণের উপসংহারে লিখেছিলেন: 'বিনয়ের পদ্যের যে-পাঠক সে বিনয়ের পদ্য পড়লেই, তার অনুভবক্ষমতা যদি যথাযথ হয়, তবে বিনয়কে অনুভব করবে, বিনয়ের পদ্যের জগৎ বিশেষ ক'রে এঁর পরবর্তী পদ্যগুলি উপরোক্ত গোত্রের আন্দোলনকে অনেক জাগ্রত করে।' এর পরে, এই আন্দোলন একটা তুঙ্গ চেহারা নেয়, হাংরির স্বপক্ষে উদ্যোক্তারা যে সব ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাতে কখনো-কখনো বিনয়-এর নামও সদস্যতালিকাভুক্ত হয়।

'সম্প্রতি' পত্রিকার সম্পাদক অশোক চট্টোপাধ্যায় কথা-প্রসঙ্গে বর্তমান আলোচককে জানিয়েছিলেন, মানসিক অস্থিরতায় আক্রান্ত বিনয় স্বয়ং, শক্তির এই আলোচনার প্রতিক্রিয়ায় একটি ক্রুদ্ধ চিঠি লিখেছিলেন সম্পাদককে। তাঁর ধারণা, এই বিশ্বসংসারে শক্তি কেন,—কারো পক্ষেই বিনয়-এর কবিতা বোঝা সম্ভব নয়, বুঝতে পারেন একজনই, যে মানুষীর উদ্দেশ্যে কবিতাগুলি নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং বিনয় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, বিনয়ের পত্রটি যেন পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হয় এবং আলোচ্য সমালোচক এবং সম্পাদক উভয়কেই ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে 'সম্প্রতি'র মাধ্যমে। নিতান্তই প্রলাপ বলে, কবির সেই চিঠি উপেক্ষা করেছিলেন সম্পাদক, এমনকি দুর্ভাগ্যবশত চিঠিটি

সংরক্ষিত হয়নি তার কারণ বিনয়-এর কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে এ চিঠি যে কোনো সময় গুরুত্ব পেতে পারে এমন কথা হয়ত ভাবেননি তিনি। একথা ঠিক, হাংরি আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিনয় কোনো প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেননি, কিংবা তাঁদের কাব্য-দর্শের সঙ্গে তাঁর স্পষ্ট কোনো সংযোগ ছিল বলে মনে হয় না। যে জন্য বিনয়-এর রচনায় তার আভাসও পাওয়া যায়নি। তবু একথা সত্যি, 'সম্প্রতি' পত্রিকায় প্রকাশিত শক্তির 'উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়' বিনয়-এর কাব্য বিষয়ে সমকালীন পাঠক ও লিটল ম্যাগাজিনের সম্পাদকরা মনোযোগী হয়ে ওঠেন, অনেকেই তাঁর কবিতা নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশে আগ্রহ পোষণ করেন।

দুই

'গায়ত্রীকে'-র চোদ্দটি কবিতার সঙ্গে আরো তেষট্টিটি কবিতা যোগ করে উপর্যুক্ত প্রকাশনের তত্ত্বাবধানেই ১৯৬২ সালে পরবর্তী কবিতার বই 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশিত হয়; আবার এই 'ফিরে এসো, চাকা'-রই পরিবর্তিত রূপ প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে 'আমার ঈশ্বরীকে' নামে।

এক অর্থে 'ফিরে এসো, চাকা' বিনয়-এর সমগ্র কাব্য জীবনে সম্ভবত সব চেয়ে এবং একমাত্র পরিচিত কাব্যগ্রন্থ। পূর্বোক্ত 'সম্প্রতি' পত্রিকাতেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় পুনরায় আর একটি দীর্ঘ আলোচনায়, তাঁর কবিতায় উপমা প্রয়োগের নিজস্বতার কথা উল্লেখ করে লেখেন: 'বিশেষতঃ বিনয়ের কবিতার চারিপাশে ও ভিতরে সঙ্গীতময়তা নাই, বদলে এক অসাধারণ চিত্রময়তা বর্তমান। এত অপরিমেয় চিত্রে ব্যক্ত বিনয়ের এই গ্রন্থের কবিতা যে, সময়ে-সময়ে, মনে হয়, একে দুষ্ট ব্যবহার বলি, কিংবা বলি লোভাতুর উন্মাদ এই কবির আশ্চর্য ঐ সবই। ছবির পর ছবি—উপমার পর উপর্যুপরি উপমা বিনয়ের বৈশিষ্ট্য এবং বিনয়ের মধ্যে যে অসামান্য বিষয় আছে তার প্রকাশ। এই প্রাচুর্যময় অস্থিরতার মানে বিনয়ের ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় যে পেয়েছে তার কাছে অনেক পরিচ্ছন্ন, বাকি সকলেরই গ্রাহ্যাগ্রাহ্যের বাইরে।' আলোচ্য রচনায় শক্তি তাঁর কয়েকজন সমকালীন কবিবন্ধুর প্রসঙ্গ তুলে লিখলেন: 'বিনয়ের কবিতা পাঠ করে আমি সম্পূর্ণ অন্য এক বিপন্ন কবিত্বের আস্বাদ পাই এবং সেখানে তার শেষতম ইচ্ছা 'চিরন্তন শিখরের বায়ু।'' উল্লেখ করা যায়, শক্তি তাঁর দীর্ঘ রচনার কোথাও তদানীন্তন নবসংগঠিত হাংরি আন্দোলনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেননি। কিন্তু 'আত্মকথায়' পরবর্তীকালে বিনয় স্মৃতি থেকে জানিয়েছিলেন, 'এই সমালোচনার ফলে হৈ-চৈ পড়ে গেল কলকাতায়।'

এই সময় প্রায় এক বছর বিনয় কবিতা রচনা থেকে সম্পূর্ণ বিরত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে বিনয় কলকাতায় ফিরে এলে, শক্তি তাঁকে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার একটি পুরাতন সংখ্যা উপহার দিয়ে লেখার আমন্ত্রণ জানান। যদিও 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বিষয়ে তখনো পর্যন্ত বিনয় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রকাশ বিষয়েও

সে সময় একটা অনিশ্চিত ভাব দেখা দেয়। সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আইওয়া পোয়েট্রি ওয়ার্কশপে আমন্ত্রিত হয়ে তখন বিদেশে, তাঁর অবর্তমানে শরৎ কুমার মুখোপাধ্যায় তখন সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়েছেন। কিন্তু শরৎ কুমারের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণে 'কৃত্তিবাস'-এর অনেকেই সন্তুষ্ট হননি, পারস্পরিক এক বিবাদ ও ভাঙনের আভাস লক্ষ্য করা যায় দলে। কয়েকজন এই সময় 'কৃত্তিবাস' থেকে বেরিয়ে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত হন। যাই হোক, মূলত শক্তির আহ্বানে, শরৎ কুমার সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার অষ্টাদশ সংকলনে 'একটি প্রস্তাব' শীর্ষক কবিতা প্রকাশের মাধ্যমে বিনয়-এর পুনরাবির্ভাব ঘটে। পরবর্তী ঊনিশতম সংকলনে তাঁর তিনটি কবিতা প্রকাশিত হলেও, বিংশ সংকলনে তিনি কবি হিসাবে অনুপস্থিত। অন্য দিকে, এই সময় হাংরি আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে, 'কৃত্তিবাস'-এ অবশ্যম্ভাবী যে ভাঙন দেখা দেয়, তাতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। হয়ত এই কারণেই, বিনয়-এর পক্ষে 'কৃত্তিবাস'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অবশ্য 'আত্মপরিচয়-'এর বিনয় জানিয়েছিলেন: '১৯৬৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ঈশ্বরীর' নামক কবিতাগ্রন্থখানি ছাপা হয়ে বেরোয়। এ বইয়ের প্রায় সব কবিতাই আদি রসাত্মক। কিন্তু এই বই পাঠক মহলে বিশেষ সাড়া জাগাতে পারে নি। এখন পর্যন্ত একই অবস্থা চলছে। এর পরে বেশ কিছুকাল আমি কবিতা লিখিনি। 'ঈশ্বরীর' বইখানির কবিতাগুলির ছন্দ এবং ধ্বনিমাধুর্য খুব ভালো—এ কথা আমি তখনি বুঝতাম এখনো বুঝতে পারি। আমার কবিতা সম্পর্কে ছোটবড় আলোচনা তখন নানা পত্রিকায় বেরোতে সুরু করে।'

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস'-এর বিংশ সংকলনে অন্যতম উল্লেখযোগ্য একটি গদ্য রচনা বিনয়কে অবলম্বন করে লেখেন জ্যোতির্ময় দত্ত। দীর্ঘ সেই নিবন্ধের শিরোনাম 'বিনয় মজুমদার: কবিতার শাহিদ।' এই প্রবন্ধটির বিষয়ে বিনয় পরবর্তী কালে স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন: '১৯৬৪ সালের গোড়াতেই লক্ষ্য করলাম, আমি কলকাতায় পরিচিত হয়ে গেছি, বিশেষত পত্রিকার সম্পাদক মহলে।' এমনকি 'দেশ', 'অমৃত'-র মতো প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকাতেও তিনি লেখার আমন্ত্রণ পান। প্রায়ই কাব্যপাঠের আসরেও তাঁর যোগদানের আহ্বান আসে। যদিও কলকাতায় খুবই অনির্দিষ্ট জীবনযাপন করছেন তিনি, তাঁর অস্থির মনের কারণে নিত্য নতুন ভয়াবহ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ছেন, স্থায়ী ঠিকানার অভাবে প্রায়ই কবি কিংবা কবিতাপ্রেমী পৃষ্ঠপোষক বন্ধুদের সাহচর্যের উপর নির্ভরশীল। এরকম সময়ে তারাপদ রায়ের মাধ্যমে তিনি পরিচিত হন জ্যোতির্ময় দত্ত-র সঙ্গে। প্রথম সাক্ষাতে জ্যোতির্ময় একটা প্রবন্ধ দেখান, যেটি বিনয়কে অবলম্বন করে রচিত এবং তাঁর অনুমতিক্রমে প্রবন্ধ পাঠের বিষয়ে বিনয় ২১.৩.৬৪ তারিখে লিখিত মন্তব্য করেন: 'এই প্রবন্ধে ব্যক্ত কোনো মন্তব্য, প্রদত্ত কোনো তথ্য, লিখিত কোনো উক্তি—আমার কিছুমাত্র আপত্তিকর বলে মনে হয় না।' রচনাটি 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশে ইচ্ছুক ছিলেন জ্যোতির্ময়, কিন্তু দীর্ঘ

হওয়ায় সেই প্রচেষ্টা প্রত্যাহৃত হয়, বিংশ সংকলনে রচনাটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। হয়ত 'সম্প্রতি' পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়-এর সমালোচনায় কবির প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা থেকেই আলোচ্য রচনার পাদটীকায় বিনয়-এর মন্তব্যও প্রকাশিত হয়। জ্যোতির্ময় তাঁর প্রবন্ধে লিখলেন: 'এরই মধ্যে বিনয় মজুমদার বিষয়ে[১] অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত হয়ে গেছে, এবং তার মধ্যে সত্যের অংশ কতটুকু তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর সম্পর্কে স্পষ্ট শুধু এইটুকু: বিনয় মজুমদার একজন বেদনার্ত, সত্যদ্রষ্টা কবি, একজন শহিদ যিনি নিজের সবটুকু কবিতায় নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন, এবং যাঁর কৃপায় আমরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতা আস্বাদনে সমর্থ হয়েছি, বিনয় মজুমদারের আবির্ভাব তিরিশের কবিদের পর বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রধানতম ঘটনা।' এই বর্ণনায় তিরিশের আর এক কবির ছবি যেন ভেসে ওঠে, হেমচন্দ্র বাগচী যাঁর কবিত্বমুগ্ধ বন্ধু সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা'য় অনেকটা স্থান অবারিত রেখেছিলেন। মস্তিষ্কপীড়ায় মাঝে মাঝে দীর্ণ হয়েছেন হেমচন্দ্র, অধুনা-বিস্মৃত সেই কবির কথা বুদ্ধদেব আজীবন স্মরণে রেখেছিলেন। জ্যোতির্ময় তাঁর নিবন্ধে বিনয়-এর হতাশ প্রেম, তাঁর অচিকিৎস্য ব্যাধি তাঁর সাংসারিক ব্যর্থতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য বিস্তারিত বলেননি, কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল ছাত্রজীবন, বার বার বাধাপ্রাপ্ত জীবিকার অসঙ্গতি, কাব্যচর্চার সমান্তরাল তাঁর গণিতচর্চা, নিতান্ত আক্ষরিক অর্থে তিনি যে বারংবার প্রহৃত হয়েছেন কেবল এইসব সহমর্মিতাপূর্ণ সূত্রগুলির উল্লেখ করেছেন মাত্র। কিন্তু বিস্তৃত অংশ জুড়ে উদাহরণময় বিনয়-এর কবিত্ব-শক্তির প্রশংসা মনে হতে পারে পক্ষপাত-পূর্ণ, কিন্তু খুবই হৃদয়স্পর্শী রচনা। জীবনানন্দকে অবলম্বন করে যেভাবে বুদ্ধদেব বসু তাঁর দীর্ঘ কাব্য-সমালোচনা ও প্রবন্ধগুলি লিখেছেন, অনেকটা সেই রকম। দীর্ঘ সেই প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছে বিনয়-এর একটিমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'ফিরে এসো, চাকা'-কে অবলম্বন করে, যা তখনও পর্যন্ত প্রকাশকের কাছে একটিও অবশিষ্ট নেই, 'কিন্তু পাদটীকায় লেখক উল্লেখ করেছেন: 'আমার ঈশ্বরীকে নামে নতুন সংস্করণে গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায়।' প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার একুশতম সংকলনে 'এই সংখ্যার লেখক' শীর্ষক সংক্ষিপ্ত বিভাগে বিনয় মজুমদার বিষয়ে জানানো হয়: 'বাংলা দেশে একমাত্র কবি যিনি নিজের ইচ্ছেমত জীবন কাটাচ্ছেন। ওঁর ১৪৩টি কবিতা, সমগ্র কবিতা-সংগ্রহ হিসেবে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' নামে সুদৃশ্য বাঁশপাতা কাগজে ছাপা, শীঘ্র প্রকাশিত হচ্ছে।'

'ফিরে এসো, চাকা'-র রচনাকাল মার্চ ১৯৬০ থেকে জুন ১৯৬২, জ্যোতির্ময়-এর ভাষায়: 'যতদিন কবিতা লিখেছেন তিনি আর প্রায় কিছুই করেননি, নিজের প্রতিটি কণা সঁপে দিয়েছেন কবিতায়, যেন এই বিকারের ঘোরে কাটিয়ে দিয়েছেন সফল দুই বছর; পরে কবিতা লেখা ত্যাগ করে, চলে গেছেন বিপরীত মেরুতে, ব্যাপৃত হয়েছেন গণিতের চর্চায়। র‍্যাঁবো কবিতা বর্জন করে চলে গিয়েছেন আফ্রিকায়; বিনয় মজুমদার ভৌগোলিক ভাবে যদিও দূরে যান নি, মানসিকভাবে তিনি আরো অনেক বেশী দূরে চলে গেছেন, এখন

তাঁর কবিতার নিন্দা তাঁকে পীড়িত করে না, প্রশংসা দেয় না আনন্দ, এমন কি কোনো লম্পট পিতার মতো, তিনি তাঁর কবিতার জনকত্ব পর্যন্ত মাঝে মাঝে অস্বীকার করেন।' উপর্যুক্ত প্রবন্ধটির রচনাকালের সময়সীমায় দীর্ঘ ছ'মাস বিনয় মানসিক চিকিৎসালয়ে ছিলেন, যখন একটিও কবিতা লেখেননি তিনি। কিন্তু হাসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, পুনরায় তাঁর কবিতার স্বতঃস্ফূর্ত লেখন-স্রোত লক্ষ্য করা যায় যে জন্য মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে তিনি অর্ধ শতাধিক কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। 'আমাদের কাছে বিনয় মজুমদার এক রহস্য। এবং উন্মোচন।' জ্যোতির্ময় তাঁর প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট ভাবে লিখলেন : 'বর্তমান প্রবন্ধ লেখক স্বীকার করেছেন যে তিনি নিজে আধুনিক সমালোচনার বুলি ও নানান মতের কুহকে বন্দী ছিলেন, তাঁর কাছে বিনয় মজুমদার কবিতার জাদু-রহস্য উন্মোচিত করেছেন। গত একশো বছরে বাংলা কবিতা বড়ো বিদগ্ধ, আত্মসচেতন, জটিল হয়ে উঠেছিল। কবিরাও বড় বেশি শিক্ষিত, সুরুচি-সম্পন্ন, সমাজে প্রতিষ্ঠাবান হয়ে যাচ্ছিলেন। এই চাতুর্যহীন, সরল, অভিযোগহীন কবিটি, এই অনায়াস বিদ্রোহীটি শুধু কবিতার প্রতি নয়, কবিত্বের প্রতি আমার আস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তিনি আজ অসুস্থ এবং অবলম্বনহীন উনত্রিশ বছর বয়সেই তিনি জীবন থেকে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেছেন। জানি না এই প্রবন্ধ তাঁকে নতুন কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ, কিংবা অন্য কোনো পাঠককে তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট করবে কিনা। না করুক। তাঁর কবিতার জন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে আমার উপায় ছিল না।' 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় একুশতম সংকলনে 'এই সংখ্যার লেখক' শিরোনামে জ্যোতির্ময় দত্ত-র পরিচিতি দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হল : 'বিনয় মজুমদার সম্পর্কে কৃত্তিবাসের গত সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ আধুনিক সমালোচনার সার্থক দৃষ্টান্ত।'

ক্রমান্বয়ে বিনয় শুধু বাঙালি পাঠক বা কবিমহলে নয়, ভারতীয় অন্য ভাষাতেও, বিশেষত হিন্দি ভাষার কবিমহলে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেন। হিন্দি একটি পত্রিকায়, তাঁর কবিতার অনুবাদ প্রকাশ হয়, এবং তদানীন্তন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবেও তাঁকে অভিহিত করা হয়। বিখ্যাত বঙ্গভাষা প্রেমিক এডওয়ার্ড ডিমক-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, এই পর্বেই।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার তেইশতম সংকলনে (শরৎকাল ১৩৭৩) বিনয় মজুমদারের প্রাধান্য পুনরায় লক্ষিত হয়। 'দশটি কবিতা' শিরোনামে বিনয়-এর শিরোনামহীন একগুচ্ছ কবিতা প্রকাশিত হয়। আলোচ্য সংকলনটিতে 'কয়েকজন সাম্প্রতিক কবি : তাঁদের কবিতা' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক রচনার প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়, যাতে আলোচিত হন পঞ্চাশের পাঁচজন কবি 'জন্ম-সালের বিচারে যাঁরা ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ এর অন্তর্গত, আর কবি হিসাবে যাঁদের আবির্ভাব পঞ্চাশের পরে বা ওই সময়কে ছুঁয়ে।' এই আলোচনায় যথাক্রমে আলোক সরকার, বিনয় মজুমদার, শরৎ-কুমার মুখোপাধ্যায় ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আলোচিত হলেন। উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করে, প্রবন্ধকার জ্যোতির্ময় ঘোষ বিনয়-এর কবিতায় 'চকিত চিত্র' ও উপমাবহুল 'বিশেষ

সম্পদ'-এর কথা উল্লেখ করলেন। তাঁর কবিতার প্রকরণ বিষয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে লিখলেন : 'জীবনানন্দের শব্দভাণ্ডার ও সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাত্মক বিন্যাস কোনো অভিনব রসায়নাগারে জৈবিক প্রথায় মিলিয়ে দিলে বিনয়ের কবিতার কাছাকাছি পৌঁছায়।' জ্যোতির্ময় বিনয়-প্রাসঙ্গিক অংশের উপসংহারে জানালেন : 'বিনয়ের কবিতাগুচ্ছ স্পষ্টত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম দিকে কবি বিষণ্ণ, মিতবাক্, লাঞ্ছিত, নম্র, অবসন্ন ; তখন জীবনানন্দীয় ভঙ্গীটা চলে আসে। বিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই বলেছি—একটিমাত্র অভিজ্ঞতাও যদি কবির স্বোপার্জিত ও গভীরতালব্ধ হয়, তাহলেও আমরা কিছু সৎ ও সার্থক কবিতার আশা করতে পারি—বস্তুত বিনয়ের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। শুধু আঙ্গিকে বিষাদ-বিনতির স্বাধর্মসূত্রে জীবনানন্দের শব্দাবলী অনিবার্যত এসেছে, আর শেষ পর্যায়ে কবিতায় যখন শাস্ত্র, তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত নির্মাণে তৎপর হ'য়ে উঠেছেন, তখন সুধীন্দ্রনাথের গদ্যাত্মক বিন্যাস তাঁকে আহ্বান ক'রেছে। তবু, যে-বিশেষ অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব পরিপ্রেক্ষণী সুদূর ছিলো না, সেখানে অগ্রজ কবির অনুপ্রবেশ তাঁর আত্মমগ্ন বেপরোয়া নিশ্চেষ্ট কবি স্বভাবের স্মারক হ'য়ে অন্যান্য সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের বিপদসঙ্কেত দ্যোতক হয়ে থাকল।'

তিন

দেখা যায়, বিনয় মজুমদার, তাঁর কাব্যচর্চায় কখনো সম্পূর্ণ নীরব আবার কখনো যেন তাঁর সৃষ্টির অবাধ উৎসারণে অধিকমাত্রায় বাঙ্ময়। ভাবা যায় না, 'অঘ্রানের অনুভূতি-মালা' নামে তার ছয়ভাগে বিভক্ত কাব্যমালা রচনা করতে মাত্র একমাস সময় লেগেছিল। সেগুলি সংখ্যানুক্রমিক পর্বে বিভক্ত, যথাক্রমে 'অনুভব', 'এক্ষণ', 'কৃত্তিবাস' 'দৈনিক কবিতা' এবং 'কলকাতা' পত্রিকায় প্রকাশিত। শেষোক্ত পত্রিকাটিতে বিলম্বিত তৃতীয় পর্বটি মুদ্রিত হয় ; 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় পরপর দুটি সংখ্যায় স্থান পায় চতুর্থ এবং পঞ্চম ভাগ। ১৯৭০ সালে মুদ্রিত একটি সাক্ষাৎকারে বিনয় জানিয়েছিলেন, 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা-৪' তাঁর স্বরচিত প্রিয় কবিতা। 'ফিরে এসো, চাকা'-র পর 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' কাব্যগুচ্ছ শুধু নতুন স্বাদের নয়, বাংলা কাব্যক্ষেত্রে বিনয়-এর অবস্থানে নতুন মাত্রা সংযোজনের সহায়ক হয়েছিল। বিনয় তাঁর 'আত্ম-পরিচয়'-এ লিখেছিলেন : 'এর পরে কবিতা লেখার গতি খুব মন্দ হয়ে আসে। ১৯৬৭, ১৯৬৮, ১৯৬৯ এই তিন বছরে আমি গোটা পঁচিশেক কবিতা লিখেছি। তাও আবার খুব ছোট আকারের।'

১৯৬৬ সালের পরবর্তী সময় থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত কবিতা-পত্রিকাগুলির ক্ষেত্রে নানা ধরনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটতে দেখা যায় ; কখনো দেখা যায় পুরনো পত্রিকাগুলি একটার পর একটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কখনো কাব্যক্ষেত্রে চাঞ্চল্য জাগিয়ে কবিতা নিয়ে তোলপাড় করে প্রকাশিত হচ্ছে একটার পর একটা নতুন পত্রিকা। এই সব নব প্রকাশিত পত্রিকায় বিনয় কখনো উল্লেখযোগ্য কবি হিসাবে উপস্থিত, আবার

কখনো তাঁর কাব্যানুসরণে অন্য কেউ রচনা করছেন কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ। বিনয় 'আত্মপরিচয়'-এ জানিয়েছিলেন : 'ইতিমধ্যে বাংলা কবিতা পত্রিকার রাজ্যে দারুণ ওলট পালট হয়ে গেছে ; কৃত্তিবাস, অনুভব, উত্তরঙ্গ, প্রভৃতি ছোট পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। হঠাৎ সকলে দল বেঁধে দৈনিক কবিতা, সাপ্তাহিক কবিতা, প্রভৃতি প্রকাশ করতে লেগে গেছে। শক্তি নিজে সাপ্তাহিক কবিতার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছে। সারস্বত নামে একটি পত্রিকা দিলীপ গুপ্তর সম্পাদনায় বেরিয়ে আবার হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। গল্প কবিতা, কলকাতা প্রভৃতি নতুন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করল। আমাকে এইসব উদ্যমে কেউ ডাকে নি, আর আমার নিজের যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না।' একথা ঠিক, বিনয়-এর এই স্মৃতিচর্চায় সবকটি তথ্যই নির্ভুল বা সঠিক নয়, উপর্যুক্ত পত্রিকার অনেকগুলিতেই তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গিয়েছে, বরং কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর প্রাধান্যও বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বরং এই পর্বে গদ্যকার বা প্রবন্ধকার বিনয় মজুমদার-এর পরিচয় পাঠকমহলে কিছুটা নতুন স্বাদ বয়ে আনে। 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' নামে 'কলকাতা' পত্রিকায় তাঁর একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, কাব্যরস বা কবিতার রস বিষয়ে তাঁর স্বভাবগম্ভীর রচনাটি সুখপাঠ্য নয়, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজস্বতামণ্ডিত এক রহস্যময় ব্যাখ্যাতা হিসাবে তাঁর আবির্ভাব তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ইতিপূর্বে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার বাইশতম সংকলনে (১৯৬৬) বিনয় 'এইসব সত্য' শীর্ষক একটি গদ্য রচনায় নিজের কবিতায় বারবার ফিরে আসা এক ঈশ্বরীর অনুভূতির স্বপক্ষে কিংবা তাঁর নিজেরই দ্বৈতসত্তার এক নিবিড় পরিচয় উম্ঘাটন করে লিখেছিলেন : 'কারো সঙ্গে কথা না বলে শুধু আপন মনে বাস করা। এমন মানসিক স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করা, যার ফলে একাকিত্ববোধ আর থাকে না। আমি অবশ্য নিজেই ঈশ্বরীরূপে আমার কানের কাছে চিরকাল কথা বলি এবং মুখ দিয়ে ঈশ্বররূপে তার জবাব দিই। এইভাবে আমাদের বাক্যালাপ চলে। ভালোবাসাবাসি চলে।'

তাছাড়াও উপর্যুক্ত তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য পত্রিকার কথা উল্লেখ করেননি বিনয়, 'কবিতা পরিচয়' নামে সেই নতুন ধরনের পত্রিকায় তাঁর উপস্থিতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হল, জ্যোতির্ময় দত্ত রচিত বিনয়-এর দুটি কবিতার বিষয়ে আলোচনা। প্রথমটি প্রকৃতপক্ষে পুনর্মুদ্রণ, বিংশ সংকলনে 'বিনয় মজুমদার কবিতার শহিদ' শীর্ষক দীর্ঘ রচনার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ ; দ্বিতীয়টির শিরোনাম : 'একটি উজ্জ্বল মাছ : বিনয় মজুমদার'—যেখানে জ্যোতির্ময় লিখেছিলেন : 'ফিরে এসো, চাকা'-র মধ্যে ভাব ও চিন্তার বিবর্তন আছে, কিন্তু প্রকরণের নেই ; এই চক্রের প্রথম থেকেই বিনয় মজুমদার এক পরিণত কবি। তিনি ধীরে ধীরে এখানে পৌঁছাননি, যেন মুহূর্তেই আবির্ভূত হলেন, এক নতুন চেতনার জন্মের তারিখ সচরাচর উল্লেখ করা যায় না, এমন কি নির্ঝরের স্বপনভঙ্গের আগে ও পরে রবীন্দ্রনাথ বদলেছেন। কিন্তু ,ফিরে এসো, চাকা'র কবি পূর্বাপরহীন। ১৯৬০-এর ৩রা মার্চ বিনয় মজুমদার একটি

নতুন চেতনার জন্ম দিলেন, একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ কল্পলোক, যেন সম্পূর্ণ ইতিহাসমুক্ত, যার গর্ভ ও শৈশবের মলিনতা নেই।' এই 'কবিতা পরিচয়' মাসিক পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় আধুনিক বাংলা কবিতার এক তন্নিষ্ঠ আলোচক হিসাবেও বিনয়-এর অন্যতর পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। জীবনানন্দর সার্থক উত্তরসূরী হিসাবে তখন তাঁর কাব্যপ্রচেষ্টাকে চিহ্নিত করা হতে থাকে বিভিন্ন আলোচনায়, সেদিক থেকে জীবনানন্দর কবিতার এক আগ্রহী পাঠকের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায় 'অদ্ভুত আঁধার এক' শীর্ষক আলোচনায়। শুধু জীবনানন্দ নয়, এই একই পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ-এর 'নষ্টনীড়' কবিতা বিষয়ে দীপ্তি ত্রিপাঠীর আলোচনাতেও অংশগ্রহণ করেন বিনয়। এইসব রচনার সূত্রে বিনয়-এর এক মগ্ন এবং স্পষ্ট পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়, নিজের সমকাল কিংবা সদ্য যে কাল অতিক্রম করে এসেছেন তাঁরা, সেই উভয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না তিনি।

ষষ্ঠ দশকের শেষ পর্যায়ে বিনয় মজুমদার, বাংলা কাব্যজগতে হয়ত জনপ্রিয় কবি হিসাবে বিবেচিত হননি, কিন্তু তাঁর বিশেষ মেজাজের কবিতা বাঙালি পাঠক উপেক্ষাও করেননি। উল্লেখ করা যায়, 'বিশ্বে প্রথম' এই দাবি নিয়ে 'দৈনিক কবিতা' (১৯৭০) পত্রিকার পক্ষ থেকে পল্লব সেনগুপ্তর সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে এক অদ্ভুত কবি-সমীক্ষার আয়োজন হয়েছিল—জনপ্রিয়তার ক্রমানুসারে বিনয় মজুমদারও সেই তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন দশ-বারো জনের মধ্যেই। পঞ্চাশের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের একত্রিত করে 'এই দশকের কবিতা' (১৯৬৯) সংকলনটি শংকর চট্টোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী সম্পাদনা করেন পঞ্চাশের কবিদের নিয়ে 'একালের প্রেমের কবিতা' (১৯৬৯) নামের একটি সংগ্রহের ; এই সময় শান্তনু দাস ও রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' (১৯৭০), অমিতাভ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'কবিতার পুরুষ'-ও (১৯৭০) প্রকাশিত হয়—এই সব কটি সংকলনেই বিনয় মজুমদার গৃহীত হয়েছেন সসম্মানে। লক্ষ্য করার বিষয় নিজের সংকলনের কবিতা নির্বাচনে যেমন তিনি সর্বদা সতর্ক থাকতেন, তেমন অন্যের সম্পাদনায় তাঁর কবিতার সংযুক্তির বিষয়েও সব সময় উদাসীন ছিলেন না। যে জন্য 'কবিতার পুরুষ' কিংবা 'স্বনির্বাচিত' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত তাঁর কবিতার সার্থক প্রতিনিধিত্ব ছিল না বলে পরবর্তীকালে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার তাঁর কাব্যজীবনে এক বিশেষ মর্যাদাকর ঘটনা—বুদ্ধদেব বসু, 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের পঞ্চম সংস্করণে (সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩) বিনয়-এর কবিতা খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন।

'প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে মুগ্ধ করেছিল'—এই প্রশ্নের জবাবে এক মুদ্রিত সাক্ষাৎকারে বিনয় জানিয়েছিলেন : 'না', কারো দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার কোনো অবকাশ ছিল না। আসলে বিনয়কে নিয়ে কখনো-সখনো কোনো দল হুজুগে মাতলেও, কোনো বিশেষ দলের ভাবনা-চিন্তা দ্বারা কখনো আন্দোলিত হননি তিনি। সম্পূর্ণ নিজস্ব ভাবনার বৃত্তে তাঁর সঞ্চরণ, হয়ত, একাকিত্বের এই পথ-পরিক্রমায় ক্লান্তি

নেমেছে, থেমে গিয়েছেন মাঝে-মাঝে, শারীরিক অসুস্থতা কিংবা নতুন পথের সন্ধানের কারণে। কিন্তু সেসব ঘটেছে তাঁর নিজের স্বভাব-মন্থরতার অনুসরণে। বিনয় তাঁর 'আত্ম-পরিচয়'-এ এই বিরতির প্রসঙ্গে যুক্তি দেখিয়েছিলেন : 'মাঝে মাঝে কবিতা লেখা যে বন্ধ থাকত তার প্রধান কারণ ছিল বিষয়বস্তুর অভাব। বিষয়বস্তু খুঁজে পেতাম না আমি। চারিপাশে যে সকল দৃশ্য দেখি, আমরা সকলেই দেখি, তার হুবহু বর্ণনা লিখলে কবিতা হয় না। সেই দৃশ্য আদৌ কেন আছে, কী কারণে বিশ্বে তার থাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, বিশ্বে নামাবলী ও গঠনপ্রকৃতি ঐ দৃশ্যে কতটুকু প্রকাশিত হয়েছে—এই সব বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত করে না দিলে আধুনিক কবিতা হয় না। কিন্তু যুক্ত করতে হলে ঐ সব জানা দরকার। এই সব দার্শনিক বিষয় ভাবতে ভাবতে আমার সময় চলে যেত মাসের পর মাস।' এরকম, এক দীর্ঘ নীরবতার পর বাসুদেব চট্টো-পাধ্যায়ের 'উত্তরণ' পত্রিকায় তাঁর 'অধিকন্তু' পর্যায়ের কবিতাগুলি তিনি লিখেছিলেন সম্পাদকের উপর্যুপরি অনুরোধের সূত্রে। এ জন্য আবহমান বাংলা কবিতার ধারায় তাঁর দলছুট-স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কবিতা ছাড়া সবকিছুর প্রতি উপেক্ষার এক অমোঘ ও অবশ্যম্ভাবী আচরণে তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই নতুন। সত্তরের দশকে রাজনৈতিক কারণে যখন পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল, তখন 'কবিতা পরিচয়' পত্রিকার উদ্যোগে এক মুদ্রিত সাক্ষাৎকারের উপলক্ষে প্রবীণ ও নবীনের মেলায় বিনয়ও সামিল হয়েছিলেন কিন্তু তখনকার 'তীক্ষ্ণ রাজনৈতিক সচেতনতা ও তীব্র সামাজিক অস্থিরতা' তাঁকে লেখার সময় সচেতনভাবে প্রভাবিত করে না, একথা বলতে তার কোনো দ্বিধা হয়নি। আসলে কবিতার চেয়ে কোনো কিছু বড় করে দেখেননি বিনয়, এমনকি নিজের জীবনের চেয়েও। এক অর্থে কবিতার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গীকৃত। জীবন ও কাব্যাত্মার পরস্পর-বিচ্ছিন্ন অলীক যাত্রায়, তাঁর কবিতা তাঁর আত্মজীবনেরই এক অনবচ্ছিন্ন প্রকাশ। তাই দেখা যায়, মানসিক অসুস্থতায় যখন তিনি হাসপাতালে, তখনো সাহিত্য ছাড়তে পারেননি, হাসপাতালের ভিতরে হাতে-লেখা পত্রিকার প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য, এক সময় গোবরা মানসিক হাসপাতালে কিছুকাল সহবাসী ঋত্বিক ঘটক-এর মতো বিরল প্রতিভার সঙ্গে সংযুক্তি ঘটেছিল তাঁর। এমনও হয়েছে, ঋত্বিক রচিত নাটকে অন্যতম অভিনেতা হিসাবেও অংশগ্রহণ করেছিলেন তিনি।

ষাটের শেষের কয়েকটি বছর বিনয়-এর অসুস্থতা ক্রমশ খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে, তিলজলায় গোবরা মানসিক হাসপাতালে তাঁকে চিকিৎসাধীন থাকতে হয়; একবার এই অসুস্থ শরীরে তিনি পায়ে হেঁটে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পেরিয়ে ফরিদপুরে এক মুসলমান পরিবারে আশ্রিত হন। তারপর, স্বেচ্ছায় সে দেশের পুলিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করে সে দেশের নাগরিকতা পাওয়ার প্রত্যাশা জানান, অবশেষে তাঁদেরই সহযোগিতায় পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। এমনকি এরকম অবস্থাতেও, কবিতার কেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাননি।

সত্তরের শুরুতে 'ফিরে এসো, চাকা'-র কলকাতা সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সুদৃশ্য

সেই শোভন সংস্করণের লেখক পরিচিতিতে জানানো হয় : 'এখন তিনি নিয়মিত কর্ম করেন না। ঠিকানা : কফি হাউস, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা।' 'দেশ' পত্রিকায় 'একটি অসাধারণ কবিতার বই' শিরোনামে, বিনয় বিষয়ে কিছু রোমাঞ্চকর তথ্য পরিবেশন করে সনাতন পাঠক লিখেছিলেন : 'এই কবিতার আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কবিতাগুলি এক নজরে পড়লেই বোঝা যায়, দুর্লভ এক কবির হৃদয় বা মস্তিষ্ক এগুলি রচনা করেছে। এই কবিতা চৈতন্যের অনেক ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। এই কবিতা উপভোগ করার, আলোচনা করার নয়।' এই আলোচনায় অন্যত্র সনাতন পাঠক লিখেছেন : 'বিনয় মজুমদারের মতো কবি পৃথিবীর যে কোনো দেশেই দুর্লভ। বাংলাদেশ কবিতার দেশ—এটা নিতান্তই ছেঁদো কথা, যদি সত্যি তাই হতো তাহলে বাংলাদেশের মাথায় করে রাখা উচিত ছিল। অবশ্য মাথায় করে রাখলেই যে তিনি থাকতেন তা মনে হয় না, ওই রকম কুস্থান তিনি অচিরেই পরিহার করতেন, কিন্তু সেটা অন্য কথা।'

একথা ঠিক, দ্বিতীয় বার 'ফিরে এসো, চাকা' প্রকাশে বিনয় মজুমদার-এর কবি-খ্যাতি আধুনিক কাব্যপাঠক মহলে নতুন মাত্রা পায়। ১৯৭০ সালে 'কলকাতা' পত্রিকার বিজ্ঞাপনে লেখা হয় : '...বর্তমান কলকাতা সংস্করণ এই গুপ্ত ও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থটিকে সর্বসমক্ষে উন্মোচিত করেছে। এবং এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'ফিরে এসে, চাকা' কেবল কোন ক্ষুদ্র, ভূগর্ভস্থ গোষ্ঠীর গোপন সম্পদ নয়, তা বাংলা কবিতার প্রধান ধারারই এক অর্ধচক্রাকার বাঁক। 'ফিরে এসো, চাকা' ধূসর পাণ্ডুলিপি কি 'অর্কেস্ট্রা'র তুল্য গ্রন্থ। এবং এর কবি জীবিত নন, তিনি বাংলা কবিতার অমরদের একজন।'*

একেবারে সূচনা থেকেই বিনয় মজুমদার নিজের কবিতার পরিমণ্ডল নিজেই গড়েছেন। কোনো অনুসরণ, কোনো অনুকরণ, কোনো পৃষ্ঠপোষকতার সুচারু পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর কাব্যপ্রতিভা বিকশিত হয়নি। শোনা যায়, এক সময় নিজের কাব্য-পুস্তিকা, নিজেই ছেপেছেন, নিজেই কম্পোজ করেছেন, আবার নিজেই বই-হাটে রেখে এসেছেন, যদি বিক্রি হয় এই ভরসায়। এইভাবে সম্পূর্ণ নিজের পথেই তাঁর পরিভ্রমণ—চলার পথে নিছকই চলার শর্তেই কোনো দলে কিংবা সম্প্রদায়ে একত্রিত হয়েছেন, কিন্তু ক্ষণিকের সেই সম্মেলন শুধু বহিরঙ্গে। ছয়ের থেকে প্রতিটি দশকেই তাঁকে দেখতে পেয়েছি, তাঁকে নিয়ে মাঝে-মাঝেই সরব গুণকীর্তনের আয়োজন হয়েছে—পত্রিকায়, কাব্যসভায় কিংবা সম্বর্ধনায় ; 'সীমান্ত সাহিত্য', 'স্বষ্টা', 'কবিতীর্থ', 'পণ', 'নৌকো', 'মেঘদূত' প্রভৃতি ক্ষুদ্র-পত্রিকায় তাঁকে অবলম্বন করে নানাভাবে মূল্যায়নের চেষ্টাও হয়েছে। এমনকি, 'বিনয় পরিমণ্ডল' নামে একটি সংগঠন বা পত্রিকা প্রকাশ কেন্দ্রও স্থাপিত হয়েছে, হয়ত ঠাকুরনগর বা শিমুলপুরের সংলগ্ন কোনো গ্রামে। লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের উদ্যোগে, বিনয় মজুমদার যখন

*বিজ্ঞাপনটির উল্লেখ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধেও আছে। সম্পূর্ণ বয়ানের জন্য পৃ. ১২০ দ্রষ্টব্য।

সম্বর্ধিত হয়েছিলেন ১৯৮৮ সালে, তখন তাঁর 'গায়ত্রীকে' পুস্তিকাও পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, সেই কেন্দ্রের দশম বর্ষপূর্তিতে। তা সত্ত্বেও আমাদের স্মৃতি-বিস্মৃতির নানা ধাপ পেরিয়ে বিনয় তাঁর কবিতার রূপে রূপান্তরে ক্রম-অগ্রসরমান এক উদাসীন পথিক, এখনো পর্যন্ত তিনিই তাঁর কবিতার প্রধান পরিবেশক, অন্যতম পৃষ্ঠপোষক এবং প্রকৃত সমালোচক। এক অর্থে বিনয় মজুমদার গত তিরিশ বছরের বাংলা কবিতায় এক একাকী পুরুষ : একটি নিঃসঙ্গ উদাহরণ। □

বিনয় মজুমদার-এর ডায়েরি

দিনপঞ্জী লিখে লিখে এতটা বয়স হল। দিনপঞ্জী মানুষের মনের নিকটতম লেখা।
(আমি তো প্রত্যেকবার : বিনয় মজুমদার)

১১.৪.৮৮

ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে গেলাম ভবেশের চায়ের দোকানে। রুটি ছিল না। সেই-হেতু দুখানা বিস্কুট আর চা খেলাম। দোকান থেকে ফিরে এসে একটি কবিতা লিখলাম—তার গন্ধরাজ ফুলগাছটিকে দুইভাগে বিভক্ত করেছে। এই কবিতাটি লিখলাম। তারপরে আমাদের গ্রামের পুরোহিত পূজারী ব্রাহ্মণ সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি গেলাম। গিয়ে শুনলাম, সুধীর পুরোহিত বাড়িতে নেই। সুধীর পুরোহিত মশায়ের ছেলে সমরেশ আমাকে বসতে দিল বারান্দায় চৌকির উপরে। সমরেশ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বইখানা পড়ছিল। সমরেশের অনুরোধে দুটি কবিতা লিখে দিলাম—একটায় সমরেশের নাম আছে, আর অন্যটায় সীমা-র নাম আছে।

তার পরে অমলেন্দুর বাড়ি গেলাম। ডাকঘরে গেলাম, ব্যাঙ্কে গেলাম। একজন সাধু আমেরিকায় ছিলেন, তার সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা কথা হল। বিকালে ভবানী ঘটক।

১২.৪.৮৮

ভবেশের দোকানে চা রুটি খেলাম ভোর ৬-৩০ নাগাদ। অমলেন্দু বিশ্বাসের বাড়িতে গিয়ে 'ক্যাম্পাস' পত্রিকাটি পেলাম, যাতে আমার লেখা আছে। তারপরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে ভবানী ঘটক এল, বৃন্দাবন, রণজিৎ এরাও ছিল। সংবাদ পেলাম 'দেউটি' পত্রিকা বেরোবে। 'এই যে তোমার আলোকধেনু সূর্যতারা দলে দলে' গানটি সম্বন্ধে লিখলাম। ডাকঘরে গেলাম, কিছুই আসে নি আজ ডাকঘরে আমার জন্য। তারপরে বাড়ি ফিরে স্নান করলাম, আমার দালানের মধ্যে যে নলকূপ আছে তার জলে। বেরোলাম, মিত্র মহাশয়ের হোটেলে ভাত খেয়ে ব্যাঙ্কে গেলাম। আমার পেনশনের চেক এখনো ভাঙানো হয় নি। ফিরবার সময়ে ভবানীকে বললাম, কাল আবার আসতে। আজ সারাদিনে দুটি কবিতা লিখেছি। বিকালে ভালো আড্ডা দিলাম আমি, দেবদুলাল, বৃন্দাবন রেল ওভার-ব্রীজের উপরে বসে। খেলাম হোটেলে, বাড়ি ফিরলাম।

১৩.৪.৮৮

আজ যথারীতি ভবেশ। তার পরে অমলেন্দুর কাছে গেলাম 'অতএব' পত্রিকা পেয়েছে কিনা খোঁজ নিতে। 'অতএব' পাওয়া গেল না। অমলেন্দুর বাড়ি থেকে সুব্রত দে-র

কাছে গেলাম। রাস্তায় সুব্রত-র দাদা দেবব্রত-র সঙ্গে দেখা। সুব্রত-কে আমার পেনশনের চেকখানির কথা বলেছি। সুব্রত আমার পেনশনের চেকের বিষয় সংক্ষেপে কাগজে লিখে নিল। সুব্রত-র কর্মস্থল বারাসাত যেখান থেকে পাই আমি আমার পেনশনের চেকও।

তার পরে বাজারে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসে থাকলাম। এ অঞ্চলের অনেক সাহিত্যসেবী এই দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে এসে আড্ডা দিই আমরা। ভবানী ঘটক বনগাঁ থেকে এল আমাদের আড্ডায় গোটা দশেকের সময়ে।

দুপুরে শুয়ে থাকলাম। ঘুমিয়ে ছিলাম দুপুরে। ঘুম থেকে উঠেই প্রথম গেলাম ব্যাঙ্কে। সেখান থেকে ভবেশের দোকানে চা দুটি খেলাম। সন্ধ্যের সময় আমার উঠানে ঘাসের উপরে বসে সাহিত্যালোচনা করলাম আমি, ভবানী ঘটক, অমলেন্দু, আরো অনেকে।

১৫.৪.৮৮

ভোরবেলা উঠে ভবেশের দোকান। সেখান থেকে আদিত্যবাবুর বাড়ি। আশীষের কাছে গেছলাম। ডিম ভাজা খেলাম। 'ভারতকোষ' গ্রন্থখানি আশীষ আমাকে দেখালো। ভারতকোষে 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব' লেখায় আমার নাম আছে, আশীষ দেখলো। 'ভারতকোষে' আন্তন পাবলোভিচ চেখভ-জীবনীটি আমি লিখেছি। আমি ও আশীষ দেখলাম। তার পরে আমার, আশীষের আর আশীষের স্ত্রীর আলোকচিত্র তুললাম 'মোনালিসা' নামক আলোকচিত্র-তোলার দোকানে। এরপরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে এলাম। তারপরে ডাকঘরে গেলাম। বাড়ী ফিরলাম, স্নান করলাম। তার পরে দুপুরে ভাত খেলাম মিত্র মশায়ের হোটেলে। নিরামিষ ভাত। তার পরে বাড়ি ফিরলাম। বিকাল ৩½টায় আবার ভবেশের দোকানে চা দুটি খেলাম। ঘরে এলাম আমার লণ্ঠনটির কেরোসিন তেল নিয়ে। যেই বাজারে গেছি অমনি ভবানী ঘটকের আবির্ভাব। আমি আর ভবানী আমার বাড়িতে এসে আমার উঠানের ঘাসের উপরে বসলাম। আমি মুখে মুখে গান রচনা, সুরারোপ এবং গাওয়া সঙ্গে সেরে একটি গান শোনালাম ঘটককে, বলতো কার গান? ঘটক বলল রবীন্দ্রসংগীত সুর শুনে। আসলে আমার গান।

শনিবার, (১৬.৪.৮৮)

ভোরে উঠে ভবেশের চায়ের দোকানে চা দুটি খেলাম। গেলাম অমলেন্দুর বাড়ি। অল্পক্ষণ বসে এসে কবিতা লিখলাম দুটি। তারপরে দেবদুলাল মিস্ত্রীর মিষ্টির দোকানে। সেখান থেকে আশুতোষ দর্জি এবং মধুসূদন ঘটকের দোকানে। সেখান থেকে গেলাম ডাকঘরে। ডাকঘরে কিছু আমার নামে আসে নি। বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই—দেবদুলালের দোকানে আসার আগেই স্নান করেছিলাম। হোটেলে খেয়ে ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে আমার পেনশনের টাকার চেক আজো ভাঙানো হয় নি। বাড়ি

ফিরলাম। শুয়ে শুয়ে সাড়ে তিনটে। তার পরে ভবেশের দোকান, পঙ্কজ এল অফিস ফেরৎ। পঙ্কজ আর আমি চা খেলাম একসঙ্গে। পঙ্কজের লেখা কবিতা পড়ে আমাকে শোনালো পঙ্কজ।

এইভাবে রাত সাতটা নাগাদ মিত্র মশায়ের হোটেলে খেয়ে ঘরে ফিরলাম।

রবিবার (১৭.৪.৮৮)

ভোরে ভবেশের দোকান সেখান থেকে অমলেন্দুর বাড়ি, রঞ্জিতের মুদির দোকানে, সেখান থেকে ফিরছিলাম যখন একটি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। আমি ফেলে দিয়েছিলাম যে সব চিঠিপত্র ও বই, সেগুলির কিছু অংশ যুবকটির কাছে আছে। দুপুরে ভাত খেলাম। তারপরে আড্ডা দিলাম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে। রণজিৎ, পঙ্কজ, অমলেন্দু, বৃন্দাবন, দেবদুলাল প্রমুখের সঙ্গে আমি আড্ডা দিলাম। পরে বাড়ি ফিরলাম।

সন্ধ্যের সময়ে দেখা হলো ভবানী ঘটকের সঙ্গে। ভবানী, দেবদুলাল, প্রণয়, সজল ও আমি আড্ডা দিলাম রেলওয়ে ওভারব্রীজে বসে। ভবানী গান শোনালো—সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে···আমি গান গেয়ে শোনালাম—সকরুণ বেণু বাজায়ে।

সোমবার (১৮.৪.৮৮)

ভোরবেলা উঠেই আমার শ্যামা মাসির ছেলে খোকনের কাছে গেলাম। খোকন তখনো শয্যাত্যাগ করে নি। ফিরে এলাম, ভবেশের দোকানে চা খেয়ে বাড়িতে এলাম, লিখলাম। ঠিক এই সময় এলেন সাংবাদিক দীপেন বসু। দীপেন বসু আমার সাক্ষাৎকার নিলেন। আমার খানকয়েক আলোকচিত্র তুললেন বেলা পৌনে নটা নাগাদ। তারপরে আমি ঠাকুরনগর বাজারে গেলাম, দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসলাম। খানিকক্ষণ কবিতা আলোচনা করলাম, ভবানী ঘটক এল, ভবানীকে নিয়ে ডাকঘরে গেলাম, বাড়ি ফিরলাম। স্নান করলাম। ভবানীকে নিয়ে বাড়ি এসেছিলাম। ভবানী আমি বাড়ি থেকে বেরোলাম। ভবানী খেল দুলালের মিষ্টির দোকানে, আমি ভাত খেলাম মিত্র মশায়ের হোটেলে। তারপরে ব্যাঙ্কে গেলাম—আমার পেনশনের টাকা পেলাম।

সন্ধ্যায় রেল ওভারব্রীজের উপরে উঠে আড্ডা দিলাম আমি, ভবানী ঘটক, অমলেন্দু, দেবদুলাল বৃন্দাবন ও আরো অনেকে।

১৯.৪.৮৮

ঘুম থেকে উঠে গেলাম বাইরে। দেখি আমার মাসির একমাত্র ছেলে খোকন বসে আছে ভবেশের চায়ের দোকানে। আমিও ভবেশের দোকানে চা খেয়ে ঘরে ফিরলাম এবং কবিতা লিখলাম তিনটি। তারপরে বাইরে বেরোলাম, গেলাম দেবদুলালের দোকানে। সেখানে দেখা হল রণজিৎ, পাঁচুগোপাল, বৃন্দাবন, দেবদুলাল, সজল ইত্যাদির সঙ্গে। আমাকে নানা প্রশ্ন করল। বাড়ি ফিরলাম, স্নান করলাম, বাইরে গেলাম—মিত্র

মশায়ের দোকানে ভাত খেলাম। তারপরে ফেরার পথে বৃন্দাবনের সঙ্গে একটু কথা বলে ঘরে এসে শুলাম।
দুপুরে ঘুমিয়েছি। বিকালে যথারীতি আড্ডা দিয়েছি। কিন্তু তার আগে ওষুধ কিনেছি বরুণের দোকান 'মেডি কেয়ার' থেকে। তার পরে আড্ডা দিয়েছি বিষ্ণুপদ বালা, বৃন্দাবন বিশ্বাস, দেবদুলাল মিস্ত্রীর সঙ্গে। সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করলাম আমরা। আমি ওদের বললাম, তোমরা এখন অস্পৃশ্যদের নেতা। ভেবে কাজ করবে। যে কোনো কাজ করার আগে ভেবে নেবে ভালো করে। আড্ডা দিতে দিতে সাড়ে সাতটা নাগাদ ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। হোটেলে খেয়েছি ঘরে ফিরেছি। বাতি জ্বালিয়েছি। ওষুধ খেয়েছি।

২০.৪.৮৮

আজ ভোরে গেলাম অমলেন্দুর বাড়ি। অমলেন্দু বিশ্বাসের কাছে রক্ষিত আমার চিঠিপত্র কয়খানা পড়লাম মনোযোগ দিয়ে। পড়ে আবার ফিরলাম। ব্যাঙ্কের পাশবই বাড়ি থেকে নিয়ে গেলাম বাজারে নটার সময়ে। রণজিৎ-এর সঙ্গে দেখা হল। তার পরে দেখি দুলাল হালদার সাইকেলে চড়ে এল। আমি দুলালের কাছে গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করলাম অনেকক্ষণ ধরে। তারপরে গেলাম ডাকঘরে—আমার নামে আজ কোনো চিঠিপত্র আসে নি। তারপরে গেলাম ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়াতে। সেখান থেকে উত্তমের হোটেলে, তার পরে বাড়ি ফিরে স্নান করলাম। মিত্র মশায়ের হোটেলে গিয়ে ভাত খেলাম। বাড়ি ফিরেছি, দুপুরে আমার কাছে এসেছিল আমার আপন মাসির ছেলে খোকন। তার পরে বিকালে ভবেশের দোকানে চা খেতে। চা খেয়ে বাজারে গিয়ে দেখি দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বৃন্দাবন বসে আছে, গতকাল বৃন্দাবন বলেছে যে বৃন্দাবনের বাবা সাইকেল রিক্সা চালায়। যাই হোক। দেবদুলাল আর আমি রেলওয়ে ওভারব্রীজের উপরে উঠে গল্প করছিলাম এমন সময়ে ভবানী ঘটক এবং হাবড়ার দেবব্রত এল। আমি এদের নিয়ে এসে আমার বাড়ির উঠানে এলাম এবং ঘাসের উপরে বসলাম। আজ সবাই তাড়াতাড়ি চলে গেল। মিত্র মশায়ের হোটেলে ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরে লিখছি।

২১.৪.৮৮

আজ ভোরে আমি কারো বাড়িতে বেড়াতে যাই নি। ভবেশের দোকানে চা রুটি খেয়ে কবিতা লিখেছি ভোরবেলা। এইখানে গতকাল যা করেছি তা একটু লিখে রাখি—গতকাল মিত্র মশায়ের ভাত খাবার হোটেলে ১৯৫ টাকা অগ্রিম দিয়েছি মে মাসের ২১ তারিখ পর্যন্ত নিরামিষ সহ ভাত খাবার জন্য। এবং ভবেশের দোকানে চা রুটি খাবার জন্য ১০০ টাকা অগ্রিম দিয়েছি।
আজ বিকালে দেবদুলাল, অমলেন্দু, বৃন্দাবন এবং আমি আমার বাড়ির উঠানে বসে আড্ডা দিয়েছি খুব। তার পরে যেই প্রবল বর্ষণ শুরু হলো অমনি আমার ঘরে নিয়ে এলাম সকলকে। বৃষ্টি থামলে আমরা সবাই বেরোলে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি···এসেছে।

...ব্রাহ্মণ।...কে জানিয়েছি যে আমি শূদ্র—নমশূদ্র।...

২২.৪.৮৮

আজ পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করে তাড়াতাড়ি রওনা হলাম কলকাতায় যাব ভেবে। আজ মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে যাবার দিন আমার। কিন্তু দেখা গেল ট্রেনের তারে গন্ডগোল অশোকনগরের কাছে এবং ট্রেন বন্ধ। গাড়ির টিকিট যেখানা কিনেছিলাম, সেখানা রেলস্টেশন মাস্টার মশায় ফেরৎ নিলেন। বললেন যে বেলা নয়টা নাগাদ গাড়ি চলতে পারে। নয়টায় কলকাতার উদ্দেশে রওনা হলে আমি এগারোটায় পৌঁছতে পারব। তাতেও আমার কাজ হবে হাসপাতালে। বেলা ১০-৩০ পর্যন্ত রেলগাড়ি চলে নি। সুতরাং আজ আর কলকাতা যাওয়া হল না। বাড়ি ফিরে স্নান করে ভাত খেয়ে এলাম। এবার বিশ্রাম।

বিকাল চারটায় একটি ট্রেন এল বনগাঁ থেকে, গেল গোবরডাঙ্গা পর্যন্ত, কলকাতা পর্যন্ত। আজ বিকালে দাড়ি কামালাম আগামীকাল কলকাতায় যাব বলে। আজ ভবানী ঘটক আসে নি।

আজ বিকালে আমার কত যন্ত্রবিদ্যার ও গণিতের আবিষ্কার ছাপা হয়েছে আমার নামে সেই তালিকা দিলাম। মিত্র মশাইয়ের হোটেলে ভাত খেয়ে অল্প বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে বাড়িতে ফিরলাম।

শনিবার (২৩.৪.৮৮)

ভোরে উঠে দেখি মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। আজ আমার কলকাতায় হাসপাতালে যাবার দিন। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করে জামাকাপড় পরে রওনা হলাম। রেলের স্টলে গিয়ে দেখি রুটি নেই। ফলে ছয়খানা নিমকি বিস্কুট ও চা খেলাম। তার পরে শিয়ালদার টিকেট কিনে রওনা হলাম ৭-১৫-র ট্রেনে চড়ে। ঠিক নটায় শিয়ালদহে পৌঁছলাম। স্টেশনেই একখানা গোল বনরুটি ও এক পেয়ালা চা খেলাম। তার পরে হেঁটে হেঁটে মেডিকাল কলেজ হাসপাতালে গেলাম। আমার রক্তচাপ নিলেন ডাক্তার দেবানন্দ সাহা। ভক্তি হরি গাংগুলি বললেন এর পরে মাসে মাসে হাসপাতালে না গিয়ে দুই মাস পরে পরে গেলেই হবে। আউটডোর বিভাগটি তিন নম্বর গেটে—এই তিন নং গেটের দুই পাশে দুটি লাল একতলা দালান। তিন নং গেট দিয়ে ঢুকেই বাঁ দিকে লেখা আউটডোর। তার পরে ১২-৩৫ এর ট্রেনে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরেই ফল্গু বসু আর উৎপল বসাক এল। রাত ৭-৪০ এর গাড়িতে ফল্গু বাড়ি চলে গেল।

রবিবার (২৪.৪.৮৮)

ভোরে তাপস বলল যে আমার ফেলে দেওয়া সব বই আছে আমার ভাড়াটে বিকাশ হালদারের কাছে। আজ আলোক সরকার কবির আসার কথা। দুপুরে ঘুমোলাম। তার পরে কেরোসিন তেল আনলাম লণ্ঠনের জন্য। বিকাল পাঁচটায় আলোক সরকার

এসেছিলেন আমার শিমুলপরের বাড়িতে। স্থানীয় তরুণ কবিগণও ছিল—অমলেন্দু, পঙ্কজ, রণজিৎ, গৌরী, তাপস, সজল ছিল। দেবদুলাল মিনিট দশেক ছিল।

সোমবার (২৫ এপ্রিল)

ভোরবেলা আমাদের গ্রামের রঞ্জিতের মুদির দোকানে গেলাম আমি অমলেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে। তার পরে বাড়ি ফিরে লিখছি। দুপুরে খেয়েছি ভাত। বিকালে গেলাম দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এল ভবানী ঘটক। আমি আর ভবানী এসে রেলওয়ে ওভারব্রীজে উঠে বসে থাকলাম। তারপরে আমি ও ভবানী আমার বাড়ির উঠানে এসে উঠানেই বসলাম। কয়েকটি গান গাইল ভবানী। আমি গেয়ে শোনালাম 'তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী।' আমি আর ভবানী আবার ফিরে গিয়ে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে বসলাম। সজল এল, সামান্য কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে আমরা তিনজনেই নেমে এলাম। এবং আমি ভাত খেয়ে বাড়ি এসে ওষুধ খেলাম। শুয়ে থাকব।

২৬.৪.৮৮

ভোরবেলা শয্যাত্যাগ করে আজ আর কারো বাড়িতে যাইনি। অনেক বেলা পর্যন্ত শুয়ে থেকে তারপরে দেবদুলাল মিস্ত্রীর মিষ্টির দোকানে গেলাম। সেখানে পরে এল অমলেন্দু ও রণজিৎ। আমি বললাম তোমরা একটি ব্যাপারে এখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছ যে আমি তোমাদের থেকে আলাদা অন্য প্রকারের জীব। বলো ঠিক কিনা? রণজিৎ বলল হ্যাঁ। অমলেন্দুও উত্তরে বলল—হ্যাঁ।

দুপুরবেলা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে ছিলাম। আমার বিছানায় আমি শুয়েছিলাম।

বিকালে বেরিয়ে নানান কথা হল দেবদুলালের সঙ্গে। আমার কথার জবাবে দেবদুলাল বলল যে দেবদুলাল স্বয়ম্ভূ। অমলেন্দু স্পষ্ট কিছু বলল না।...

২৭.৪.৮৮

আজ ভোরে শয্যাত্যাগ করে ইচ্ছা করেই শুয়ে থাকলাম বিছানায় এবং শয্যাত্যাগ করলাম বেশ দেরীতে। চা রুটির দোকানে গিয়ে দেখি নতুন রুটি এসেছে—পাউরুটি। তারপরে দেবদুলালের দোকানে গিয়ে বসে থাকলাম চুপচাপ। লেবু চা খেলাম মণ্টুর দোকানে। মণ্টুকে বললাম তোমার চা বানানো শিখতে লাগে একদিন মাত্র। আর আমি এমন কিছু শিখেছি যা শিখতে ১৬ বছর পড়তে হয়েছে। দ্যাখ আমি যদি মোটে ৭০০ টাকা মূলধন নিয়ে তোমার মতো একটি চায়ের দোকান খুলি তাতেই আমার সংসার চলে যায়—যেমন তোমার সংসার চলছে। কিন্তু আমাকে চায়ের দোকান খুলতেই দেবে না, লোকে বলবে, এত পড়াশুনা করে চায়ের দোকান, খুলতেই দেবেই না। ফলে অবস্থাটি বোঝ লেখাপড়া শিখলেই প্রায় ধ্বংস হয়ে যেতে হয়। মণ্টুও বলল—কত যুবক বি. এ. এম. এ. পাশ করে বেকার রয়েছে বছরের পর বছর, কাজ পায় না।

তারপরে আমি গেলাম ডাকঘরে। *Biography International*-এর চিঠি পেলাম। বাড়িতে এসে স্নান করলাম। কালীকৃষ্ণ গুহকে চিঠি লিখলাম। বাইরে গিয়ে হোটেলে ভাত খেলাম। বাড়ি ফিরলাম, শুলাম।···

২৮.৪.৮৮

ভোরবেলা অমলেন্দু বিশ্বাস-এর বাড়ি গেছলাম। চা রুটি খেতে গিয়ে অন্ধ রূপচাঁদ বৈরাগীর সঙ্গে দেখা। তাকে বললাম—রূপচাঁদ, তোমাকে নিয়ে আমি একটি কবিতা ভেবেছি বহু দিন আগে থেকে। আজ গিয়ে তাই লিখি। বাড়িতে এসে রূপচাঁদকে নিয়ে লিখলাম একটি কবিতা। সারাদিন আমার যায় টাকার চিন্তায়—অথচ টাকা আমার আছে যথেষ্ট।

বিকালবেলায় বেড়াতে গিয়ে দেখা হল···এর সঙ্গে। ···ব্রাহ্মণ। আমার কবিতা পড়ে দিন পাঁচেক আর কিছু ভাবা যায় না, গুম মেরে বসে থাকতে হয় ঘরের ভিতরে, কোনো কাজও করা যায় না দিন পাঁচেক, আমার বই 'ফিরে এসো, চাকা' পড়লে—এইসব কথা··· বলল। দেবদুলাল সাক্ষী।

২৯.৪.৮৮

ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুললাম ৫০/-, United Bank of India থেকে। স্নান করে ভাত খেয়ে ফিরছিলাম বাড়িতে। হঠাৎ বৃষ্টি এল। আমি শেষ পর্যন্ত রেল কেবিনের সিঁড়ি বেয়ে কেবিনের বারান্দায় এলাম। বারান্দায় আরো চারজন লোক ছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করে শুনলাম এদের একজনের বাড়ি উড়িষ্যায়। আমি উড়িষ্যাবাসী লোকটির কাছ থেকে শুনলাম যে আমার 'ফিরে এসো, চাকা' বইখানি উড়িষ্যায় যাত্রা হয়েছে। এবং 'ফিরে এসো, চাকা' যাত্রাটি দেখেছেন এই উড়িষ্যাবাসী লোকটি। বৃষ্টি একটু কমলেই আমি বাড়িতে ফিরে এলাম।

বিকালে দেবদুলালের দোকানে গিয়ে বসলাম এবং দেবদুলালকে বললাম ঐ লুঙ্গি-পরা লোকটিকে আমি ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়াব। নিলাম ঠিক, তবে সময় লাগল অনেক। আরেকজনকেও আমার ইচ্ছামতো একটি পথে নিলাম। এইভাবে লোক-দুটিকে চালালাম উচ্চতর গণিতের সাহায্যে—একথা আমি অনেক দিন আগেই দেবদুলালকে বলেছি।

৩০.৪.৮৮

ভোরবেলা ফণীবাবু এসে বললেন যে গণিতজ্ঞ সুনীল পাল আসবে আমাকে দেখতে। ফণীবাবুর বাড়িতে ভাত খেতে বললেন দুপুরে। আমি বললাম—আমি নিরামিষ খাই। ঠিক বেলা দশটায় আমার বন্ধু সুনীল পাল এসেছে আমার বাড়িতে। সঙ্গে আরো দুই ভদ্রলোক—আমরা সবাই ফণী মজুমদারের বাড়িতে দুপুরে ভাত খেয়েছি। দুপুরে ঘুমোলাম। বিকালে আমার বন্ধু সুনীল পাল এবং তার সহযাত্রী—এই তিনজনকে রেলগাড়িতে তুলে দিলাম। ওরা সব কলকাতায় ওদের বাড়িতে চলে গেল।

আমিও একটি টুথ পেস্ট কিনে—কলগেট টুথ পেস্ট কিনে বাড়িতে আনলাম।
তারপরে মিত্র মশায়ের হোটেলে নিরামিষ ভাত খেয়ে এসেছি। বর্তমানে লিখছি। ঘুমোব।

1 May / রবিবার, ১৮ বৈশাখ

১৮ই বৈশাখ ভোরবেলা তাপস এল হাতে একটি কৌটো নিয়ে। তাপস বলল পরোটা বানিয়েছে তাপসের কাকীমা—আমাকে খেতে বলেছে পরোটা। আমি শেষ পর্যন্ত খেলাম পরোটা দুইখানা, আলুভাজা সহযোগে। তার স্নান করে বাজারে গিয়ে অমলেন্দু, দেবদুলালের সঙ্গে দেখা হল। মিত্র মশায়ের হোটেলে ভাত খেয়ে বাড়িতে ফিরলাম। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের বড়ি খেলাম।

2 May / সোমবার

পলাশী নাম্নী মহিলা আমার ঘর ঝাট দিল দিল, আমাকে বিছানা থেকে ডেকে তুলে। আজকে রুটি দেয় নি দোকানে। আজকে আর লোকজনের সঙ্গে মারামারি হবার উপক্রম হয় নি। সন্ধ্যার সময়···নামক দেবতাটি এসেছিল। আমি অবশ্য অনেক আগেই বলেছি—দেবতা হও আর যাই হও রে, বাপু, তোমরা মরার পরে ছাপা হবে এবং লোকেও তোমাকে মানুষ বলেই ঘোষণা করবে। ··· কে আমি বহু গান শোনালাম। ও আমাকে অনেকগুলি গান শোনালো। ··· ব্রাহ্মণ—আর আমি এই কথা লিখব না। এই একবারই লিখলাম। মনে খুব আনন্দ আমার।

৩.৫.৮৮

···আমি আজ সারাদিনে বেশি কথা বলি নি। সারাদিনে গোটা পঞ্চাশ বাক্য বলেছি মাত্র। তরুণ কবিগণ কবিতা পড়ছিল আমি একটু দূরে মাঝে মাঝে শুনছিলাম, কথা বিশেষ বলি নি। আজ রেলগাড়ি ভোরবেলা চলে নি। বিকালবেলা থেকে রেলগাড়ি ফের চলল। আমি আজকাল দৈনিক তিন / চার পেয়ালা চা খাই। লেবু চা অতি সুস্বাদু লাগে—বাজারে মন্টু ভালো লেবু চা বানায়। আজ রেলগাড়ি বন্ধ থাকার ফলে খবরের কাগজ আসে নি। ডাকঘরে ডাকও আসে নি। আজ রেলপথের লেভেল ক্রসিঙের কর্মচারী লক্ষ্মণ ভাইয়ার সঙ্গে কথা বললাম। লক্ষ্মণ ভাইয়ার বাড়ি বিহারে সমস্তিপুরে।

৪.৫.৮৮

ভোরে দেবদুলালের মিষ্টির দোকানে বসে তরুণ কবিগণ আমাকে একখানা পত্রিকা দেখাল। ঢাকা-য় ছাপা, সম্পাদিত 'একবিংশ' নামে পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লিখেছে দেখাল। আমার কবিতা চাইল রণজিৎ, চারটে কবিতা চাইল। আমার কাছে বর্তমান মুহূর্তে আছে বারো টাকা ষাট পয়সা। আগামীকাল আবার ব্যাঙ্ক বন্ধ। আমার ভাড়াটে মনোতোষ পাঁচ সাত দিন আগে কলকাতায় গেছে, এখনো ফেরে নি।
বিকালবেলায় আমি রণজিতের হাতে আমার কবিতা দিলাম পূর্বশ্রুতি মতো।···

৬.৫.৮৮

ভোরে প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করে ভবেশের দোকানে গেলাম। ভবেশের দোকানে বেশ কয়েকজন লোক বসে ছিল। আমিও তাদের মাঝে বসলাম। চা ও রুটি খেলাম। ২৩শে বৈশাখ আজ, তবু ভোরবেলা খুব সুন্দর ঠাণ্ডা আবহাওয়া। ভবেশের দোকান থেকে বাড়িতে এসেছি। পলাশী নাম্নী এক মহিলা আমার ঘর ঝাট দেয়। পলাশী কয়েকদিন হল আসে নি। ঘরে চড়াই পাখিরা কেবলি মরা শুকনো ঘাস ফেলে, ফলে ঘরে মেঝেতে ঘাস পড়েছে বহু, নোংরা হয়েছে ঘর। পলাশী ঝাট দিলে সব পরিষ্কার হবে। জামা কাপড় কয়েকটা আমি ধোপার কাছে দিয়ে এসেছি ভোরবেলা। বাড়িতে কাপড় জামা ধোয়া বন্ধ আছে আপাতত। ডাক্তারের দেওয়া বড়িও পাওয়া যাচ্ছে না বাজারে। সুতরাং একধরনের বড়িই খাচ্ছি বর্তমানে।

বিকালবেলা খবর পেলাম যে ভবানী ঘটক রবীন্দ্র-জন্মদিনের পরে আবার আসবে, কারণ রবীন্দ্র-জন্মদিনে একটি নাটকে অভিনয় করবে ভবানী। বৃন্দাবন দেখলাম বেশ বুদ্ধিমান যুবক। আমি গা ধুয়েছি বিকালবেলায় মানে সন্ধ্যায়। তারপরে মুখে মুখে কবিতা রচনা করে শোনালাম তরুণ কবি কয়েকজনকে। ভাত খেয়ে আমার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরেছি।

৭.৫.৮৮

আজ ভোরে আমার বাড়িতে আমার বড় দাদা অনিল বরণ মজুমদার এসেছে। আমার টাকা কিছু দাদার কাছে ছিল, এই টাকার থেকে একশ টাকা দাদা আমাকে দিল। বাড়ির গাছপালা, ফল ইত্যাদি সম্বন্ধে দাদার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললাম। দাদা চলে গেলে ব্যাঙ্কে গেলাম টাকা জমা দিতে। টাকা জমা দিয়ে খেয়ে বাড়িতে ফিরলাম। আমার দালানের পশ্চিম পাশের ঘর থেকে আমি আমার দালানের একেবারে পূব পাশের ঘরে এলাম বিছানা ইত্যাদি সহ। পূব পাশের ঘরে চড়াই পাখি বাসা বাঁধতে পারে না। আবর্জনাও ফেলতে পারে না পূব পাশের ঘরে। এমন আশ্চর্যভাবে তৈরী এই পূব পাশের ঘরটি যাতে যেদিক থেকেই বায়ু বহুক ঘরে বাতাস ঢোকেই সবেগে। বিকাল বেলা পঙ্কজ মণ্ডল ও সজল-দের সঙ্গে রেলওয়ে ওভারব্রীজে উঠে কিছুক্ষণ পরেই আমি চলে এসেছি। রাত্রে পাউরুটি ডাল বেগুনভাজা খেয়ে বাড়ি ফিরেছি।

৮.৫.৮৮

আজ ভোরে উঠেই রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের সভায় গেলাম। রবীন্দ্রনাথকে প্রশংসা করে এক বক্তৃতা দিলাম। তার পরে আমাকে পুরস্কার দিল একটি ঝোলা। সেইটি নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। আজ ফল্গু বসু আসার কথা। ভালো ছন্দে কবিতা লেখে ফল্গু।...

২৬ বৈশাখ (৯.৫.৮৮)

আজ গেছলাম অমলেন্দুর বাড়ি। অমলেন্দু দুটি পত্রিকা দেখালো যাতে আমার নতুন

লেখা ছাপা হয়েছে। আলোচনায় সাব্যস্ত হল এবং অমলেন্দু অকপটে স্বীকার করল যে অমলেন্দু স্বয়ম্ভূ। তারপরে বাজারে গিয়ে লেবু চা খেলাম। পরে হারুবাবুর ফোটোগ্রাফ তোলার দোকানে অনেকক্ষণ বসেছিলাম। হারুবাবুও অকপটে স্বীকার করলেন যে হারুবাবু স্বয়ম্ভূ এবং পৃথিবীর সকলেই স্বয়ম্ভূ। ডাকঘরে গিয়ে একখানা চিঠি পেয়েছি। বাড়িতে এসে স্নান করে ভাত খেয়ে এলাম হোটেল থেকে। বিড়াল একটি কোথা থেকে এসেছে। যত তাড়াই চলে যায় না। কী আর করি। পাউরুটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিলাম বিড়ালটিকে খেতে—কিছু খেল।

বিকালবেলা বেলা এক ভদ্রলোক এসেছিল—নিতাই নামে। ঠিকানা লিখে দিল। ···এসেছিল। ···কে দুটো সিঙাড়া খাওয়ালাম। আমার সন্দেহ হচ্ছে···এর রচিত কিছু গান রবীন্দ্রসংগীত বলে চালানো হচ্ছে। অবশ্য···কে এ বিষয়ে কিছু বলি নি এখনো রাতে ভাত খেয়ে আমার মায়ের দালান বিনোদিনী কুঠীতে এসেছি।

১০.৫.৮৮

ভোরবেলা আজ কারো বাড়িতে বেড়াতে যাই নি। রুটি চা খেয়েই আমি ঘরে এসে কবিতা লিখেছি দুটো। ডাকঘরে আজ আমার নামে কোনো চিঠি আসে নি। ভোরবেলা আড্ডাও ভালো হয় নি। কিন্তু বিকালবেলায় খুব আড্ডা হয়েছে। বিকালে প্রথমেই কেরোসিন তেল কিনেছি ১৫০ কিউবিক সেন্টিমিটার। তারপরে দেখা হল রসময়বাবুর সঙ্গে। রসময়বাবুকে চা খাওয়ালাম। রসময়বাবু বলল—দাদা অনিলবরণ মজুমদার দলিলে লিখেছে আমার দাদা অনিলবরণ দালানসহ জমি বেচেছে ৫০ হাজার টাকায়। তারপরে এক উড়িয়াকে পাকড়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ পরে ভবানী এল। ভবানীকে আমি খুব ঈশপের গল্প বলেছি। রাতে ভাত খেয়ে বাড়ি ফিরলাম এবং বললাম "ঈশ্বরী, তোমার সব বই নিয়ে নাও। 'ঈশ্বরীর', 'আমার ঈশ্বরীকে' বইগুলি নাও, ঈশ্বরী। এবং 'ঈশ্বরীর স্বরচিত নিবন্ধ' নাও ঈশ্বরী।" আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইখানাও আছে আমার লেখার টেবিলে—এই বইয়ের আটচল্লিশটি কবিতা আছে 'ঈশ্বরীর কবিতাবলী' নামক বইতে। সুতরাং আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' বইখানাও ঈশ্বরীর।

১২.৫.৮৮

···আজ মনটা আশ্চর্য শান্ত আছে। তার কারণ আমি কথা বলি নি বিশেষ—চুপ করে শুনেছি অন্যেরা কী বলে।

···সন্ধ্যাবেলায় স্নান করেছিলাম। শরীর খুবই আনন্দময় আছে। খুব জোরে বাতাস বইছে। কয়েকদিন হলো এই রকম বাতাস শুরু হয়েছে।

আজ একজনকে এ বছর প্রথম পাকা আম খেতে দেখলাম। বৈশাখ মাসের শেষ, আম পেকেছে।

১৩.৫.৮৮

ভোরবেলা দীপেন বসুর কাছ থেকে শুনলাম ঊষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সোমবার বিকালে

বাড়িতে আসবেন। রণজিৎ হালদারের সঙ্গে দেখা হলো। ব্যাঙ্ক থেকে ১০০ টাকা তুলেছি। ৮০ টাকা দিয়েছি ভবেশকে। আমার কাছে ৪৫ টাকা আছে। খোকন-কে বলেছি ১০০ টাকা জোগাড় করে খোকনের কাছেই রাখতে। যদি আমার দরকার হয় তাহলে তৎক্ষণাৎ যেন খোকনের কাছ থেকে পাই। খোকন কথা দিয়েছে যে খোকন ১০০ টাকা যোগাড় করে রাখবে।
আমার নতুন ভাড়াটে শচীন এখনো আসে নি। কী করছে কে জানে? যাই হোক গান লিখেছি আজ ভোরেও। সজল আমার সম্বন্ধে বলল যে আমার গানের জন্যও আমি চিরস্মরণীয়। মাঝে মাঝে গান লেখা ভালো।

১৪.৫.৮৮

আজ ভোরে ভবেশ চায়ের দোকানে ছিল না। ভবেশের বৌ চা বানাল এবং আমাকে পান করতে দিল। বর্তমানে আমার কাছে আছে ৪৩ টাকা। এই টাকায় হাত খরচা চালাতে হবে অন্তত নয় দিন। এইভাবে হিসাব করে চলতে হচ্ছে আমাকে।
ডাকঘরে আজও আমার নামে কোনো চিঠিপত্র আসে নি। আমার পেনশনের টাকা নিয়ে খুব চিন্তিত আছি। পেনশনের দ্বিতীয় কিস্তির চিঠি এখনো আসে নি। সন্ধ্যা বেলায় এক বৃদ্ধ মুসলমান নামাজ পড়লেন রেলের ওভারব্রীজের উপরে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললাম।...

১৬.৫.৮৮

আজ ভোরে উঠে চা খাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বৃষ্টি নামল। আমি তখন দুলালের মিষ্টির দোকানে। গত রাত্রেই আমি স্থির করে রেখেছিলাম যে আমি নিজে ভাত রান্না করে খাব—এই ইচ্ছা হবার কারণ আমার ভাড়াটে শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস নিজে ভাত রান্না করে খায়, গত রাত্রে নটা নাগাদ ভাত রান্না শুরু করেছিল শচীন্দ্র।...বৃষ্টি একটু কমলেই আমি ছাতা মাথায় বেরোলাম এবং এ্যালুমিনিয়ামের তৈরী USHA কুকার কিনলাম, ডেচকি কিনলাম। ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা তুললাম। আরো নানান জিনিষ কিনে বাড়ি এসে রান্না শুরু করলাম—ঢ্যাড়স সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ করে গোটা বারো নাগাদ নিজের হাতে রাঁধা ভাত খেলাম। বিকালে ভবানীর সঙ্গে দ্যাখা হল। কে কী স্বপ্ন দেখে আমি তা বলতে পারি। জিজ্ঞাসা করলাম—ভবানী তুমি কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখেছ যে তুমি ঠাকুরনগরে আসার জন্য তোমার বনগাঁর বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিলে কিন্তু কিছুতেই আর রেলগাড়ি পেলে না আসার জন্য। ভবানী বলল হ্যাঁ।

১৭.৫.৮৮

আজ ভোরে ভবেশের দোকানে গিয়ে গত কালকের বাসি রুটি সেঁকে খেলাম। ডাকঘরে গিয়ে 'কবিতা সভ্যতা' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা পেলাম। এ পত্রিকায় আমার নাম কোথাও ছাপা হয় নি, মনে হলো। তবু সম্পাদক ভদ্রলোক আমার কাছে

পাঠিয়েছেন। আমি আজও ভাত রান্না করেছি নিজে দুবেলাই।
বিকালে ভবানী এসেছিল বনগাঁ থেকে। ভবানী ভালো গান গাইতে পারে। আমি একটি বিশেষ স্থানে সন্ধ্যার সময়ে গিয়ে আমার কাব্যগ্রন্থ দুখানি 'ফিরে এসো, চাকা' ও 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' নিয়ে এসেছি। এখন বর্তমান মুহূর্তে আমার লেখার টেবিলে আছে আমার তিনখানি বই—১। 'ফিরে এসো, চাকা' ২। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' ৩। আমার 'শ্রেষ্ঠ কবিতা।' এবং আমার লেখার টেবিলের দেরাজের মধ্যে আছে ৪। আমার 'এক পংক্তির কবিতা' বইখানা। সন্ধ্যার পরে অমলেন্দু আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিল।

১৮.৫.৮৮

আজ ভোরবেলা একটু বেলা করে উঠেছি। তবুও রুটির দোকানে তখনো রুটি আসে নি। শুধু চা আর দু খানা বিস্কুট খেলাম। এবং একটি গান লিখলাম। পরে বাজারে গেলাম—আলু ঝিঙে এবং পেঁয়াজ কিনলাম। তার আগে একটি থলে কিনেছি। এখন আমার মোট দুটি থলে হলো। একটা থলে চাল কেনার জন্য, অন্য দ্বিতীয় থলেটি তরকারি কেনার জন্য। আমি নিরামিষ খাই। রাঁধতে সময় লাগে এক ঘণ্টার কম। আসলে সিদ্ধ ভাত রাঁধতে কাজ করতে হয় মিনিট পনেরো। তরিতরকারি ধুয়ে চাল ধুয়ে স্টোভ জ্বেলে ভাত স্টোভে চাপাতে লাগে মিনিট পনেরো। তার পরে এসে বিছানায় শুয়ে থাকি। চাল ফুটে ভাত হলে ভাতের ডেকচিটা স্টোভ থেকে নামাই। ব্যাস, এই হলো রান্না। আজ দুপুরে আলু সিদ্ধ, ঝিঙে এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়েছি। রাত্রে রান্না করা আমার শেষ। রাত্রেও ঝিঙে সিদ্ধ আলু সিদ্ধ এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খাব।

১৯.৫.৮৮

আজ গণিতের অধ্যাপক রতনকুমার রায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। একটি মহাবিদ্যালয়ে ইনি গণিতের অধ্যাপক। ভোর বেলা গোটা দশেক নাগাদ রতনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ডাকঘরে পেলাম 'কোরক' সাহিত্যপত্রিকা। এইবার আমার লেখা ছাপা সাহিত্যপত্রিকাগুলি আসা শুরু করেছে। ফল্গু অনেকদিন আসে নি। ফল্গুর বন্ধু রূপম চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন আসে নি। বিকালে ভবানী বৃন্দাবন দুলাল—এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। আজ দুপুরে আমি খিচুরি খেয়েছি নিজে রান্না করে এবং রাত্রিবেলা কুমড়ো আলু পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়ে ভাত খেয়েছি। এক কেজি চাল খেতে আমার চার দিন লেগেছে—এবং আরো সামান্য পরিমাণ চাল এখনো রয়েছে। আমি হিসাব করে দেখলাম—মাসে ৮০/৯০ টাকায় আমার দুবেলা ভাত খাওয়া হয়ে যাবে। তবে রুটি চা খেতে লাগবে প্রায় ৮০ টাকা

২৯.৫.৮৮

ভোরে পুরোহিত (আমার গ্রামের) মশায়ের বাড়িতে গেলাম। পুরোহিত মশায়ের

সঙ্গে দরকারী কথা হলো। আমার গ্রামের পুরোহিত সুধীর কুমার চট্টোপাধ্যায় বললেন সন্ধ্যার সময়ে সুধীর পুরোহিত যখন বাড়িতে ফেরেন তখন স্নান করে তবে ঘরে ঢোকেন। তারপরে এল খোকন, আমি তখন রান্না করছিলাম। খোকন আমাকে আমার থালা ফেরৎ দিয়েছে—মরিচাহীন লোহার থালা। আর একটি গামলাও দিয়েছে।

বিকালবেলা আমার প্রায় সব স্থানীয় শিষ্যরা ছিল এবং বনগাঁ থেকে ভবানী ঘটকও এসেছিল। খুব সুন্দর সাহিত্য আলোচনা হল।

পাঁচ ছয় বার চা খেয়েছি আজ। আমার নতুন ভাড়াটেরা ভোর ৬টায় বেরিয়ে যায় আর ফেরে রাত ৯টায় এমনকি ১০টা রাতে। ওদের এত কাজ।

আমি রাতের রান্না করে ভাত খেয়েছি এবং এর পরেই ঘুমোবো।

৮ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার (২২.৫.৮৮)

বিকালবেলায় রণজিৎকে অনেকক্ষণ খুঁজলাম। কিন্তু পেলাম না। বিকালে আমাদের গ্রামের অগ্রগামী পরিচালিত রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যায় আমাকে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ডেকেছিল। আমি গেছলাম। আমাকে করল প্রধান অতিথি। আমি রবীন্দ্রনাথকে খুব প্রশংসা করে একটি বক্তৃতা দিলাম।

২৭.৫.৮৮

...আমার ঘর ঝাট দেওয়ার এবং এ'টো থালাবাসন ধোয়ার জন্য একজনকে পেয়েছি। একজন কেন অনেকজনই রাজী এ কাজে। থালাবাসন ধোয়ার এবং ঘর ঝাট দেবার জন্য আমি প্রতিমাসে ৩০/- দেব বলে স্থির করেছি। মানুষে মানুষে ঝগড়াঝাটি কোনোদিন থামবে না—মানুষে মানুষে না লিখে দেবতায় দেবতায় ঝগড়া কোনোদিন মিটবেনা, চলতেই থাকবে ঈশ্বরে ঈশ্বরে ঝগড়া। আমার ভাষায়, চলমান জ্যামিতি-গুলি পরস্পর ঝগড়া করতেই থাকবে। এ ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করা বৃথা।

২৮.৫.৯২

আজ বিকালে ভবানী ঘটককে আমি গোটা ৩০ বাক্য বলে শেষে জিজ্ঞাসা করলাম 'ভবানী তোমার পায়ের নীচে কি পৃথিবী, না, কি মঙ্গলগ্রহ?' ভবানী বলল মঙ্গলগ্রহ। পৃথিবীতে বসে পৃথিবীকে মঙ্গলগ্রহ ভাবার মতো গোপন ও ক্ষমতাশালী আমার বাক্যগুলি।

তারপরে ঠাকুরনগর খেলার মাঠে গিয়ে সন্ধ্যার আগেই ১০০টির বেশি বাক্য বলে শেষে জিজ্ঞাসা করলাম 'দেবদুলাল তুমি ল্যাংটা না কাপড় পরা?' দেবদুলাল জবাব দিল 'ল্যাংটা।' কাপড় পরেই বসেছিল সবার সামনে। আমার বলা বাক্যগুলির এমনই ক্ষমতা।

২৯.৫.৮৮

আজ লিটল ম্যাগাজিনস লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা সন্দীপ দত্ত এসেছিল। তাঁর সঙ্গে ছিল অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার কাব্যপুস্তিকা 'গায়ত্রীকে'-র নতুন সংস্করণ প্রকাশ করবে

সন্দীপ—আমি রাজী হয়েছি। শৌনক এসেছিল। শৌনকও আমার একখানা কবিতার বই প্রকাশ করবে বলেছে।

৩০.৫.৮৮

…দশজন লোকের সংসারে কাজের সংখ্যা যত আমার একজনের সংসারেও কাজের সংখ্যাও তত। ঘর ঝাট দেওয়া ও বাসনমাজা ভিন্ন আর সব কাজ আমি একা করি। ফলে ফুরসৎ পাই না। সারা ভোর আমাকে কেবলি হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে নানান কাজে। আমি বাসনও ধুই মাঝে মাঝে। আজকাল আবার দুপুরবেলায় রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে বসে থাকি একটা থেকে তিনটে পর্যন্ত—লোকজনদের দেখি। লোকজন দেখতে আমার খুব ভালো লাগে।…

৩১.৫.৮৮

আজ একখানি রেজিস্টার্ড চিঠি পেয়েছি বারাসাত থেকে। ভোরে রণজিৎ আমাকে 'সমবেত আর্তনাদ' নামে একখানি সাহিত্য পত্রিকা দিয়েছে। একা একা এক জনের সংসার চালাতে বেশ খাটতে হচ্ছে। দৌড়াদৌড়ি, বিভিন্ন জিনিষ কেনা লেগেই আছে। … -র কাছে আমার ছাপা গল্প আছে গোটা পঁচিশ। ঐ গল্পগুলি একসঙ্গে বই আকারে প্রকাশ করতে হবে। এই কথা আমি ভাবছি কয়েকদিন হল। অমলেন্দু গেছে শঙ্কর সরকারের ('অতএব' পত্রিকার সম্পাদক) কাছে। কাল ভোরে খবর পাব একটি গোপন বিষয়ে।
বিকালে আড্ডায় বিশেষ কেউ ছিল না, বৃন্দাবন ছিল। আমার দুই ভাড়াটে নিতাই শচীন্দ্রনাথ ফেরে অনেক রাত্রি হলে।

১.৬.৮৮

ভোরবেলা অমলেন্দু বিশ্বাসের বাড়িতে গেলাম। শঙ্কর সরকার আসবে আমার বাড়িতে—এই সংবাদ দিল অমলেন্দু। দাড়ি কামালাম আজ ভোরে।
দুলালের মিষ্টির দোকানে ঘণ্টা দেড়েক বসেই থাকলাম—তার আগে বাজার করেছি। গোলআলু কিনেছি, ঢ্যাড়স কিনেছি, ডাল কিনেছি। চাল আগে কেনা আছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে রান্না শুরু করব। আমার মনে হয় স্টোভের কেরোসিন আছে বোতলে। বিকালে আমার গান 'এ পারে নীরব হল কুহুরব ওপারে মুখর হলো কেকা ওই' গেয়ে শোনালাম ভবানী ঘটককে। ভবানী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল আমার গানটির। একটি পঞ্চাশ পয়সার মোমবাতি কিনলাম। এর আগে স্নান করে নিয়েছি সন্ধ্যাবেলা। গ্রীষ্মকালে আমি মাঝে মাঝে দুবার স্নান করি।…

৭.৬.৮৮

বনগাঁর ভবানী ঘটক আমার উঠোনে এসে আমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করে গেল। রবীন্দ্রনাথের 'এই সব মূঢ় ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি…' আমি বললাম। শিবরামও লিখেছিল কিশোর কিশোরীদের

মুখে একটু হাসি ফোটাতে পারলে আমার জীবন সার্থক মনে করি। পরস্পরকে বাঁচায় সাহায্য করা, এবং ভালোভাবে সানন্দে বাঁচায় সাহায্য করাই সাহিত্যসেবীদের কাজ, এই আলোচনা হল।

৯.৬.৮৮

...আজ এখনো যেমন ঝড় হচ্ছে এবং বৃষ্টিও হচ্ছে মাঝে মাঝে তাতে বুঝতে পারছি যে আজ আর বৈকালিক আড্ডাটি আমাদের হবেই না।
পশ্চিমবঙ্গে কবির সংখ্যা খুব বেড়েছে। ওই কবিদের সঙ্গেই আড্ডা দিই সাধারণত। গণিতের অধ্যাপক রতন রায় কাল যাবেন দূরে। আজ পর্যন্ত আছেন।

১০.৬.৮৮

আজ দুপুরে ঘণ্টা দুই ঘুমিয়েছি। ভোর বেলা আমাদের গ্রামের তাপসের সঙ্গে দেখা। তাপসের বাড়ি গেলাম ভোরে। লেখাপড়া ও সাহিত্যচর্চা সম্বন্ধে আলোচনা হল। আজ থেকে আমি দৈনিক আজকাল পত্রিকা রাখা শুরু করেছি। আজ একখানি চিঠি পেয়েছি, শ্যামসুন্দর, বর্ধমান থেকে রফিকের চিঠি। রফিক আমার লেখা পেয়েছে।

এক মাস আগে ফল্গুর আসার কথা ছিল। কোনো কারণে আসতে পারে নি। ফল্গু আসার অপেক্ষায় আছি।

১১.৬.৮৮ (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৫)

আজ ভোরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল। আমি সাড়ে পাঁচটার সময়ে একখানি বানরুটি ও এক পেয়ালা চা খেলাম, তখন বৃষ্টি হচ্ছিল অতি অল্প। আমি বাড়ি ফেরার পরে বৃষ্টি খুব বাড়ল। ঘরে বসে আমি হিসাব করলাম—সূর্যরশ্মি মেঘের উপরে লম্বভাবে পড়বে যখন তখন সূর্যরশ্মির উত্তাপ খুবই বাড়বে এবং সব মেঘ বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যাবে, বৃষ্টি থামবে। হলোও তাই—বেলা এগারোটায় বৃষ্টি বন্ধ হল। ডাকঘরে গেলাম। শুভদিন আজ।

বিকালে গেলাম বিছানার চাদর কিনতে। চাদর কিনে ওষুধের দোকানে গেলাম। আমি একটি বড়ি দিনে দুবার খাই। আরেকটি আদ্দেকটা দুপুরে বাকি আদ্দেক রাত্রিতে খাই। প্রত্যহ। তার পরে বাড়ি ফিরে এসে নতুন বিছানার চাদর পেতেছি বিছানায় এবং বসে আছি বিছানায়। আজকে অবশ্য কবিতা লিখেছি একটি।

রবিবার, ২৯ জ্যৈষ্ঠ

...তাপস এসেছিল। বয়স ১৬/১৭ বছর হবে। তাপস দিনপঞ্জী লেখে। কবিতা লেখে। আয়কর বিভাগের কাছে চিঠি লিখলাম। বিকালে দেখা হল শৌনক বর্মন ও ভবানী ঘটকের সঙ্গে। বড় ভালো লাগে আমার এই দুই যুবক কবিকে।

সোমবার, ৩০ জ্যৈষ্ঠ
...দেবদুলাল মিস্ত্রী আমাকে দুটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালো। আমি আমার পুরোনো তত্ত্ব কথা মুখে মুখে কিছু শোনালাম।
...ভবানীকে বললাম—একখানি বই অন্তত আছে গত ৫০ বছরে 'জাহানারার আত্ম-কাহিনী'র চেয়ে ভালো কিম্বা সমান। বইখানি মাণিকের 'জননী।'

১৪.৬.৮৮ (৩১ জ্যৈষ্ঠ)

আজ ভোরবেলা বৃষ্টি একটু কম ছিল। দুপুরবেলা থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল মাঝে মাঝে অল্প অল্প।

...বিকালবেলায়ও বেশি লোকের সঙ্গে দেখা হল না। তবে আমাদের গ্রামের তাপস এসেছিল। আমার লেখা চারটি কবিতা 'সুরঞ্জনা' পত্রিকায় ছাপা, পড়ে গেল তাপস। এটা এখন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে আমি মহাকবি বেদব্যাসের সমান কবি। রাত্রে মোটে একটা কাচকলা ও পেঁয়াজ সিদ্ধ দিয়েছি। ঐ দিয়ে ভাত খাব।

১৫.৬.৮৮

আজ প্রচুর বাজার করতে হয়েছে। ভোরে এক কেজি সরু চাল কিনলাম ৪.৪০ টাকা দিয়ে। পেঁপে কিনেছি, সিদ্ধ খেয়েছি। গোলালু, পেঁপে, পেঁয়াজ একসঙ্গে ভাতে সিদ্ধ করে খেয়েছি। আজ একটি সাহিত্য-পত্রিকা 'তাৎপর্য' পেয়েছি। 'তাৎপর্যে'র' জনৈক লেখককে প্রাপ্তি সংবাদ লিখে পাঠিয়েছি পোস্টকার্ডে।
আজ বিকালবেলা আমার মামা নলিনীরঞ্জন রায়ের সঙ্গে দেখা হল। রেলস্টেশনে মামা আমাকে একখানা কেক ও এক গ্লাস চা খাওয়ালেন। মামার ছেলে নীহারের কবিতার বই কী ভাবে ছাপা যায় সেই আলোচনা করলাম।
বৃন্দাবন রাত্রে আমাকে আমার বাড়িতে আমার ঘরে পেঁ৷ছে দিয়ে গেল। বৃন্দাবন একটু আগে গেল। আমি আমার ঘরে একাকী এখন। বৃন্দাবনের কবিতার বইখানি 'ভাঙে ঘর ভাঙে ভালোবাসা' নিয়ে গোটা কয়েক ভবিষ্যদ্বাণী করলাম আমি।

১৬.৬.৮৮

তোফা দিনটি আজ। বৃষ্টি বিশেষ হয় নি। 'কালিয়' পত্রিকা পাঠিয়েছে আমাকে শম্ভু রক্ষিত ডাকযোগে। আমি পেয়েছি। সারা দুপুর 'কালিয়' পড়েছি। অতি উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক পত্রিকা করেছে 'কালিয়'কে শম্ভু। কয়দিন হল আমি দৈনিক আজকাল পত্রিকা রেখেছি। আমার পত্রিকা দেয় বিশ্বনাথ। দৈনিক পত্রিকা দেওয়া ছাড়াও উপরন্তু ডাকঘরে কাজ করে বিশ্বনাথ। আজ বিকালে দেখা হল অনেকেরই সঙ্গে—অমলেন্দু, দেবদুলাল, রণজিৎ এদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। ঘি কিনতে চেষ্টা করছি আমি। এখনো ঘি পাইনি অবশ্য। তবে পাব—এই আশ্বাস আমাকে দিয়েছে আমার ৺অমূল্য মামার ছেলে সুবোধ। এখন অভ্যাস একটু পালটেছি। এখন ভোরে খাই দুখানা পরোটা, দুপুরে ভাত, বিকালে কেক আর চা, রাত্রিতে ভাত।

ভবানী আজ এসেছিল বনগাঁ থেকে তবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি।

১৭.৬.৮৮ (২ আষাঢ়)

... খবরের কাগজে উপনির্বাচনের আর বন্যার খবর। চা খাওয়ার পরিমাণ আমার কিছু বেড়েছে—আজ এই পর্যন্ত চার বার চা খেয়েছি। ভোরে রণজিৎ হালদার আমাকে 'প্রিয় মেঘদূত' পত্রিকাখানি দিয়েছে। লালমোহনের কবিতা (প্রিয় মেঘদূতে) বেশ হয়েছে। তরুণ কবিদের শব্দ ব্যবহার খুব অসংলগ্ন হচ্ছে আজকাল। দোষ দেয় পাঠককে যে পাঠক কিছু বোঝে না, আমি কিন্তু আমার বিয়াল্লিশ বছর কবিতাচর্চার অভিজ্ঞতা থেকে জানি তরুণ কবিরা যখন লেখে তখন নিজেরাই বোঝে না কী লিখেছে। এইভাবে সাম্প্রতিকতম কবিদের মনের ভিতরে বহু চিন্তা অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ, অসংলগ্ন। এদের ভাবনার বিভিন্ন অংশ বয়স বাড়লে পরস্পর যুক্তিযুক্ত হবে। এই বয়সে আসলে পৃথিবীর কিছুই ভালোভাবে বোঝে নি, বয়স বাড়লে বুঝবে, তখন এদের কবিতা সযৌক্তিক হবে। তবে কিছু অল্প কবির চিন্তার যৌক্তিকতা আছে।

১৮.৬.৮৮ (৩ আষাঢ়)

গত রাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। রাত তিনটে সতেরো-র সময়ও আমি জেগে থেকে শুনেছিলাম ফার্স্ট লোকাল ট্রেন গেল। অবশ্য আজ দিনের বেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়েছি। শঙ্খ ঘোষের লেখা 'জার্নাল' বইখানি আমি দেখেছি গতকাল ১৭ ই জুন। ভালো মূল্যবান বই।

৪ আষাঢ়, রবিবার (১৯.৬.৮৮)

আজ দৈনিক আজকাল পত্রিকা পাই নি। ভোরে বাজার করেছি ১২ টি ঢ্যাড়স (দুই বেলার জন্য) আর চারটে বড় পেঁয়াজ। বৃন্দাবন ও দেবদুলালের সঙ্গে দেখা হল সকালবেলা। অবশেষে খবরের কাগজ পেলাম ১১ টায়। বিকালে এল ফল্গু বসু। 'নির্জন' এবং 'পুনরুত্থান' পত্রিকা দুটি দিল। ফল্গু বলল ফের দেখা হবে ২৩ জুন, কলকাতায়।

২৩.৬.৮৮ (৮ আষাঢ়)

আজ গেছলাম কলকাতায়। প্রথমে মনস্তত্ত্ববিদ হরিরঞ্জন গাঙ্গুলীর কাছে। তারপরে বিকাশ বাগচী মশায়ের কাছে গেলাম সিগনেট বুক শপে। সেখান থেকে টেমার লেনে সন্দীপ দত্তর বাড়িতে। সন্দীপ-এর মা-কে দেখলাম। দুপুরে খেলাম সন্দীপের বাড়িতে। তার পরে শুয়ে পৌনে চারটে পর্যন্ত বিশ্রাম। তারপরে একতলায় সন্দীপেরই লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরিতে নেমে এলাম। অনেক তরুণ কবি ছিলেন সেখানে। তার পরে সাড়ে পাঁচটায় লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির দশ বছর পূর্তি উৎসবের সভায় স্টুডেন্টস' হল-এ। অনেক জানাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হল। অনেককেই তিরিশ বছর ধরে চিনি—যেমন আমার প্রকাশক দেবকুমার বসু মশায়। অজিত পাণ্ডে নীলাদ্রি আরো কত পরিচিত জন। বক্তৃতা দিতে উঠে সন্দীপ অশ্রুমোচন করল লিটল

ম্যাগাজিন লাইব্রেরীর কথায়।

২৫.৬.৮৮
আজ সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। 'জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী' নামের একখানা বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়েছি। বইখানি বিচিত্র। ...
বিকালে ঠাকুরনগর গ্রন্থাগারের লোকজনদের কাছে গেছলাম। মিহির মজুমদারের আরো একখানা কবিতার বই বেরোবে। অবশ্য মিহিরের কাছে যাবার আগে সরস্বতী এসেছিল। সরস্বতী আমাকে দুবেলা ভাত রান্না করে খাওয়াবে—এই ব্যবস্থা করেছি।... □

বিনয়ের ডায়েরি সম্পর্কে :

মেরুন রঙের অতি-সাধারণ মাপের একটি ডায়েরি, মলাটে অস্পষ্ট সোনালি অক্ষরে ছাপা : TOP DIARY 1988. ভিতরে ১.১.৮৮ তারিখের পাতায় রয়েছে উপহারদাতার সাক্ষর—'প্রণম্য কবি বিনয়দাকে—ভবানী। বনগাঁ, ১১.৪.৮৮'। ডায়েরিতে কবির ব্যক্তিগত লেখালেখির মধ্যে বনগাঁ-নিবাসী জনৈক ভবানী ঘটকের নাম বারবার উল্লিখিত হতে দেখা যায়। সম্ভবত ইনিই কবিকে ডায়েরিটি উপহার দেন।
ডায়েরির ৪.১.৮৮ তারিখের পাতায় কবির স্বহস্তে লেখা আছে : বিনয় মজুমদার, দিনপঞ্জী। রীতি অনুসারে যে অংশে নাম ঠিকানা ইত্যাদি লেখার কথা, সেই Personal Memoranda চিহ্নিত পাতাটির আগাগোড়া জুড়ে লেখা আছে একটি হিসাব :

পলাশীকে ৬ টাকা অগ্রিম দিলাম, ২ মে, ১৯৮৮
২৪ মে থেকে বুড়ি ঝাট দিচ্ছে।
বুড়ির টাকা ২৬ তারিখ পর্যন্ত শোধ করা
বুড়ির টাকা ২৭ তারিখ পর্যন্ত শোধ করা
বুড়ি সব শোধ

সরস্বতী কাজ শুরু করেছে জুন ৩
সরস্বতীকে দিলাম
৩.৬. — ১.০০
৪ ৬. — ২.০০
৭.৬. — ২.০০
৮.৬. — ১.০০
সরস্বতীর সব প্রাপ্য দিয়েছি ১১ জুন পর্যন্ত
সরস্বতী ভাত রান্না শুরু করল ২৫ জুন, '৪৮ বিকাল থেকে

ডায়েরির শেষাংশে কয়েকটি পাতায় জাতীয় সঞ্চয় প্রকল্পের হিসাব সংক্রান্ত কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করা আছে। একেবারে শেষ পাতায় লালকালিতে লেখা—শিয়ালদহ থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যাবার একটি পথনির্দেশ।

দিনপঞ্জী অংশটি ১১.৪.৮৮ (২৮ চৈত্র, ১৩৯৪) থেকে শুরু হয়ে ২৫.৬.৮৮ (১৩ আষাঢ়, ১৩৯৫) পর্যন্ত মোটামুটি নিয়মিতভাবেই লেখা। সাধারণভাবে কোনো একটি দিনের কথা লিখতে ডায়েরিতে ছাপা নির্দিষ্ট তারিখের পাতাটিকেই ব্যবহার করা হয়েছে। লেখা আয়তনে বেড়ে গিয়ে কোথাও-কোথাও পরের পাতার অংশও দখল করেছে—সে ক্ষেত্রে পরবর্তী দিনের লেখায় আলাদাভাবে তারিখ লেখা হয়েছে—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে। ২৫ জুনের পরে লেখালেখি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবার সঠিক কারণ অনুমান করা সম্ভব নয়।

ডায়েরির প্রথমদিকে লেখা হয়েছে কিছু কবিতা—যার মধ্যে 'ধরো যদি পৃথিবীর নারী ও পুরুষ' কবিতাটির গোটা তিনেক পাঠ ডায়েরিতে আছে। তারই একটির সঙ্গে আঁকা হয়েছে গাণিতিক লেখ-চিত্র—কবিতাটিকে বোঝানো হয়েছে কার্ভের সাহায্যে এবং কার্ভের অংশ-বিশেষ চিহ্নিত করে লেখা আছে—'ডেরিভেটিভ অব নারী-পুরুষ'।

দিনপঞ্জী অংশটি পড়ে তাঁর গান লেখার প্রসঙ্গটি জানা যায়। সম্পূর্ণ মৌলিক রচনার কোনো নিদর্শন না থাকলেও রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দবিন্যাসের পরিবর্তন করে রচিত গান গেয়ে শুনিয়েছেন—এমন উল্লেখ আছে। নিজের ভাবনাকে ব্যক্ত করতে কখনো-বা রবীন্দ্রনাথের গানে নিজস্ব কয়েকটি পংক্তির সংযোজনা করেছেন।

ব্যক্তিগত লেখালেখি সম্পর্কে সকলেরই একটা কৌতূহল থাকে। আর ব্যক্তির নাম যদি হয় বিনয় মজুমদার সে ক্ষেত্রে আগ্রহের আতিশয্য আরো স্বাভাবিক। দু-মাস কয়েকদিনের পরিসরব্যাপী এই দিনপঞ্জীটির ভিতরে লুকিয়ে থাকে না কোনো চমক বা সাড়া জাগানোর মতো গোপন খবর। পাতার পর পাতায় দৈনন্দিনতা পুনরাবৃত্ত হয়ে আছে—যে অর্থে এটি খুবই সাধারণ। কিন্তু ভোরের জেগে ওঠা থেকে রাত্রির বিশ্রাম পর্যন্ত দিনযাপনের প্রতিটি বৃত্তান্তই অকপটতায় অনন্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত। কবিতায় তিনি যেমন, দিনপঞ্জীতেও তাই—ভাষা দিয়ে কিছু বানিয়ে লেখায় তাঁর বিশ্বাস নেই।

চেনা ও অচেনা নামের বিভিন্ন তরুণ কবিদের সাহচর্যে তাঁর এ সময়টা কেটেছে। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনার টুকিটাকির খবর ডায়েরির নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এইসব আলোচনায় তাঁর অন্তর্ভাবনার একান্ত নিজস্ব খাতটি মাঝে-মাঝেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তেমনই অন্যবদ্য ঈশ্বরীর সঙ্গে তাঁর রাত্রিকালীন একক কথোপকথনের অংশটি। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে এমন ভণিতাবিহীন অনায়াস যাতায়াত বোধহয় বিনয় মজুমদারের পক্ষেই সম্ভব।

প্রায় নিয়মের মতো হয়ে ওঠা যুবকদের সঙ্গে তাঁর আড্ডাগুলি রোজনামচার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এইসব যুবাদের কাছে তাঁর কল্পনা ও উপলব্ধি প্রায়ই উচ্চারিত হয়েছে স্পষ্টতায়। বিচিত্র কোনো সংলাপের পরে কখনো-বা নিজের উক্তিরই ব্যাখ্যাতা হয়ে ওঠেন। 'পৃথিবীতে বসে পৃথিবীকে মঙ্গলগ্রহ ভাবার মতো গভীর ও ক্ষমতাশালী আমার বাক্যগুলি'—শব্দের অমোঘ ক্ষমতা বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির কথা আমাদের জানা হয়ে যায়। তবু মানুষের অনুষঙ্গে রোজকার এই বাঁচাতেও তাঁকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেখি : 'তোমরা একটি ব্যাপারে এখন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছ—যে আমি তোমাদের থেকে আলাদা প্রকারের জীব। বলো ঠিক কিনা ?' বিষণ্ণ এই মুহূর্তটির সাক্ষ্য বহন করছে ডায়েরিটি।

কবির শুভানুধ্যায়ী জনৈক তরুণ—অমল চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত এই ডায়েরিটি। প্রথমে ভাবা হয়েছিল দিনপঞ্জীটির সম্পাদনা করে নির্বাচিত অংশবিশেষ প্রকাশ করা হবে। কথা-প্রসঙ্গে একদিন কবি উৎপলকুমার বসু তাঁর নিজস্ব মত জানিয়ে বলেন : 'ডায়েরির ক্ষেত্রে আমি সম্পাদনার পক্ষপাতী নই।' নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সম্পাদনার পরে ডায়েরির প্রায় সমগ্র অংশটিই প্রকাশিত হল। □

বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা—১

আমি মুগ্ধ, উড়ে গেছো ; ফিরে এসো, ফিরে এসো, চাকা,
রথ হয়ে, জয় হয়ে, চিরন্তন কাব্য হয়ে এসো।
আমরা বিশুদ্ধ দেশে গান হবো প্রেম হবো, অবয়বহীন
সুর হয়ে লিপ্ত হবো পৃথিবীর সকল আকাশে।

কবি, গণিতবিদ বিনয় মজুমদার। থাকেন উত্তর ২৪ পরগণার শিমুলপুর গ্রামে। তাঁর সম্বন্ধে চিত্র-পরিচালক ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন : 'এ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠ কবি।' শিয়ালদা থেকে ২১শে জুলাই রবিবার বনগাঁ লাইনের ঠাকুরনগর স্টেশনে নেমে আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরলাম বিনয়ের কাছে যাব বলে। রেল লাইনের ধার থেকে কাঁচা পথ, একটু এগিয়েই 'বিনোদিনী কুঠী'। কবির পৈতৃক বাড়ি। মায়ের নামে বাড়ি। ১৯৪৮ সালে বাবা-মা ভাইবোনের সঙ্গে পূর্ববাংলার ফরিদপুর থেকে বিনয় মজুমদার এখানে আসেন। বাড়ির দালানে বেঞ্চিতে খালি গায়ে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে একজন বসে আছেন। জানা গেল, ইনি বাংলাদেশি, সপরিবারে কবির দেখাশুনো করেন। থাকেন কোণের ঘরে। মাঝের ঘরের জানলা দিয়ে ভেতরে দেখা যায় ভাঙাচোরা চেয়ার-টেবিল। একটু পরেই পাশের ঘর থেকে এক মুখ না-কামানো দাড়ি নিয়ে বিনয় মজুমদার বেরিয়ে এলেন। একথা-সেকথায় জমে গেল আড্ডা।

বিনয় □ তুমি তো তালতলায় থাকো, মেট্রোপলিটনের ছাত্র ছিলে ?...সব মনে আছে, তালতলা পাবলিক লাইব্রেরিতে প্রতিদিন যেতাম। আমিও মেট্রোপলিটনের ছাত্র ছিলাম, থাকতাম হরকুমার স্কোয়ারের কাছে।...পাশ করে ইডেন হোস্টেলে...হোস্টেলের মাঠে গোলকীপার আর সেই সময় থেকেই কবিতা লিখতাম।

অজয় □ কবে, কোথায় প্রথম কবিতা ছাপা হয়, মনে আছে ?

বিনয় □ (পূর্ব) পাকিস্তানে 'বৌলতলী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের ম্যাগাজিনে, ১৯৪৭ সালে,...১৯৪৮-এ কলকাতায় এসে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হই, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ। আই, এস সি, (গণিত)। তখনই দু-বছর ইডেন হোস্টেলে...সব মনে আছে—হাঃ হাঃ...

অজয় □ আপনার প্রথম বই...

বিনয় □ ১৯৫৭ সালে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করি শিবপুর থেকে। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল কফি-হাউসে। অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেল্‌থে অধ্যাপনার কাজ করি, মাঝে-মাঝে কফি হাউসে...এ সময়ে বিষ্ণু দের

কাগজে (সাহিত্যপত্রে) আমার তিন-চারটে কবিতা ছাপা হয়। বই ছাপা হয় ১৯৫৮ সালে, আসলে পুস্তিকা, নাম : নক্ষত্রের আলোয়। দেবকুমার বসু ছাপেন। রুশ ভাষা থেকে ৫টা বিজ্ঞানের বই আর একটি উপন্যাস···ছাপে ন্যাশনাল বুক এজেন্সি। কবিতা—গল্পও অনুবাদ করি। মাদাম গুসেভারের কাছে রুশভাষা শিখেছিলাম, শিবপুরে ১৯৫৪ সাল থেকে। ফোর্থ ইয়ারে।

অজয় □ 'ফিরে এসো, চাকা' কবে লেখেন ?

বিনয় □ ১৯৫৯ সালে পাইকপাড়ায় মিহির ঘোষ দস্তিদারের বাড়িতে প্রথম-দিকের কবিতাগুলি লিখি, বই ছাপা হয় '৬২ সালে। এর আগে বের হয় 'গায়ত্রীকে'। চোদ্দটি কবিতা তাতে। তারপর দুর্গাপুরে চাকরি নিয়ে কলকাতা থেকে চলে যাই। সেখানে তিন শিফ্‌টে কাজ করতে হতো। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে কবিতা লিখতাম। মাস তিনেকের মধ্যে 'গায়ত্রীকে' পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়, সাতাত্তরটি কবিতা নিয়ে বই হয় 'ফিরে এসো, চাকা' ; দেবকুমার বসু ছাপেন।
শক্তি প্রশংসা করল। হাওয়ায় 'হাংরি'র দলের জনক করা হল আমাকে···আমি ভয় পেয়ে গেলাম, কারণ আমার পক্ষে কোনো দলের নিয়মে থাকা অসম্ভব। আমি গ্রামে থাকতাম, এইখানে। বইটা (ফিরে এসো, চাকা) কলকাতায় হই-চই ফেলে দিল। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় ফিরে গেলাম। কফি-হাউসে শক্তি একদিন চটি পত্রিকা 'কৃত্তিবাস' দেখিয়ে কবিতা চাইল। এতদিন কোনো পত্রিকা আমার কবিতা চায়নি। আমি নাম করেছি। বললাম, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি ; শক্তি বলল, তুই কবিতা না দিলে 'কৃত্তিবাস' বেরোবে না। কী করা যায়—কবিতা লিখতে হল। পরিচয় হল সাগরময় বাবুর সঙ্গে। আলাপ হল উৎপল কুমার, তারাপদ, শঙ্কর (চট্টোপাধ্যায়), সুনীল (গঙ্গোপাধ্যায়), অমিতাভ (দাশগুপ্ত), সুধেন্দু মল্লিক, জ্যোতি দত্তের সঙ্গে।··· স্টেটস্‌ম্যান কাগজে আমার সম্বন্ধে জ্যোতি লিখেছিল অনেক কিছু, 'কবিতার রাজ্যে চিরস্থায়ী নাম' ইত্যাদি···আমি উৎসাহিত বোধ করেছিলাম। এইসময় আমেরিকান অধ্যাপক ডিমকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ১৯৬৪ সালে 'ঈশ্বরীর' নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। এরপর আমি অনেকদিন আর কবিতা লিখিনি—লিখতাম না। কবিতা চেয়ে চিঠি আসত—আমি জানিয়ে দিতাম, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছি।

অজয় □ বিনয়দা, আমি মনে করি, আপনার শ্রেষ্ঠ বই 'অঘ্রানের অনুভূতি-

মালা', আপনি ওই বইটা সম্পর্কে কিছু বলুন।

বিনয় □ শ্রেষ্ঠ বই?—জানি না…'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' নিসর্গ-বর্ণনামূলক, কবিতা—বড় কবিতা লিখি গাছের ছায়ায় আকাশের ছায়ায় বসে; লিখতে ভাল লেগেছিল। শহরের কোনো কোলাহল নেই, অথচ শহরের থেকে বেশি দূর নয়…অনেকদিন ধরে কবিতা লিখেছি আমার এই গ্রামে বসে, বেশ ভাল লেগেছিল। দীর্ঘ ছ'টি কবিতা

নিয়ে বই বেরোল। এরপর আদিরসাত্মক কবিতাগুলি নিয়ে একটি বই বেরোয় তার নাম দিই 'বাল্মীকির কবিতা'…কেন যে লিখেছিলাম মনে নেই এখন।

অজয় □ আপনি চাকরি করতে করতে কবিতা লিখতেন?

বিনয় □ আমি অনেকবার চাকরি করেছি…সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখে যাচ্ছি, এখনও।…এখন অঙ্ক করি না। গান লিখি।

গান গাই।

অজয় □ একটা গান শোনান।

বিনয় □ গান শুনবে ?…বাংলায় গান লেখা হয় না, গাওয়া হয় না…

অজয় □ আপনি সলিল চৌধুরীকে চেনেন ?

বিনয় □ সলিল চৌধুরী ?…আমি অনেক গান লিখেছি, অনেক…গান গাই… দাঁড়াও…

[বিনয় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। 'দাঁড়াও'-বলে ঘরের থেকে একটা লেখা নিয়ে এলেন। আমিও তাঁর সংগে উঠে ঘরে উঁকি মারলাম, দেখলাম ঘরের এক পাশে জানলার কাছে একটা তক্তাপোশে পাতলা তোশকের উপর লাল রঙের বেডকভার, সাদা বর্ডার দেওয়া, এলোমেলোভাবে ঢাকা আছে। বিছানার এক কোণে মশারি জড়ো করা। ঘরে আসবাব বলতে বোধ হয় একটা টেবিল ও একটা মাত্র চেয়ার। টেবিলের ওপর চায়ের কাপ ডিশ। বিছানায় দুটো বই : 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ও 'ফিরে এসো, চাকা'—নতুন সংস্করণ ; আর কিছু সাদা কাগজ।]

দেখো : আজকে ভোরে (শিরোনাম)
আজকে ভোরে কোথায় যেন গেল তারা।
পান্থশালায় গত রাত্রে ছিল যারা,
দু'এক জনের হিসাব রাখি
কোথায় থাকে করে বা-কী।
হারিয়ে যায় সবাই নাকি, আত্মহারা এমন ধারা !

যদি আবার এদের কারো দেখা
পাই-তবে-তা আমার কাছে তোমরা শুনো
খুনীর পায়ে কারাগারে
একটি লোহার-বল বাঁধা রে
নড়তে চড়তে দেয় না তারে।
আর আমাদের সবারই পায়ে
সর্ববৃহৎ বলটি এরূপ বাঁধলো কারা ?

[সদ্যলেখাটা আমার হাতে দিয়ে অস্ফুটস্বরে বিনয়দা সুর ভাঁজতে লাগলেন।]
যেটা খুঁজছিলাম সেটা পেলাম না, কোথায় গেল কে জানে।

অজয় □ এখন কবিরা গান লেখেন না কেন ? আগে তো এমন ছিল না।

বিনয় □ রামপ্রসাদ গান লিখতেন কবিও ছিলেন ; রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, ডি. এল. রায় কবি ছিলেন গানও লিখতেন। স্বাধীনতার আগে কবিরা লিখতেন স্বদেশী গান, স্বাধীনতার পরে লেখেন না। রবীন্দ্রনাথের পর তেমন গীতিকার এলেন না। এখন কবিরা গান

গাইতে জানে না, সুরও জানে না। কবিরা তাই মানুষের কাছ কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ...ব্যাকরণ মানছে না কেউ। এই ঠাকুরনগরের সাইকেল রিক্সাচালক বলে : 'সাইডে সাইডে'—এর মানে 'সরে যান—সরে যান'—এও এখন বাংলা ভাষা। এইরকম অনেক বাংলা ভাষা আছে পৃথিবীতে।... কেন্দ্রীয় সরকার দু'কোটি টাকা ব্যয় করে ১৫ বছরে পাঁচ খণ্ডে 'ভারতকোষ' বার করেছে। রাজ্য সরকারের উচিত গ্রামে গ্রামে ঘুরে নতুন তৈরি বাংলা শব্দ উদ্ধার করা। নতুন বাংলা ব্যাকরণ লেখা প্রয়োজন। বাংলা উচ্চারণ-রীতি, বানান-বিধি নির্ধারণ দরকার। পরিভাষা ঠিক করা দরকার। আজকাল টিভি-রেডিও ভুল বানান, ভুল ভাষা প্রতিদিন দেখায়, বলে ; ছোটরা তাই শেখে, বড়রা দেখে শুনে চুপ করে থাকে। শিক্ষিত লোকেরাও কোনো কথা বলে না।

অজয় □ ভাল বাংলা কবিতা সংকলন আপনার মতে কোনটা ?

বিনয় □ বুদ্ধদেব বসুর 'আধুনিক বাংলা কবিতা' এই বইটারও সংস্করণ দরকার—আরও আধুনিক কবিদের কবিতা নেওয়া দরকার। ওটা অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম নয়। যাঁরা কবি, কবিতা-সাহিত্যের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা এগিয়ে আসুন সম্পাদনায়। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক করেছেন,—'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' পাঁচখণ্ডে লিখেছেন, সারা জীবন লিখুন, বড় পরিশ্রমের কাজ...ওঁকে ছুটি দেওয়া উচিত।

অজয় □ এখন বাংলা কবিতা কেমন লেখা হচ্ছে ?

বিনয় □ ভাল কি মন্দ জানি না। হয়ত ভাল... এই রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা কামারশালায় যাই—প্রায়ই , কামারকে জিজ্ঞেস করি —প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কে, ওরা বলল—চেনে। ওই দুজন কবি কামারদের নিয়ে কবিতা লিখেছেন, ওরা পড়েছে। এই বিশ্বে সমাজের প্রত্যেককে নিয়ে কবিতা লেখা যায় ; তাদের নিয়ে কবিতা লিখব যাদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে রসগ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে। আমাদের দেশের লোকেদের আছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'য় সাধারণেরও বাংলা পাওয়া যায়। অক্ষর-পরিচয় যাদের আছে তারাই পড়বে। যারা বাঙালি হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, তারা পড়বে। অক্ষরহীন চাষিও শুনলে বুঝতে পারবে জীবনানন্দ বাংলার কথা বলছেন।... এখন কবিতাকে সহজ ও সাধারণ হতে হবে ; যেমন : দেখো চেয়ে দূরে / বিশ্বের বৃদ্ধা এসে ফুল তোলে / আমার বাগানে...ঠাকুর নগরের যে কোনো বৃদ্ধা এই কবিতা বুঝতে পারবেন।

[বিনয় মজুমদার মুখে মুখে কবিতাটা তৈরী করলেন, অদূরে এক বৃদ্ধাকে টগর ফুল তুলতে দেখে।]

এখন সকলে রবীন্দ্রনাথকে জানে—বিশ্বাস করে। গ্রামে-গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ছড়িয়ে পড়েছেন সকলের ঘরে। আমার বাড়ি এসে বনগাঁর অধিবাসী পরমেশ্বর রুদ্র লিটল ম্যাগাজিনের হিসাব নিয়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে আটত্রিশ হাজার গ্রাম আছে। ধরো ১০০টা লিটল ম্যাগাজিন আছে। প্রতি বছর দুটি করে সংখ্যা বেরোয়, ২৫শে বৈশাখ অথবা বইমেলা এবং পুজোয়। তাহলে ১০০×২ ২০০টি। পত্রিকাগুলি ২ ফর্মা (৩২ পৃষ্ঠা), হিসাবের অসুবিধে, ধর ৩০ পৃষ্ঠা, রাউন্ড ফিগার, ৩০×২০০=৬০০০ পৃষ্ঠা এক বছরে। আমি লিখছি অনেক বছর ধরে, কমপক্ষে ৩০ বছর। আমি দেখছি ৩০ বছরে (৩০×৬০০০=১,৮০,০০০) এক লক্ষ আশি হাজার, কমপক্ষে ৩০ বছরে ১ লক্ষ পৃষ্ঠা লিটল ম্যাগাজিনের ৯০ হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে রবীন্দ্রনাথ, ১ হাজার পৃষ্ঠার জীবনানন্দ, আরও এক হাজার পৃষ্ঠায় শক্তি ও সুনীল, এ ছাড়া থাকবে আমার আরও বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায় আরও হাজার পৃষ্ঠা জুড়ে। এসব কেউ পড়ে শেষ করতে পারবে ? এরপর আছে বিজ্ঞাপন ও সম্পাদকীয় ইত্যাদি। তারপর নতুন দিনের কবিতা। এত কি পড়া যায় ? রবীন্দ্রনাথ পড়তে পড়তে দিন শেষ হয়ে যায়। তাহলে দেখো রবীন্দ্রনাথের বয়স বাড়েনি…একমাত্র রবীন্দ্রনাথ এদিকে, অন্যদিকে পরমেশ্বর, তিনিই সবকিছু করাচ্ছেন। আমরা তাঁর দাসানুদাস। …আর এক পরমেশ্বর আছে, সে হচ্ছে পরমেশ্বর ধর, তার সঙ্গে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছি। সেই পরমেশ্বর কবিতা লিখত, ছাপাও হয়েছিল।

[বিনয়দা খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকেন। ঠোঁটের কোণে হাসি। অস্ফুটস্বরে কিছু যেন বললেন।]

আর আমাদের পরমেশ্বর যদি বলে ওঠেন,—পৃথিবীর সমস্ত বই আমি লিখেছি। এই কথা কি তোমরা বিশ্বাস করবে ? আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু এখন সেই পরমেশ্বর আনন্দবাজারে গিয়ে যদি বলেন, আমি পুজাসংখ্যার সব লেখা লিখেছি ; তাহলে আমাদের ভীষণ ক্ষতি হবে, গরিব লেখকরা কেউ আর টাকাকড়ি পাবে না। অথবা শিয়ালদায় পরমেশ্বর যদি আনাজ বিক্রি করে রোজ, আমি তার কাছ থেকে ডাব কিনে খেয়েছি অনেক।

অজয় □ আচ্ছা, বিনয়দা আপনারা কবিতা নিয়ে আন্দোলন করেছিলেন ?

বিনয় □ আন্দোলন? ছোট একটা মিছিল, 'আরো কবিতা পড়ুন' হাতে ফেস্টুন নিয়ে কলেজ স্ট্রীট এলাকায় মনে পড়ে। তখনকার সিনেট হলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কবিতাবিষয়ক বক্তৃতা দিয়ে বন্ধুরা পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। আমি একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম শুধু। ভাল লাগত তাদের যৌবন। একদিন বন্ধুদের বললাম, মিছিল করে বক্তৃতা দিয়ে কিছুই হবে না; আসল কথা, ভাল কবিতা লেখা দরকার। তখন বই ছেপে গোপন জায়গায় রেখে দিলেও পাঠকরা খুঁজে নিয়ে পড়বে, বিজ্ঞাপন দিতে হবে না। আমরা কফি-হাউসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কবিতা নিয়ে আড্ডা দিতাম। আমেরিকা থেকে কবি গিনস্‌বার্গ এল, তাকে নিয়ে আমরা অনেক হই-চই করলাম। অনেক আন্দোলন শহর জুড়ে।...

অজয় □ 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র পরের বইগুলো সম্বন্ধে কিছু বলুন।

বিনয় □ কী ব্যাপার বলতো, এসব জেনে তোমার কী হবে? তোমাদের কবিতা লেখার কথা বল।

[বিনয়দা চুপ করে গেলেন। কোন কথা আর বোধহয় বলানো যাবে না। আমি ভাবছি কী করা যায়। বৃষ্টি থেমে গেছে অনেকক্ষণ, উঠোনে মেঘ-ছেঁড়া আলো পড়েছে।]

সে অনেক কথা। [বিনয়দা আবার বলতে আরম্ভ করলেন।] ১৯৭০ সাল অবধি অঙ্ক করেছি তারপর কবিতা লিখতে আরম্ভ করলাম। জ্যোতি দত্তের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল, 'ফিরে এসো, চাকা' পুনর্মুদ্রণ করলেন তিনিই, তখনো 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বের হয়নি। তারপর অরুণা (প্রকাশনী) থেকে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা' বের হল [বিনয়দা চুপ করে থাকলেন।] অনেকপরে, মাঝে-মাঝেই কফি-হাউসে যাই, তরুণ কবিদের সঙ্গে আলাপ হল। তখন আমি অন্যরকম কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছি, আগের কবিতাগুলির সঙ্গে কোনো মিল নেই এই কবিতাগুলির। ১৯৮৫ সালে ধূর্জটি চন্দ আমার একটা বই প্রকাশ করল, বইটার নাম দিয়েছিলাম 'আমি এই সভায়' তার আগে আর একটি বই বেরিয়েছিল 'আমাদের বাগানে'। কিছুদিন আগে — অনেকদিন হয়ে গেল, কলকাতায় হাসপাতালে ছিলাম··· আবার অঙ্ক, মনে আছে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ···আমি এখন সব কিছু নিয়ে কবিতা লিখতে পারি। প্রবন্ধও লিখেছি অনেক অমলেন্দু বিশ্বাসের পত্রিকায়। আর কী জানতে চাও?

অজয় □ বিনয়দা, 'আমি এই সভায়' বইয়ের কবিতাগুলোর সম্বন্ধে কিছু

বলুন আর—

বিনয় □ 'আমি এই সভায়'—যা দেখেছি সকালে-বিকালে তাই লিখেছি, কোন কল্পনা নেই ; আমার দেখা দৃশ্যটিকে বিশ্বের বৃহতের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে গিয়ে এই কবিতাগুলির সৃষ্টি। খুব সহজ, আবার এতটা সহজও নয়, সময় লাগবে সবটা বুঝে নিতে। কবিতাগুলি পৃথিবীর একজন মানুষের লেখা দিনপঞ্জী। যেমন :

বহুপথ আছে আমার শিমুলপুর গ্রামে।
এইসব পথ হেঁটে গ্রামবাসীদের সারাজীবন চলেছে।
আমাদের গ্রামে আছে সুপ্রশস্ত পীচঢালা আধুনিক পথ,
চওড়া মাটির উচু প্রাগৈতিহাসিক পথ আছে।
এসব প্রধান পথ থেকে বেরিয়েছে আরো নানা শাখাপথ
যেগুলি প্রকৃতপক্ষে মানব ইতিহাসের সমান বয়সী।
—ইত্যাদি আমি এখন লিখি এইভাবে সর্বকিছু।

অজয় □ বিনয়দা, আপনি কী ধরনের বই পড়তেন, বিদেশি কবিতার বই বা…

বিনয় □ সব ধরনের বই, এমনকি ডাক্তারি বইও, রুশভাষা শিখেছিলাম লেনিনের লেখা পড়ব বলে, এ ছাড়া বিজ্ঞানের বই। সাহেবদের কবিতার বই অনেক পড়েছি, এখন কারও বই পড়ি না, সাহেবদের তো একেবারেই নয়, ১৯৬৯ সাল থেকে।

অজয় □ আপনার প্রিয় কবি কারা, প্রিয় বই……

বিনয় □ অনেকে। প্রিয় বই 'গীতবিতান'। আর একটা বই, সুনীল শুনলে হাসবে হয়ত, বইটা হচ্ছে এলিজাবেথ ব্রাউনিং-এর 'সনেট সঙ্ পর্তুগীজ'।

অজয় □ বিনয়দা, আপনার বন্ধুদের মধ্যে কার কবিতা ভাল লাগে ?

বিনয় □ বন্ধুদের মধ্যে ? আমার অনেক বন্ধু—কার কবিতা ? বলব না—উপায় নেই—ওই যে গান :

একটি লোহার বল বাঁধা রে
নড়তে চড়তে দেয় না…

[গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বিনয়দা মিটিমিটি হাসতে লাগলেন।]

তুমি যাও, আবার পরে এসো… □

সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন অজয় নাগ। ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিনয়ের সঙ্গে আড্ডা—২

প্রথম আলাপের দিনই তাঁর কাছে পত্রিকার জন্য কবিতা চেয়েছিলাম। একগুচ্ছ কবিতা হাতে তুলে দিয়ে বললেন 'পুরোটাই নিয়ে যাও।' কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে আড্ডার বাসনা নিয়ে উঠে আসি প্ল্যাটফর্মের চায়ের দোকানে। একটু পরে হঠাৎই বলে ওঠেন : 'কবিতার কোনো মানে থাকে না—এটা সকলে বোঝে না। কোনো-কোনো কবিতার হয়ত মানে হয়—কাশীরাম দাশের মহাভারত যেমন। সেগুলিও কবিতা। কিন্তু পাঠের পর তোমার ভিতরে তো একটা অনুভূতি জাগে। সেই অনুভূতিই আসল। যেমন জীবনানন্দের কবিতা, এইরকম লেখার সাহস কোথায় কবিদের? এখনকার কাউকেই তেমন দুঃসাহসী হতে দেখি না? তবে শক্তি কিছুটা দুঃসাহস দেখিয়েছে। 'বজ্র হানো / জ্বালো কাষ্ঠে চিতা…' শক্তি পেরেছে, এইভাবে লাইনের পর লাইন ও লিখে যেতে পারে। অনেকটা লিখতে পারে।' টানা লিখে যাওয়া প্রসঙ্গে 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা'র কথা বলি। বিনয়দা মৃদু হেসে আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। নিজের লেখালিখি নিয়ে কিছুই বলতে চাননি। অনেকটা স্মৃতিচারণার মতো বলে ওঠেন: 'ফিরে এসো, চাকা' তখন অনেকেই সম্ভবত বোঝেনি। সাহিত্যের কোনো পত্রিকায় নয়, 'ফিরে এসো, চাকা' নিয়ে প্রথম লেখা বেরোল স্টেটসম্যান পত্রিকায়। বাংলা ভাষার এক কবিতার বইয়ের নাম প্রথম বেরোল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের কাগজে।'

কথায়-কথায় আবার জীবনানন্দের কবিতার সরণী বেয়ে চলে যান নিজের জগতে, 'কবিতাপাঠে একপ্রকার ভাবান্তর হয়। এই ভাবান্তর হলেই পাঠের আনন্দ পাওয়া সম্ভব হয়। আনন্দ বেশি হলে কবিতাটিও আরো ভাল লাগে, মনে থেকে যায়, মুখস্থ হয়ে যায় নিজে নিজেই', বলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা কিছুটা আবৃত্তি করেন। তারপরে বলেন, 'তোমার বাড়িতে উপনিষদটা একটু দেখে নিও। উপনিষদও তো প্রাচীন কবিতা। প্রাচীন থেকে আধুনিক সমস্ত কবিতাই এই ভাবান্তর ঘটিয়ে দেয়। মহৎ কবিতার এটাই বৈশিষ্ট্য।'

আরো দীর্ঘ-আড্ডার বাসনা নিয়ে পরে একদিন গেলাম টেপ রেকর্ডার সঙ্গে নিয়ে। বললাম : 'বিনয়দা, পত্রিকার জন্য যে কবিতাগুলি দিয়েছেন, সেগুলি সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে কিছু শুনতে চাই।'

বিনয় □ নিজের কবিতা বিষয়ে কিছুই বলব না আমি। বলা উচিত নয় আমার। তুমি কি কবিতা লেখ?

সঞ্জয় □ লেখার চেষ্টা করেছি এক সময়। এখন পারি না, আসে না…

বিনয় □ কবিতা রচনার এক পদ্ধতি আমি তোমাকে শিখিয়ে দিই। দেখ,

পার কিনা—

টেবিলের উপরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে বই-কাগজ-কলম-মোমবাতি অ্যাশট্রে ইত্যাদি। বিনয়দা সেগুলি নাড়াচাড়া করতে থাকেন, বইটি খুলে দেখেন এবং মুখে মুখে তাঁর এই সমস্ত ক্রিয়ার একটা ছন্দোবদ্ধ বর্ণনাও দিতে থাকেন :

'…কলমটি পড়ে আছে টেবিলের কোণে
হাত দিয়ে কলমটি ধরি…
এই ভাবে আমি কবিতা রচনা করি
যাতে মৌলিকতা কবিতায় আসে
কারো কাব্য অনুসরণের চেষ্টা তো করিনি আমি
যা-যা ঘটে যা-যা করি তাই লিখি মাঝে-মাঝে।'

বিনয় □ এই পদ্ধতিতে যদি লিখে যাও, তাহলে কারো সঙ্গে মেলার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সঞ্জয় □ এই যে নিজে যা-যা করছেন সেগুলিই পয়ারে লিখে ফেলা ?

বিনয় □ পয়ার তো আমি মুখে-মুখে বলি। তিরিশ বছর ধরে পয়ার লিখেছি। ফলে পয়ারটি আমার নিজের জিনিস হয়ে গেছে। তারপরে শোনো—

'…এইভাবে কবিতায় যদি কেউ মৌলিকতা আনে
তবে তাতো বোধবহ নয়—
আমার কবিতা প্রায় সঙ্গীহীন হবে
মৌলিক কবিতা লেখা নিজে করে তার পরে—
…
এখন হেমন্তকালে যেন ঐ সূর্যদেব আমার নিকটে তার বলবার আছে
তার ফলে রৌদ্রটুকু পাঠিয়েছে আমার দুয়ারে
আমি তাই ভেবে দেখি হে সূর্য তুমি তো আছ ভাল মনে হয়
আমার অবস্থা কিন্তু ক্রমে-ক্রমে ধীরে-ধীরে ভালই হয়েছে
এই বিশ্বে মহাবিশ্বে সীমাহীন এই শূন্যে বাস করি আমরা সকলে
পরস্পর যুক্তভাবে যদিও রয়েছি তবুও যুক্ত থাকা এবং পৃথক থাকা
ঐ যে গরুটি ঐ ঐখানে চরে ওর সঙ্গে আমরা সকলেই যুক্ত আছি নানাভাবে
আবার বিযুক্ত আছি বলাও তো যায়
কারণ গরুটি হল ভিন্নপ্রকারের এক জীব আর আমরা তো
কেউ কেউ দেবতা বা কেউ বা মানুষ
এইভাবে পৃথিবীতে পৃথক-পৃথক হলেও জীবগুলি আছে
একটি গোয়ালে যেমন কুকুরেরা বিড়ালেরা থাকে তেমনি এখানে

পৃথিবী নামক এই গোয়ালটিতেই আমরা সকলে
মানুষ দেবতা দেবী পরমেশ্বরেরা এইখানে এই পৃথিবীতে
গোয়ালের মতো এই পৃথিবীতে বাস করি একত্রে সকলে।

শব্দ তৈরি করা আমার অন্যতম কাজ। যেমন, 'মনোলীনা'-এটি আমার সৃষ্টি করা শব্দ। 'প্রকৃত পক্ষে' শব্দটি তুমি সারাজীবনে বহুবার পড়েছে। 'প্রকৃত প্রস্তাবে' কোথাও পড়েছ?

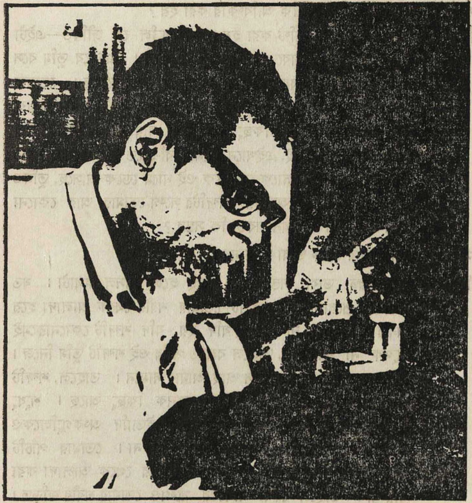

সঞ্জয় □ 'ফিরে এসো, চাকা'-র প্রথম কবিতায়—'দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে স্বচ্ছ নীল জলে…'

বিনয় □ 'প্রকৃত প্রস্তাবে' শব্দটি আমিই প্রথম তৈরি করেছি। তারপরে চালু হয়ে গেছে বাংলা ভাষায়। অন্যদের লেখাতেও শব্দটি এসেছে। অর্থাৎ শব্দটি গৃহীত হয়েছে বাংলাভাষায়। শব্দ তৈরি দুইভাবে হতে পারে। মধুসূদন লিখেছিলেন 'আরম্ভিল'। শব্দটি তৈরি

করেছেন মধুসূদন। তার বই মহামূল্যবান। মধুসূদনের জন্য ব্যাকরণের নতুন কিছু সূত্র লিখতে হয়েছে। 'আরম্ভিল' শব্দটি কীভাবে তৈরি হল, কী তার মানে—ইত্যাদি ব্যাখ্যা তৈরি হয়েছে। বোঝ তাহলে!

শব্দ হল ব্রহ্ম। জীবিত। 'শব্দ ব্রহ্ম' তো পড়েছ, 'শব্দগুলি জীবিত' কোথাও পড়েছ তুমি ? শব্দগুলি আসলে জীবিত। বুঝলে ?

সঞ্জয় □ সেই জীবিত শব্দকে কি আবিষ্কার করা হয় ?

বিনয় □ তৈরি করা হয়, সৃষ্টি করা হয়। শব্দগুলি যে জীবিত—এইটা প্রথমে তোমাকে ভাবতে হবে, বুঝতে হবে। এই যে তুমি বসে আছ, তোমার নামবাচক শব্দটিও তোমার সঙ্গে রয়েছে। তোমার দেহ থেকে, তোমার শরীর থেকে ওই নামবাচক শব্দটিকে কি পৃথক করা সম্ভব ? এমন কিছু কি করা যায় যাতে শব্দটি আর তোমার ভিতরে নেই, এইখানে আমার বাঁ-হাতে চলে এসেছে ? গত তিরিশ বছর ধরে লোকে তোমাকে ওই নামে ডেকে আসছে, তুমিও সাড়া দিচ্ছ—এই অবস্থায় শব্দটির সঙ্গে তোমার আর কোনো সম্পর্কই রইল না এমন অবস্থা কি সম্ভব ?

সঞ্জয় □ এটা আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়।

বিনয় □ ঠিক ধরেছ, ভাবা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে আসল কথাটা। যত পদ্ধতিই প্রয়োগ করি শব্দটি তোমার শরীর থেকে আলাদা হয়ে অন্যত্র যেতে পারে না। তাই যদি হয়, যদি শব্দটি কোনোক্রমেই পৃথক না করা যায়, তাহলে বলতে পারি ওই শব্দটি তুমি নিজে। এই যে তুমি জীবিত বসে আছ আমার সামনে। তাহলে, শব্দটি আসলে জীবিত। এরকম আরো অনেক কিছু আছে। শুধু নামটাই নয়। এক, দুই, তিন, চার ইত্যাদি অংকগুলিকেও তোমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তোমার পাঁচটি আঙুল। 'পাঁচ' শব্দটিকে তোমার হাতের থেকে আলাদা করা যায় না। তাহলে দেখ, গণিতের সঙ্গেও তোমার শরীর জড়িত। 'পাঁচ' হয়ে গেল জীবিত। এই হল কাণ্ডটা।

সঞ্জয় □ কবিতায় শব্দসৃষ্টিই তাহলে কবির কাজ—

বিনয় □ হ্যাঁ, কিন্তু সবাই পারে না। নতুন শব্দ সৃষ্টি করা এবং তাকে গৃহীত করা। পৃথিবীতে একহাজার বছর ধরে লোকে যদি শব্দটি পড়ে এবং বলে তাহলে বুঝতে হবে শব্দটি সত্যিই আছে। আমারও একটি কাজ হল শব্দ সৃষ্টি করা। 'মহাসহস্র' বলে একটি শব্দ

আমি সৃষ্টি করেছিলাম।

সঞ্জয় □ 'লক্ষাব্দী' শব্দটিও আপনার সৃষ্টি—

বিনয় □ হ্যাঁ, 'লক্ষাব্দী', 'মহাসহস্র' ইত্যাদি শব্দগুলি সৃষ্টির ক্ষেত্রে পুরনো ব্যাকরণের নিয়মকেই অনুসরণ করা হয়েছে। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দ সৃষ্টি করেছেন তাতে পুরনো শব্দগুলিকে জুড়ে-জুড়েই নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। দেখ, জীবনানন্দ লিখেছেন—'আকাশলীনা'। শব্দটি আমরা মুখস্থ করেছি বটে, ছাপাও হচ্ছে, তার মানে শব্দটি সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু শব্দটি কেউ লেখে না। তেমনই 'মনোলীনা', 'মনস্' যোগ 'লীনা'। এবার 'তারাত্ব', 'চলত্ব', 'গমত্ব', আমার সৃষ্টি করা এই শব্দগুলির কথা ধরা যাক। 'চলৎ' যোগ 'ত্ব'—'চলত্ব'—একটা জিনিস চলছে সেই অবস্থাটিকে বোঝানো হল। 'গমত্ব' শব্দটি তৈরি করার সময় আমি ভীষণভাবে ভাবছিলাম—মোমেন্টামের বাংলা কী হবে।

ভবিষ্যতে কত রকমের শব্দ বানাবার সুযোগ রয়েছে পৃথিবীতে ভাবো একবার। অসংখ্য শব্দ তৈরি হতে পারে। যাদের ক্ষমতা আছে তারা করবে। এই যে আমাদের জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের অভিধান তাতে একলক্ষ কুড়ি হাজার শব্দ রয়েছে। মানুষকে তা সৃষ্টি করতে হয়েছে। কিংবা কোনো সৃষ্টিকর্তা তা সৃষ্টি করেছেন। শব্দ সৃষ্টির সঙ্গে-সঙ্গে অর্থও তাতে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু অর্থ নয়, তার শরীর তৈরি হয়ে গেছে। ইংরেজি ভাষাতে আছে সাড়ে চার লক্ষ শব্দ আর বঙ্গভাষাতে এক লক্ষ কুড়ি হাজার শব্দ। তাও আবার কী-রকম—একটা গাছ বোঝাতেই লেগেছে পাঁচ-পাঁচটা শব্দ : গাছ, তরু, বৃক্ষ, মহীরুহ ও পাদপ। তাহলে তো একলক্ষ কুড়ি হাজারকে আমাদের পাঁচ দিয়ে ভাগ করে নিতে হয়। থাকে চব্বিশ হাজার শব্দ। তাহলে দেখ, বৃটিশ আর বাঙালিদের মধ্যে চিন্তার তফাত কতখানি। আমরা ভাবি চব্বিশ হাজার শব্দ দিয়ে আর ওরা ভাবে সাড়ে চার লক্ষ শব্দের সাহায্যে। এত শব্দ দিয়ে ওরা ভাবেটা কী সেটাও তো আমাদের ভেবে দেখা দরকার। সেই জন্যই শব্দ তৈরি করা দরকার।

সঞ্জয় □ এই যে একই জিনিসকে আমরা নানা নামে ডাকি সেটা কি অপ্রয়োজনীয় ?

বিনয় □ অপ্রয়োজনীয় সে কথা বলছি না। আমি বলতে চাইছি লক্ষ-লক্ষ শব্দ তৈরি করার সুযোগ আছে।

'শব্দগুলি জীবিত'। এবং সেই জীবিত শব্দেরা শরীর ধারণ করে আছে। চিত্র-

কল্পের বর্ণনা নয়, যেন গাণিতিক কোনো অনুসিদ্ধান্তের কথা বলা হচ্ছে। যুক্তি স্থাপনের এই ঝোঁকে তিনি আপাতভাবে অর্থহীন শব্দের মধ্যেও খুঁজে পান জীবিত শরীর। টেবিলের উপরে পড়ে থাকা একটি পত্রিকায় ছাপা তাঁর রচিত একটি কবিতা পড়ে শোনান : 'একটি নিড়িহা পাখি আমার বাগানে···'

বিনয় □ এই যে 'নিড়িহা' পাখি আমি লিখেছি এই 'নিড়িহা' শব্দটি জীবিত। আমি লেখার আগে শব্দটি ছিল না। শব্দটি বানাবার পরে, যেহেতু এটি একটি শব্দ, তাই সে জীবিত হয়ে উঠল।

সঞ্জয় □ কী করে এল শব্দটি ? ভিতরে ধ্বনিটি উচ্চারিত হল আর শব্দটিও তৈরি হয়ে গেল—এইভাবে ?

বিনয় □ আমি ইচ্ছে করেই ভাবলাম কী শব্দটি বসানো যায়, দেখলাম 'নিড়িহা' বলে একটি শব্দ বসাতে পারি যা পৃথিবীর কোথাও নেই —কোনো ব্যাকরণ দিয়েই তৈরি নয় এটা। এ হচ্ছে শব্দ তৈরির আরেকরকম পদ্ধতি। দ্বিতীয় পদ্ধতি। কিন্তু শব্দগুলি জীবিত। এবং 'নিড়িহা' শব্দটিও জীবিত।

সঞ্জয় □ শব্দের অর্থ ও তার শরীর—প্রকৃতিতে মানুষ ছাড়া আর কোনো প্রাণীর পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব নয়।

বিনয় □ কেন সম্ভব নয় ? পাখিদেরও অভিধান লেখা যায়। একটু কষ্ট করতে হয়। চিন্তা করতে হয়—পাখিরা কী-কী শব্দ বোঝে। ধর, তুমি খাও, পাখিরাও খায়। 'খাওয়া' ব্যাপারটি তাহলে পাখিরা বুঝতে পারে। পাখিদেরই ভাষায় বুঝতে পারে। 'খাওয়া' শব্দটি তাহলে পাখিদের অভিধানে আছে। এখন, চিন্তা জিনিসটা তো হল মনের মধ্যে নানারকম শব্দের নড়াচড়া—চিন্তা মানেই মনের মধ্যে শব্দের চলাচল। হয়ত, এক পৃষ্ঠারই একটি অভিধান হবে—তবু পাখিদের শব্দ ও বাক্য ইত্যাদি আছে।

সঞ্জয় □ কোনো-কোনো কবিতায় নির্দিষ্ট শব্দ না বসিয়ে আপনি লিখেছেন —বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ইত্যাদি। এটা কেন ?

বিনয় □ বহু কথা আছে যা গোপনীয়। এমন-এমন সব ব্যাপার আছে যা বলা যায় না, বলা উচিত নয়। গোপনে গোপনে রাখা ভাল। অথচ সেগুলো আমার মনে রাখতে হবে। সেই জন্য এমন একটা ভাষা সৃষ্টি করেছি যাতে পাঠক কিছু বুঝতে না পারে। অথচ এগুলো ছেপে রাখা দরকার, ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে।

'মাঘের বিকালবেলা জানালার কাছে বসে শুনি/অনেক বিশেষ্য ডাকে ওইখানে গাছে বসে উড়ে'—এই কবিতাটি বিনয়দাকে পড়ে শোনালাম।

বিনয় □ শব্দগুলি না দিলেও তুমি একটা মানে করে নিতে পারছ। তোমার

করা মানের সঙ্গে আরেক জনেরটা না-ও মিলতে পারে। তবু পাঠককে বলা হচ্ছে—ভেবে নাও।

এরপরে আরেকটি কবিতা পাঠ করে শোনালাম : 'শব্দ দিয়ে সাগরের গভীরতা আজো মাপা হয় / প্রশান্ত হৃদয়ে আমি বসে আছি, আমি ও কল্পনা…'

সঞ্জয় □ বিনয়দা, এই কবিতার প্রথম লাইনটা বিচ্ছিন্নভাবে ধরি তা যেন হয়ে ওঠে নিছক বিজ্ঞান-বিষয়ক একটি তথ্য, অর্থাৎ শব্দ এখানে 'সাউন্ড' যা সাগরের গভীরতা মাপার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আমি তো ভাবতেই পারি 'শব্দ' আসলে ওয়ার্ড—'সাগরের গভীরতা মাপা' বলতে শব্দের ক্ষমতার অমোঘতাকেই বোঝানো হয়েছে। একটা বৈজ্ঞানিক বিষয়ের বাক্য থেকে অনুভূতি অন্য দিকে চলে যায়—

বিনয় □ সাহিত্যের দিকে চলে যায়। জিনিসটার যেন মনুষ্যীকরণ ঘটে যায়। তুমি একেবারে হুবহু সত্যি কথা বলেছ। আমি ঠিক এই-এই ভেবেই কবিতাটি লিখেছি। একই বাক্যে সাগরের গভীরতা মাপা সম্বন্ধেও লিখেছি এবং শব্দ দিয়ে আমার সম্বন্ধেও লিখেছি। একই বাক্যের দুই মানে। শব্দবিন্যাস, বাক্যবিন্যাস ইত্যাদি বহু ব্যাপার আছে। অত সোজা নয়, বুঝলে? অনেক কাণ্ডই এর ভিতরে আছে।

সঞ্জয় □ সেগুলোই একটু বলুন না।

বিনয় □ সেগুলো বলার দরকার নেই। তুমি অন্য কথা শোনো—

'বর্তমানে সোভিয়েত দেশের রাষ্ট্রপতি লিওনিদ ব্রেজনেভ
এককালে সৈনিক ছিলেন
বিশাল বিস্তীর্ণ দেশ পৃথিবীর কামিনী শেফালি জুড়ে আছে
পৃথিবীর মানচিত্র দেখে আমি সোভিয়েত দেশকে চিনেছি
সোভিয়েত দেশের সব নরনারী সাদারঙা আর
তাদের গড় আয়ু হল রঙগন বছর…'
…
'হে আমার বন্ধুজীব
রজনীগন্ধা সমুদ্রের পারে আমি তোমাদের দেশে কখনো যাইনি'

বিনয় □ এগুলো তুমি পড়নি না?

সঞ্জয় □ না।

বিনয় □ এগুলো লিট্‌ল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। তারপরে—

'ভারতের রাষ্ট্রপতি নীলম সঞ্জীব রেড্ডি গন্ধরাজ গ্রহণের পরে
ভবিষ্যতে ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতি হতে পারেন হয়তো—'

এগুলি আমার রাষ্ট্রপতিদের নিয়ে লেখা কবিতা। এমনভাবে লিখতে হবে যাতে তাঁরা মনঃক্ষুণ্ণ না হন, যাতে মানহানি না ঘটে। তাহলে তো একেবারে সর্বনাশ ঘটে যাবে। এইসব ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম যে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিই কবিতাগুলি। প্রথমে লিখলাম : 'হে আমার বন্ধুজীব / অতলান্তিক সমুদ্রের পারে আমি তোমাদের দেশে কখনো যাইনি।' তারপরে পনেরো মিনিট পায়চারি করে এসে 'অতলান্তিক' কেটে লিখলাম 'রজনীগন্ধা'। তাহলে বল, এই যে ফুল বসিয়ে-বসিয়ে এ প্রকারের কবিতা লেখা—এটা আমার নিজস্ব পদ্ধতি কিনা ? এরকম তেরোটা পদ্ধতি আমি একাই আবিষ্কার করেছি। আমার কবিতাতেই সমস্ত রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে যদি পড় এবং আমার কবিতাসংগ্রহ ছাপা হয় যদি জানতে পারবে। এখন বল, লোকে কি ভবিষ্যতে স্বীকার করবে যে বিনয় মজুমদার নামে এক ইঞ্জিনিয়ার কবিতা লেখার তেরো রকম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিল ?

সঞ্জয় □ আমার মনে হয় নিশ্চয়ই স্বীকার করবে।

বিনয় □ স্বীকার করবে তুমি বলছ ? এখনো বানাতে পারি। কিন্তু কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়েছি, আর লিখব না।

এরপরে বিনয়দা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। আলাপচারিতা বন্ধ হয়ে থাকে। খোলা জানালা দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ততক্ষণে বাইরে দূরে প্রসারিত। দৃশ্যাবলী তাঁর কাছে ধরা দিতে থাকে। কবিতার পংক্তিতে নীরবতা ভাঙেন :

এইখানে মাটির পরে এক নারিকেল গাছ গজিয়ে উঠেছে
নারিকেল গাছটির কাছে পাখি নেই গরুও তো নেই দেখি
গাছের নিকটে
কয়টি মানুষ হেঁটে চলে যায় একটি মানুষ বসে আছে ঐ
বারান্দার 'পরে
এখন আকাশে সূর্য মধ্যাহ্নকালে রাত্রে তারারা সব উঠবে নিশ্চয়
মৃত্তিকা ও গাছ আর পশু আর পাখি আর মানুষ এবং
তারাগুলি সূর্যদেব এইসব জীবিত ও চিন্তাশীল
এবং চলনক্ষম শব্দের সাহায্যে আমি কবিতাটি রচনা করেছি...

বিনয় □ এইবার কবিতা আলোচনা বন্ধ কর, অন্য কিছু বল। কারণ আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে নিজের বিশেষ কিছু বলা উচিত নয়। কোনো কারণেই উচিত নয়। তুমিও কবিতা লেখ। তোমার কাছে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে 'কীভাবে লিখেছেন মশাই ?' তাহলে কেমন লাগবে ? দেখ ভেবে-চিন্তে। আমি কীভাবে লিখেছি তা অতি গোপন ব্যাপার। শুধু বলতে পারি জীবিত, চিন্তাশীল ও

চলনক্ষম শব্দসমূহের সাহায্যেই আমি কবিতা লিখেছি। তোমরা জিজ্ঞাসা করছ বটে কিন্তু আর বিশেষ কিছু বলা উচিত নয়। কেন না, কবিতা লেখাটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি।

সঞ্জয় □ কবিতা লেখা বন্ধ করার কথাটা আপনি বারবার বলছেন। সেদিনও বলছিলেন—লেখার চেয়ে মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, কথা বলা এসবই বেশি ভাল লাগছে আপনার। কিন্তু এও বলেছিলেন

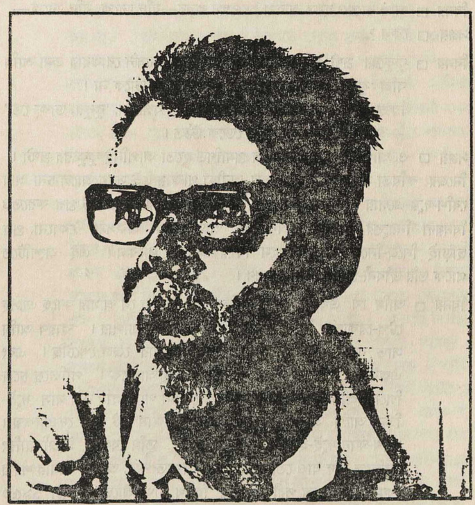

—সকলেরই কিছু একটা কাজ করতে হয়, তেমনই কবিতা লেখাটাও আপনার একটা কাজ। এ কাজ না করে আপনি আর কী করবেন—বা ধরুন চলনক্ষম শব্দের যে জগতের কথা আপনি বললেন—তাকে এড়িয়েই বা থাকবেন কী করে?

বিনয় □ কী জানি, আমার মন কেন যেন বলছে আর লেখা উচিত নয়।

মাঝে মাঝে রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে / ভাবি যে 'আমার তৈরী কুকুর ডাকতো'। কবিতাটি পড়ে শোনানোর পর আবার কথোপকথন শুরু হয়।

বিনয় □ যে কথাগুলো লিখেছি, তুমি পড়ে শোনালে, সব সত্যি। অর্থাৎ কুকুর আমি সৃষ্টি করিনি, কুকুর অন্যের সৃষ্টি—সেই কথাটাই ওই ভাবে লেখা হয়েছে।

সঞ্জয় □ তাহলে 'আমার তৈরি কুকুর' কেন বললেন ?

বিনয় □ সেটা তো জিজ্ঞাসা করে বোঝা গেল।

সঞ্জয় □ আপনি দশ পর্যন্ত গুণে অপেক্ষা করছেন কেন ?

বিনয় □ আজ রাত্রেও হয়ত আবার অপেক্ষা করব—যদি ডাকে, যদি ডাকে—

সঞ্জয় □ কেন ?

বিনয় □ কুকুরের স্রষ্টা কে—আমি না অন্য কেউ সেটা বোঝবার জন্য আমি বলি 'কুকুর, একবার ডাক তো—।' কুকুর ডাকে না।
কিন্তু যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি যদি বলতেন, 'কুকুর, ডাক্ তো' —অমনি সঙ্গে-সঙ্গে কুকুর ডেকে উঠত।

সঞ্জয় □ ও, আপনার কথায় ডাকলে প্রমাণিত হতো আপনিই কুকুরের স্রষ্টা।

নিজের কবিতা সম্পর্কে বলতে তাঁর অনীহা থাকায় এই সূত্রে আলোচনা আর বেশি দূর এগোয় না। প্রসঙ্গান্তরে যাবার অভিপ্রায়ে দু-একটি প্রশ্ন করতেও বিনয়দা নিরুত্তর থাকেন। কিছুটা আত্মমগ্নও। একসময় কোনো প্রশ্ন ছাড়াই নিজে-নিজে কথোপকথনে ফিরে আসতে থাকেন। এই অংশটিতে থাকে তাঁর জীবনী-প্রসঙ্গ, স্মৃতি-চারণ।

বিনয় □ আমি যে এখনো বেঁচে আছি এবং তোমরা যে আমার কাছে এসেছ টেপ-রেকর্ডার নিয়ে, সেটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ আমি সাত বার পাগলাগারদে থেকেছি, চারবার জেল খেটেছি। এবং একবার দেশত্যাগ করে পালাতে হয়েছে আমাকে। পালিয়ে চলে গিয়েছিলাম পূর্ববঙ্গে। কারণ, যেদিন পালালাম তাঁর মাস দুই-তিন আগে আমার বাঁ-চোখ এবং বাঁ-কান নষ্ট করে দেওয়া হয়। চোখ-কান দুই-ই আমার ভাল ছিল। তুমি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যদি যাও তো খোঁজ নিয়ে দেখতে পার, আমার আমার শরীর কেমন ছিল তা পরীক্ষা করে লিখে রাখা আছে। সেটা ১৯৫৩ থেকে ৫৭ সালের মধ্যবর্তী সময়। তখন চোখ-কান সবই আমার ভাল ছিল। কিন্তু কলকাতাতেই পরে লোকে ধরে আমার বাঁ-চোখ আর বাঁ-কান নষ্ট করে দিয়েছিল। তার দু-তিন মাস পরে কাউকে না জানিয়ে, পাসপোর্ট ছাড়াই চলে গেলাম পূর্ব-পাকিস্তানে। গিয়ে উঠলাম পৈতৃক গ্রামে। সেটা ১৯৬৬ সাল, আমার বত্রিশ বছর বয়স। ওখানকার সমবয়সী মুসলমান যুবকেরা দিব্যি আদর-আপ্যায়ন শুরু করে দিল। তারা বড়ি-ফড়ি কিছু খাওয়াতেও

এল না। ইনজেকশনও দিতে এল না। তোফা ছিলাম! ভোরবেলা একজনকে ইংরেজি পড়াতাম, দুপুর বেলায় শেখাতাম অঙ্ক। আর রাত্রিবেলা চার-পাঁচ জনকে পড়াতাম—ক-খ-গ-ঘ থেকে শুরু করে ক্লাস নাইনের পড়া পর্যন্ত। বাকি সময়টা আড্ডা মেরে বেড়াতাম। এই হচ্ছে আমার জীবন কাহিনী।

আর ভারতবর্ষে আমাকে সাতবার পাগলাগারদে পোরা হয়েছে। অনেকেই তো পাগলাগারদে ছিলেন। তাঁদের জীবনীতে তা লেখা হয় না। আর আমার জীবনী লিখতে গেলে প্রথম বাক্যই লেখে—'গোবরা মানসিক হাসপাতালে ছিলেন…'। পাগলাগারদে আর কে-কে ছিলেন শুনবে? লুম্বিনী পার্কে ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক। এঁদের জীবনী যখন লেখে তখন তো এসব একথা এভাবে লেখে না যে এঁরা পাগলা-গারদে ছিলেন। অথচ আমার ক্ষেত্রে প্রথমেই ওই কথা—'মানসিক হাসপাতালে ছিলেন…'।

পূর্ব-পাকিস্তানে পালিয়ে থাকার সময় একদিন নিজেই হাজির হলাম পুলিশের কাছে। ওদের বললাম, 'আমাকে আর ভারতবর্ষে ফিরে যেতে বলবেন না। যদি দরকার হয়, আমি মুসলমান হয়েই থাকব এইখানে যেখানে আমার বাবা-মা জন্মেছিলেন। কিন্তু ভারতে আর ফিরতে বলবেন না আমাকে।' ঢাকা থেকে গোয়েন্দা এল। আমাকে বলল, 'কবিতা লেখেন নাকি? কাগজ দিচ্ছি, লিখুন দেখি কী কবিতা লেখেন।' ফোটো তুলল আমার। সামনে, দুই পাশে, চুল-দাড়ি সহ, চুল-দাড়ি কামিয়ে ইত্যাদি নানাভাবে ফোটো তোলা হল। এইসব আমার জীবনে ঘটেছে। পুলিশ আমার অনুরোধ শুনে বলল, 'তা কি হয়? আমাদের আইন মোটে একটাই। কেউ যদি বর্ডার পেরিয়ে ঢুকে পড়ে তো তাকে তার মূল দেশে ফেরত পাঠানো হবে।' ছাপা আইন তো আর অমান্য করা যায় না! সত্যি-সত্যিই তারা আমাকে বনগাঁ সীমান্ত পর্যন্ত ফেরত দিয়ে গেল। বলল, 'যান, আমাদের দেশে আর আসবেন না, দ্বিতীয়বার যদি আসেন তবে ভয়াবহ শাস্তি পাবেন।'

সঞ্জয় □ তাও বিনয়দা, কলকাতায় না থেকে এখানে আছেন—এটা অনেক ভাল

বিনয় □ আমার বাবা আমাকে বলে গেছেন—'তুই এই ঘরে থাকবি।'

সঞ্জয় □ এখানকার ছেলেদের সঙ্গে আপনার আড্ডাটাও ভাল হয়।

বিনয় □ কোথায় ? কেউ আসে না। ওরা তো চাকরি-বাকরি নিয়ে ব্যস্ত—আমি একেবারে ফাঁকা-একা পড়ে থাকি।

দিলীপ □ বিনয়দা, মনে রাখার মতো সিনেমা কী দেখেছেন—

বিনয় □ একটা ছবি দেখেছিলাম—'মিরাকল্ ইন মিলান'। ডি সিকার ছবি। ১৯৫২ সালে ইনটারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল কলকাতায়। 'মিরাকল্ ইন মিলান' দেখে মনে হয়েছিল এটা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। সেই সময় গড়ের মাঠেও কিছু ছবি দেখানো হয়েছিল। তার টিকিট লাগতনা। আগ্নেয়গিরি নিয়ে তোলা একটা ছবি দেখেছিলাম—'ফুজিয়ামা'। ধূসর রঙের লাভা বেরিয়ে আসছে। গাছ-পালা সঙ্গে-সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে—এত উত্তাপ। নিচের দিকে গড়াতে-গড়াতে চলেছে সেই লাভা। অদ্ভুত দৃশ্য। এত বড় সব বৈজ্ঞানিক, আগ্নেয়-গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ছবি সব উড়োজাহাজের থেকে তুলে ফেলেছে তারা। তাই নিয়ে সিনেমা করেছে। □

যোগসূত্রের পক্ষে সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন সঞ্জয় চক্রবর্তী। ছবি : দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

M/s. DAS PRINTERS

123/1, ACHARYA P. C. ROAD

CALCUTTA-700 006

Phone : 50-4312, 50-8843

Leading House of Quality Letter Press

& Off-Set Printing

□

With the best compliments of :

I. T. C. LIMITED

16, STRAND ROAD,

CALCUTTA-700 001

□

With best compliments from :

Metropolitan Electric Works
Engineers and Contractor

373/2, N. R. Avenue, Block-'G'

New Alipore, Calcutta-53

Phone : 78-2320

□

MICROSERVICES

(A Microventure in Computer Services)

1, PARK SIDE ROAD,

CALCUTTA-700 026

□

With best compliments from :

IFB Industries Limited

Regd. Office :

14, TARATOLLA ROAD,

CALCUTTA-700 088

Phone : (091) (33) 714917/21 (5 lines)

Telex : (021) 4276, 8153, 8004

Gram : FEINSTANZ

Telefax : (091) (33) 714579

□

Two / Three Bed Room

Ready / Under Construction Flats

Available at Satgachi Battola, Baguihati, Jyangra

Near V I P Road, Contact

Lokenath Housing

5, KABI BHARAT CHANDRA ROAD, CAL-28

SATGACHI, BATTOLA, (Baguihati)

(SIDDHARTHA—Apartment Near

Milan Sangha Club)

□

Space donated by :

LAKSHMI SHAW

77A, S. N. Banerjee Road,
Calcutta-700 014

□

With best compliments from :

BAID ENTERPRISES

CALCUTTA

□

□

Best wishes from :

M/s. P. B. CONSTRUCTION
Rabindrapally, Halisahar

and

DEBABRATA SANYAL
"SANYAL LODGE"
Garia, Calcutta-84

□

OH, MEN PRODUCTIONS

PAKHIRA
(BIRDS)
47 mts/Col.
A FILM ON FREE THEATRE
Video Cassette is Available (Rs. 300/-)
6F, B. T. Road, Calcutta-700 002

□

□

Best Wishes From :

ROY & CO.

Government Roads & Buildings Contractor.

8/48, NETAJI NAGAR

P. O. : REGENT ESTATE, CALCUTTA-700 092

and

PRAN KUMAR SAHA

Sanitory & Plumbing Contractor under P. W. D.,

Govt. of West Bengal.

19/1B, Patwar Bagan Lane, Calcutta-9

□

Space Donated By :

A

Well

Wisher

□

Space donated by :

A. K. Enterprise

□

যার নেই কোনো গতি
সে করে হোমিওপ্যাথি
ডাঃ সঞ্জীব গঙ্গোপাধ্যায়
২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

□

A WELL WISHER

□

Marketing Services

DIRECT SALES ASSOCIATE OF

CITIBANK CARDS

18/84, DOVER LANE,
CALCUTTA-700 029

Phone : 75 8575 Fax : 9133407669

Declaration No. : 25 / 92 ☐ Jan-Mar 1993 ☐ Rs. 15

CITIBANK CARDS
The Best Way To Pay

কুন্তল রায় কর্তৃক ইমপ্রিন্টা, ২৪৩/২বি, আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬ থেকে মুদ্রিত এবং টি জি, ২/২৯ তেঘরিয়া, হাতিয়ারা, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ থেকে প্রকাশিত।